ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

২৪শ বর্ষ

(১৩৩২ ভাদ্র হইতে ১৩৩৩ শ্রাবণ পর্য্যন্ত)

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দ রূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

মা সদা—"ভক্তিনিকেতন

পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া

হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৬১ এ বীডন ষ্ট্রীট
মানসী প্রেস হইতে
প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৷০ টাকা
নমুনা প্রতিখণ্ড ৶০ তিন আনা
ভিঃ পিঃ ১৸৶০ আনা

ভক্তির নিয়মাবলী

১। 'ভক্তি' ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। প্রতি বাংলা মাসের প্রথমে যথা নিয়মে বাহির হয়। ভাদ্রমাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইলে প্রথম হইতেই পত্রিকা পাওয়া যায়।

২। ভক্তির বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ দেড় টাকা অগ্রিম দিতে হয়। প্রতিখণ্ড ৵০ তিন আনা। ভিঃ পিতে ১৸৵০ আনা।

৩; ভক্তিতে রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ প্রকাশ হয় না, ধর্ম্মভাব-মূলক প্রবন্ধ সম্পাদক ও পরিদর্শক পণ্ডিতমণ্ডলীর নির্দ্দেশমত (প্রয়োজন হইলে পরিবর্ত্তিত হইয়া) প্রকাশ হয়। ক্রমশঃ প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধের সমগ্র পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইলে তবে প্রকাশ আরম্ভ হয়। প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়ম নাই।

৪। কোন বিষয়ের উত্তর প্রার্থী হইলে রিপ্লাইকার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। প্রত্যেক পত্রেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। নূতন গ্রাহক নূতন এই কথাটী লিখিবেন এবং আপনাপন নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৫। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে না জানাইলে পত্রিকা না পাইবার জন্য আমরা দায়ী নহে। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে তাহার পরমাস প্রাপ্তিমাত্র জানাইলে বিনামূল্যে দেওয়া হয় নতুবা প্রতিখণ্ড ৵০ আনা হিসাবে পৃথক মূল্য দিয়া লইতে হয়। ভক্তিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের সুবিধা আছে পত্রদ্বারা অথবা সাক্ষাৎ করিয়া বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৬। চিঠিপত্র, টাকা কড়ি, প্রবন্ধ, বিনিময় ও সমালোচনার্থ পুস্তক পত্রিকাদি নিম্ন ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

ভক্তি-সম্পাদক—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন
মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া।

"ভক্তি" ২৪শ বর্ষের সূচীপত্র

প্রার্থনা	সম্পাদক	১, ৮৯, ১৩৭, ১৭৭, ২০১, ২২৫
তারকব্রহ্ম নাম	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ	৩
নদীয়ায় ঝুলন	" " অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি	৪
ভক্তির নববর্ষে প্রার্থনা	" শিশিরকুমার বক্সি	৬
ঘৃণাবিদ্বেষ মহাপাপ	" " শশধর তর্কচূড়ামণি	৮
ব্রজাঙ্গনার শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি, ডাক্তার	" ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	১৪
আবাহন গীতি	" প্রভাসচন্দ্র প্রমাণিক	১৮
দেশবন্ধু ও শ্রীগৌরাঙ্গ	" যতীন্দ্রনাথ রায়	১৮
প্রশ্ন	" ব্রজহরি ওয়াদ্দাদার ও সুরেন্দ্রকিশোর কর	২০, ১০৭
গ্রন্থপরিচয়	সম্পাদক	২১
নিবেদন	" মুরালীলাল অধিকারী	২২
আলোচনা	" শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৪
আনন্দময়ীর আবাহন	রায়সাহেব ৺দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়	২৫
আগমনী গীত	শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ	২৬
যদুবংশধ্বংস ও কংস সরপথ	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন বিএ	২৭
সহজিয়া সাধন	ডাক্তার " ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	৩৩
প্রত্যাবর্ত্তন	" প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	৪২
বাঁশীর গানে	" ৺আশুতোষ বসু	৪৩
শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব	" যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৪৩
শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ—	শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট	৪৭,৮৬,১০৮,১১৫
এস	" চণ্ডীচরণ রায়	৪৯
মঙ্গলডিহির ঠাকুর বংশ	" যদুপতি দাস	৫০
শ্রীহরিদাস ঠাকুর	পণ্ডিত " অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি	৫৫
শ্রীশ্রীনাম	" শিশিরকুমার বক্সি	৫৮, ৯৮
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্তব	" যদুপতি দাস	৬৬
কংস	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ,	৬৬
শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী	" বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ,	৭৪
মা	" অমূল্যধন রায় ভট্ট	৮০
পুরীধামে স্বর্গদ্বারে শ্রীচৈতন্য মণ্ডলী,	ঐ	৮১
মধুপুর গুরুদরবারে সাতদিন	সম্পাদক	৮২
সাফল্য	" নবীনচাঁদ দত্ত	১১৪
সফল স্বপ্ন—	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি	৯০, ১১৯
মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি	" যদুপতি দাস	৯৩
সম্প্রদায়ে স্বেচ্ছাচার	" সুরেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ	১০৫
ভাগ্যবান চোর	" যদুপতি দাস	১২০
ভক্তকথা	" উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৬

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব	ডাক্তার শ্রীযুক্ত	ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	১২৬
মুদ্রিত বৈষ্ণব গ্রন্থের ভ্রমনিরসন	"	যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ	১২৮
মহাপুরুষ দর্শন	"	বিশ্বেশ্বর দাস বি. এ,	১ ০
মোহনরূপ	"	প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	১৩৮
দস্যু উদ্ধার	পণ্ডিত "	অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি	১৩৯
প্রভুর ভাবিসন্ন্যাস-গ্রহণ সংবাদে প্রিয়াজীর খেদ (লোচনদাসের মতে)	ডাক্তার "	ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	১৪১
শ্রীরাসলীলা	"	কালাচাঁদ দেবশর্ম্মা	১৪৬
শ্রীশ্রীগৌর পুর্ণিমাগীতি	"	সতীশচন্দ্র বসু	১৫১
যীশুখৃষ্ট ও হরিদাস	"	যদুপতি দাস	১৫২
অদ্বিতীয়		স্নেহলতা	১৫৬
শ্রীশ্রীঅমিয়নিতাই চরিত	ডাক্তার "	ভোলানাথ ঘোষ	১৫৭,১৭৯,২০২,২৫৩
প্রাচীন কীর্ত্তি		সম্পাদক	১৬৩
আগড়পাড়া শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিসম্মিলনী		রামধন দেবশর্ম্মা	১৬৪
চাপাল গোপাল উদ্ধার	ডাক্তার "	ভোলানাথ ঘোষ	১৬৫
স্বপন	"	অমূল্যধন রায় ভট্ট	১৬৮,১৯৯,২১০
কল্পান্তর	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত	কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ,	১৬৯
বর্ষ-বিদায়	"	গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ	১৭৪
বিশেষ দ্রষ্টব্য	"	ভক্তিকার্য্যাধ্যক্ষ	১৭৬
এস	"	প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	১৭৮
শ্রীমূর্ত্তি	পণ্ডিত "	রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১৮৩
শাস্তার শাসন	"	জগবন্ধু ভদ্র	১৮৬
কৃষ্ণকথা	"	বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ,	১৯৪
বৈষ্ণব ব্রত তালিকা	"	রাধাকিঙ্কর গোস্বামী	১৯৬
বিশ্বরূপের পত্র		সম্পাদক	১৯৮
অদ্যাপিও সেইলীলা করে গোরারায়		যামিনীকুমার রায় বিদ্যাবিনোদ	২০১
উপবাস ও স্বাস্থ্য		সঞ্জিবনী	২০৭
শ্রীবৈষ্ণব স্মরণীয় তিথি	"	অমূল্যধন রায় ভট্ট	২১৭ ২৪৫
সংসর্গ		মেদিনীপুর হিতৈষী	২১৭ ২৩১
রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু		শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস	২২৭
ভক্তাধীন ভগবান	শ্রীযুক্ত	রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ	২২৮
শ্রীগুরু বন্দনা	শ্রীযুক্ত	নৃত্যগোপাল গোস্বামী	২৩১
আনন্দাশ্রু ও প্রেমাশ্রু	"	নিতাইপদ দাস	২৩৪
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং কয়েকখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ	শ্রীযুক্ত	বীরেশ্বর দাস	২৩৭
বর্ষশেষে আমাদের বক্তব্য		সম্পাদক	২৪০
আবিস্কারক বাবু		শ্রীযুক্ত স্পষ্টবক্তা	২৪৩
শ্রীপাঠ পানিহাটী গৌরাঙ্গপ্রভু মন্দির		শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট	২৫০

২৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা | ভক্তি | ভাদ্র মাস ১৩৩২

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

প্রার্থনা

লীলাময়! তোমার রচিত, তোমার পালিত, তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছায় পরিচালিত এই মহা বিচিত্রতাময় সংসারে প্রতিমুহূর্ত্তেই যে কত অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহার সীমা নাই। বিচার করিবার শক্তি একেবারেই নাই। বুঝিতে গিয়া, বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া, ভাবিতে গিয়া কিছু বোঝাতো দূরের কথা একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি। আর হইবই বা না কেন? আমাদের সীমাবদ্ধ অসম্পূর্ণ জ্ঞানে তোমার অসীম অনন্ত লীলার ধারণা করা কি কখনও সম্ভব? তাই আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি কিভাবে চলিব বা কিভাবে চলিলে মঙ্গল হইবে তাহার কিছুই জানি না। তোমার ভক্তের ভাবে, ভক্তের ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়—"পুতুল বাজির পুতুল আমরা যেমন নাচায় তেমনি নাচি।"

যদি কিছু বুঝাইবার থাকে তুমিই বুঝাইবে আমি আর তার কি বলিব; আমি কেবল এইমাত্র প্রার্থনা করি, যেন সর্ব্বদা সকল কার্য্যে তোমাতে নির্ভর রাখিতে পারি, সম্পদের ভারে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যেন নির্ভরতা না হারাই। আবার বিপদে পড়িয়া বিপদের তাড়নায়ও যেন তোমার সর্ব্ব-জীব-পালনী শক্তি না ভুলি। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, ভাবে অভাবে তোমাতেই যেন একান্ত নির্ভর থাকে, আমার দুর্ব্বল মনে এই শক্তি দাও।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ! আপনাদের উৎসাহে ও শ্রীভগবানের কৃপায় 'ভক্তি' পত্রিকা আজ ২৪শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এযাবৎ অনেক ভাবুক লেখকের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে, ভবিষ্যতের জন্য বহু প্রবন্ধ প্রকাশের প্রতিশ্রুতিও দিয়া রাখিয়াছি, এমন অনেক প্রবন্ধ আমার নিকট রহিয়াছে যাহা স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারি নাই। কেবল ভাষার পরিপাটী বা লেখকের বাগাড়ম্বরী প্রকাশ করিয়া সম্পাদকীয় গর্ব্বে গর্ব্বিত হওয়া আমার

লক্ষ্য নয়, বহুল প্রচার করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করা কিম্বা লোকের নিকট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভও লক্ষ্য নহে, কেবল লক্ষ্য আমরা যাহাতে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারি। প্রাচীন মহাত্মাগণের আচার ব্যবহারাদির অনুশীলন দ্বারা দুর্ল্লভ মানব জীবনোচিত কর্ম্ম করিয়া দুর্দ্দান্ত রিপুকুলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, পরচর্চ্চা বা বৃথাকথার আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া যাহার যতটুকু সময় আছে তাহাই যাহাতে সদ্ব্যয় করিতে পারি সেই বিষয়ে যত্ন ও সুযোগ অবলম্বন করিবার জন্য আজ ২৩শ বৎসর 'ভক্তি' প্রচার দ্বারা চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, আমার উদ্দেশ্য যে একেবারে বিফল হইয়াছে মনে হয় না। নানাস্থান হইতে ভক্তিপাঠে দ্বারা উপকার পাইয়া অনেকে নানাভাবে আমাকে পত্রাদি দিতেছেন। এই সকল উৎসাহ পাইয়া নূতন বর্ষের জন্য পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলাম। জানি না, দয়াময় ভগবান্ কোন্‌ভাবে চালাইয়া আমার উদ্দেশ্য সাধন করাইবেন, আর জানি না, ভক্তি গত বর্ষ সমূহের ন্যায় সকলের নিকট আদর পাইবে কি না। তবে আশাই মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, আর আশাই সকল কার্য্যের মূল বুঝিয়া পুনরায় নূতন বর্ষের জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া করির ভাষায় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলি—

প্রভু—নূতন বরষে নূতন করিয়া
নূতন শকতি দাও হে।
হিংসা দ্বেষ মান দূরে ফেলে দাও
তৃণ হ'তে নীচ হইতে শিখাও
সত্য সদনে দয়া ক'রে নেও
নূতন শকতি দাও হে॥
দুরাশা দুঃখ দীনতা জড়তা
মুছাও চখের জল।
তোমার কাজেতে খাটিতে শিখিতে
দাওহে নূতন বল।
তোমার প্রেমেতে ভাসিতে ডুবিতে
তব গুণ গান গাহিতে শিখিতে
সুখ দুঃখ ভুলে তব কোলে যেতে
নূতন শকতি দাওহে॥

তারকব্রহ্ম নাম

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ)

শাস্ত্র ত্রিসত্য করিয়া বলিয়াছেন, এ ঘোর তামস যুগে জীবের একমাত্র গতি—তারকব্রহ্ম হরিনাম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

যাগযজ্ঞ সাধনের উপাদান নাই, তপশ্চরণের সামর্থ্য নাই, ব্রতনিয়ম পালনের প্রবৃত্তি নাই,—জীব পশু হইয়া গেল। পশুর মত, কেবল খাই খাই করিয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে। দুর্লভ জিনিস আমরা হেলায় হারাইতেছি। এ দুর্দিনে আমাদের একমাত্র গতি—তারকব্রহ্ম হরিনাম।

কঠোর জীবনসংগ্রামে ভোগলোলুপ জাতির নিত্য সাহচর্য্যে একমুঠা মুখের গ্রাস সংগ্রহ করিতেই জীব সারা হইয়া গেল। ছেলে মেয়ে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—সারাদিন তাহাদের একবার দেখিতেও পাই না, তাই তাহাদের উপরই মায়াটা যেন শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে। অথচ না পারিতেছি তাহাদের দুঃখ দূর করিতে, আর না পারিতেছি নিজের অশান্তি ঘুচাইতে। সংসারে এমন করিয়াই শেষে মজিতে বসিয়াছি। এ আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে! দিনের পর দিন একটা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি আমরা অধঃপাতের চরম সীমায় ডুবিতে বসিয়াছি। আচার নাই, অনুষ্ঠান নাই, ব্রত নাই, তপস্যা নাই। হায়! হায়! কেমন করিয়া আমরা বাঁচিব! পরকালের পানেতো একরূপ অন্ধ হইয়াই আছি, কিন্তু কৈ ইহকালেওতো কিছু করিতে পারিলাম না। ভোগ সুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কেবল ঈর্ষা দ্বেষ কপটতা ও পরশ্রীকাতরতায় অশান্তি আগুনে ভাজা ভাজা হইয়া গেলাম। এ দুঃসময়ে দুর্ভাগা জীবের একমাত্র অবলম্বন—তারকব্রহ্ম হরিনাম।

সুখ সুখ করিয়া সর্ব্বত্র খুঁজিয়া মরিতেছি, কিন্তু নিত্যসুখদ হরিনাম গানে কয়জনের প্রাণে আকুলতা জাগিল? সুখে থাকিবার জন্য পদে পদে কত না চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সুখের বদলে যাহা পাইতেছি তাহাতে কেবল বিচ্ছেদ হিংসা ও ভোগলিপ্সার ধিক্কারজনক উপহাস ব্যতীত আর কিছুই পাইতেছি না।

যাহাতে প্রকৃত সুখ আছে, আমরা তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় সুখের সন্ধান পাইব। মরীচিকার কাছে জলের প্রত্যাশা করিয়া পদে পদে আমরা প্রবঞ্চিতই হইতেছি। হায়! হায়! এ ঘোর অন্ধকার হইতে কি আমাদের উদ্ধারের আর কোনই উপায় নাই?

হে জীব তুমি হতাশ হইও না—তুমি শাস্ত্রবিশ্বাসী হও। ঐ শুন শাস্ত্র তারস্বরে অভয়বাণী ঘোষণা করিতেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিতে নাম বই আর ধর্ম্ম নাই—সাধনা নাই। হে অনুতপ্ত! তুমি হতাশ হইও না—একান্তমনে হরিনাম গান কর। যে যেখানে যে কাজেই থাক না কেন, দিনান্তে একটিবারও যেন ভুবনমঙ্গল গৌর-হরিনাম গান করিতে ভুলিও না।

যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুই যাই বলিহারী।

নদীয়ায় ঝুলন

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি)

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, স্তরে স্তরে মেঘমালা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, সমীরণ সর্ সর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। রৌদ্রের তেজ মোটে নাই। এমন একটা মেঘ্‌লা দিনের অপরাহ্নে এক স্নিগ্ধ-কান্তি যুবক হাটাপথে ক্লান্তদেহে আপন বন্ধুর মন্দিরে আসিয়া বন্ধুর হাত ধরিয়া কহিলেন—"ভাই, তুমি কি আমায় ডাকিয়াছ? আমি যেন কাহার ডাকে প্রাণে প্রাণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছি। বার বার তোমায় মনে পড়িয়াছে, তাই অমনি ছুটিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।"

"ছুটে এসেছ, বেশ করেছ, আমি তোমাকেই খুঁজিতেছিলাম। যে কাণ্ড হইতেছে, তাহাতে তোমার উপস্থিতি চাই-ই। চল এখন উভয়ে একবার দেখা করে আসি।" অপর বন্ধু উত্তর দিলেন।

এই যে দুই বন্ধুর কথা কল্পিত হইল, ইহারা গদাধর ও নরহরি। উভয়ে তখন শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে চলিলেন।

এখন প্রকৃত কথা বলি। শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া হইতে আসিয়া যে তরঙ্গ তুলিয়াছেন তাহাতে ভক্তগণ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন, যে যথায় আছেন সংবাদ পাইয়া নবদ্বীপেই আসিতেছেন। শ্রীখণ্ড হইতে নরহরি যেই আসিলেন আর অমনি নবদ্বীপেই রহিয়াগেলেন—

"নরহরি মিলিযা রহিলা তাঁর ঠাই।" (চৈতন্য মঙ্গল)

এক শ্রাবণ মাসের সায়াহ্নে এইরূপে গদাধর ও নরহরি একত্রে গৌর-দর্শনে চলিয়াছেন। কিন্তু গৌরগৃহে যাইতে হইল না—পথেই শুভ সম্মিলন ঘটিল। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভাববিশেষে বিভোর, সঙ্গে মুকুন্দাদি কয়েকজন মর্ম্মী ভক্ত। গদাধর ও নরহরিকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দ যেন চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল, কি যেন অনুসন্ধান করিতেছিলেন, দৈবে যেন তাহা মিলিয়া গেল। তিনি তখন সদলে সুরধুনী তীরে চলিলেন—তাঁহার মনে তখন ঝুলন-লীলা জাগিয়াছে, ও সেই ভাবে সেই ভঙ্গীতে তিনি চলিতেছেন। পদকর্ত্তা শিবরাম দাসের প্রাচীন পদে এ সংবাদ পাওয়া যায়। যথা :—

"দেখ দেখ গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী।
ঝুলন যুগল কিশোরক যৈছন, চলত সোই করি ভঙ্গী॥
রচত শৃঙ্গার, ঝুলন সুখ হোয়ব, মনহি ভেল উপনীত।
ঐছন সহচর গাওত আনন্দে, গৌর পহুক মনোনীত॥"

তাহাতে ভাবের গাঢ়তা হইল, তখন—

"হেরি গদাধর, লহু লহু বোলত, মন মাহা কিয়ে ভেল রঙ্গ।
আজু হাম তুয়া সনে, ঝুলন বিলসব, সহচরগণ করি সঙ্গ॥"

পদকর্ত্তা বলিতেছেন—

"ঐছে বিলাস গোরা প্রভু বিলসয়ে পূরব প্রেম রসে ভোর।
কহ শিবরাম, মনহি সুখ ঐছন কোই করব অব ওর॥"

গৌরের ভাবে ভক্তগণও অভিভাবিত—তাঁহারা তখন কি করিতেছিলেন, উদ্ধব দাসের এই পদে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে :—

"শাওন মাস, গগনে ঘন গরজন জলপতি দামিনী মাল।
বরখত বারি, পবন মৃদু মন্দহি, গরজত রঙ্গ বিশাল॥

বিবিধ সুরঙ্গ, রচতহি দোলা খচিত কুসুম চয় দাম।
বটতরু ডালে, ডোর কবি বন্ধন, মালতী গুচ্ছ সুঠাম॥
তখন—বৈঠল গৌর, বামে প্রিয় গদাধর ঝুলন রঙ্গরসে ভাস।
সহচর মেলি, দোলায়ত মৃদু মৃদু দোল ধরিয়া দোঁপাশ॥"

বাসুঘোষ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন—

"ঝুলত গোরাচাঁদ সুন্দর রঙ্গিয়া।
প্রেমরসে হৈয়া ডগমগিয়া।
রাধারভাবেতে ধারা নয়নেতে ভাসে।
ভাব বুঝি গদাধর ঝুলে বাম পাশে॥
মুরলী বলিয়া চাহে বদন হেরিয়া।
বাসুঘোষ গায় গৌরাগুণ সোঙরিয়া॥"

ভক্তগণ ইহাকেই নদীয়ার ঝুলন লীলা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভক্তির নববর্ষে প্রার্থনা

(শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বক্সী)

(আজ) "ভক্তি"র নব বরষে নব হরষে,
এসহে সকলে করি প্রণিপাত,
(কৃষ্ণ) পতিত পাবন অধম তারণ,
করুন আশীষ তুলিয়া হাত।
এস এস ভাই! সবে মিলে এস,
এস না সকলে ত্বরিতে!
মন প্রাণ হিয়া, সব সমর্পিয়া,
লুটাই চরণ তলেতে॥
(তিনি) অগতির গতি, দয়ার সাগর,
লইগে শরণ তাঁর;
জুড়াইতে জ্বালা, এভব মাঝারে,
(কৃষ্ণ) ভক্তি বিনা নাহি আর॥
নব নব ভাবে, মনের হরষে,
বন্দি সে চরণ কমল,

হৃদিমাঝে স্থাপি মোহন মূরতি,
(চল)—করিগে জমন সফল।
ভক্তি বিনে আর মুক্তির আশা,
কিছু নাই ভাই ভবে,
ভক্তি ভাবে ভাই, সকল করমে,
চলনা পূজিগে সবে।
অন্তিম সময়ে কোলে স্থান দিতে,
(কৃষ্ণ) ভক্তিই কেবল পারে,
কৃষ্ণ বিনা আর সবই মায়াময়,
ভাব মন সদা তাঁরে।
কাতর পরাণে, ডাকি এস ভাই,
মেতে যাই কৃষ্ণ নামে;
ভক্তিতে স্মরিলে দূরে যায় দুঃখ,
চিরস্থিতি স্বর্গ ধামে।
অঞ্জলি ভরিয়া, এস ভাই সবে,
ভক্তিসুধা পান করি;
কৃষ্ণ নাম রসে ভিজায়ে রসনা,
এস তাঁহাকেই সদা স্মরি।
এ নব বরষে, মনের হরষে,
এস তাঁর ভাবে মগ্ন থাকি,
যুক্ত করেতে ভক্তি ভরিয়া,
প্রাণ খুলে তাঁরে ডাকি।
কৃষ্ণ দয়াময়, কত দয়া তাঁর,
পারেন কি কারেও ভুলিতে,
তাঁর হই এস, তবেত নিদানে,
আসিবেন পার করিতে।
ভাই! এ নব বরষে, মনের হরষে,
এস সবে তাঁরে পূজিতে,
ভকতি কুসুমে গাঁথি মালারাশি,
চল যাই তাঁরে অর্পিতে॥

ঘৃণা বিদ্বেষ মহাপাপ

(পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় লিখিত)

অস্পৃশ্যের স্পর্শ আর নিজাপেক্ষা নীচ জাতির পান ভোজনাদি যে আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎসঙ্গে স্পর্শাদি দোষের প্রত্যক্ষ প্রমাণও উত্থাপিত হইয়াছে। তদ্দারা প্রকৃত হিন্দু সন্তানগণ বোধহয় ভ্রমবশতঃ ঐ সকল কাজ করিলেও তাহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে আরও দুই চারিটী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক বোধ করিতেছি।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বলেই হউক কিম্বা শাস্ত্রাদেশের প্রমাণ্য বশতঃই হউক, ব্রাহ্মণগণ অস্পৃশ্যের স্পর্শ বর্জ্জন করুন, ইহা আমাদের একান্ত অনুরোধ বটে, কিন্তু এস্থলে ইহাও বিশেষ অনুরোধ যে, সেই বর্জ্জনের সঙ্গে যেন কাহারও প্রতি ঘৃণার ভাবের মিশ্রণ না করেন। কাহাকেও ঘৃণা বিদ্বেষ করিয়া স্পর্শাদি পরিত্যাগের জন্য কোন শাস্ত্রই কোন আদেশ করেন নাই। প্রত্যুত চণ্ডালাদি মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া পশু পক্ষী কৃমি কীট পিপীলিকা পর্য্যন্ত, এমন কি, উদ্ভিজ্জপ্রাণী পর্য্যন্ত সকলের প্রতিই উদারতা, করুণা এবং মৈত্রী প্রকাশের জন্য আমাদের যাবৎ শাস্ত্র অনুরোধ করিয়াছেন। যাবৎ প্রকার জীবগণই পরমেশ্বরের অংশ বিশেষ। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই তিনি সমভাবে বর্ত্তমান, এরূপ উপদেশও শাস্ত্রের ভূরি ভূরি স্থানে দৃষ্ট হয়। অতএব কাহাকেও ঘৃণা করিলে শাস্ত্রানুসারে ভগবানকেই ঘৃণা করা হয়। "অহমেবৈতাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য একৈকং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি" * * * * (শ্রুতি)। সেই পরমেশ্বর সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্ষিতি জলাদি ভূতগণের প্রত্যেককে পরস্পরে মিশ্রিত করিয়া রূপান্তরের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেহ নির্ম্মাণ করিব। অপরঞ্চ,— "পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ, পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ, পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব। তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়" * * * * (শ্রুতি)। সেই পরমেশ্বর নিজের লীলা বিহারের নিমিত্ত অসংখ্য দ্বিপদরূপ (মনুষ্য) পুর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইলেন, এবং বহুবিধ চতুষ্পদরূপ (গবাশ্বাদি) পুর আর পক্ষী শরীর স্বরূপ পুর ও কীট পতঙ্গাদি দেহরূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে জীবরূপে আবিষ্ট হইলেন। আবার তাহার অন্তরালে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান

অবস্থায় থাকিয়া নিজের জ্ঞান, প্রাণ ও ক্রিয়া শক্ত্যাদির দ্বারা অনন্ত জীবের জ্ঞান, প্রাণাদির সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এবম্বিধ ঈশ্বররূপই কথঞ্চিৎ বলিবার যোগ্য। কিন্তু ইহার অতীত অবস্থা সকলেরই বাক্য মনের অগোচর। এই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন যে,—

"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" (গীতা)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ আর ব্যাধ ও গো হস্তী কুকুর প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পণ্ডিতগণ আত্মগত সমতাদর্শী হইয়া থাকেন। সুখ দুঃখাদি বিষয়ে সকলের আত্মাই সমান, ইহা মনে করেন।

অতএব কাহাকেও ঘৃণা করা অতীব অসঙ্গত। কিন্তু তাই বলিয়া সকল জাতির সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক সকলের পান ভোজন করিয়া ঘৃণা বিদ্বেষ ত্যাগ দেখাইতে হইবে না। যতক্ষণ পশু কীটাদি সর্ব্বত্রই ভেদজ্ঞানের প্রগল্‌ভতা থাকে, যতক্ষণ নিজের অহঙ্কারবহ্নি দেদীপ্যমান থাকিয়া জ্ঞান মান বুদ্ধি বিবেচনা আর ধনাদির দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠতা উদ্ভাসিত করে, যতক্ষণ পশু কীট পতঙ্গাদির প্রতি নীচতা বোধ প্রজ্বলিত থাকে, যতক্ষণ বিষ্ঠাদি কৃমি কীট মনে করিলেও ঘৃণায় শরীর শিহরিয়া উঠে, ততক্ষণ স্বেচ্ছাচারে পান ভোজনের কালে কেবল মানুষের প্রতি সমদর্শনের কথার উচ্চারণ করা, ধৃষ্টতা বা মূর্খতাদির একটা উদাহরণ মাত্র; "অমুক মূর্খ, অমুক নির্ব্বোধ, অমুক অসভ্য, অমুক অতি অপরিষ্কৃত, অমুক অতি কুৎসিত-কদর্য্য, অমুক অতি দুর্ভাগ্য-দরিদ্র, অতএব ইহাদের সহিত আত্মীয়তা বন্ধুতা হইতে পারে না, মাখামাখি হইতে পারে না, ইহারা ঘনিষ্ঠতার অযোগ্য।" ইত্যাদিরূপে তোমা হইতে নীচ সকল মানুষকে ঘৃণা করিবে, তাহা হইতে দূরে থাকার চেষ্টা করিবে, আর কেবল পান-ভোজনাদির সময় সমতার ঘোষণা করিবে? সকলেই পরমেশ্বরের সন্তান, সকলেই সমান, ইহার মধ্যে উচ্চ নীচ ব্যবস্থা হইতে পারে না—ইত্যাদি অপূর্ব্ব কারণের অবতারণা করিবে, ইহাই ঘোরতর প্রতারণা মাত্র। সকলেই পরমেশ্বরের সন্তান বা তাঁহার সৃষ্ট, ইহা সমতার কারণ নহে। তিনি সর্ব্বত্র সমানভাবে বর্ত্তমান। জীবগণও তাঁহারই অংশবিশেষ, ইহাই সমতার হেতু হইতে পারে, কিন্তু সে সমতা আত্মগত, জাতিগত বা প্রকৃতিগত বা গুণগত নহে; ধর্ম্মাধর্ম্মাদিঘটিত নহে, কিম্বা আকার প্রকার লইয়াও নহে। এই সকল লইয়া সকলেই ভিন্ন প্রকারের জীব, সকলেই অসদৃশ, সকলেই বিচিত্র। জাতি ক্রিয়া গুণাদি দ্বারা বৈচিত্র্যই জগতের ধর্ম্ম, উচ্চ

নীচতাই জগতের প্রকৃতি, উচ্চ নীচতা বা বৈচিত্র্য ব্যতীত জগতের রচনাই অসম্ভব; সুতরাং এদিক্ হইতে "সমতা সমতা" কথাগুলি প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ জগতে অনন্তকোটী প্রাণীর মধ্যে দুইটী প্রাণী বা দুইটী বস্তু ঠিক এক প্রকার নাই। আকারে প্রকারে এবং গুণে ধর্ম্মে সকলেই পৃথক্ পৃথক্রূপে বিদ্যমান। জগৎ কেবলই উচ্চ-নীচতাময়, কেবলই ভেদময়, কেবলই বৈচিত্র্যময়। গুণ কর্ম্মাদি ভেদে চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি ও ভগবানেরই কার্য্য, নিজশক্তির দ্বারা তিনিই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন,—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

সুতরাং এ ভাবের সমতা একটা অপ্রসিদ্ধ বিষয়। তবে ভগবৎসত্তা সর্ব্বত্রই সমান। তিনি আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান. তাহাতে ন্যূনাতিরেক বা প্রকারভেদ নাই। তিনি কৃমি কীটের মধ্যেও যেরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যেও সেইরূপ, আবার ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও সেই ভাবেই বিদ্যমান, জল স্থল অন্তরীক্ষাদির মধ্যেও তিনি সেই ভাবেই বিরাজ করিতেছেন। সমতা বা সাম্য তাঁহারই অপর নাম।* "পরাৎপরঃ পুরুষ-সাম্যমুপৈতি দিব্যং" (শ্রুতি)। এই দৃষ্টিতে জগতের সকলেই সমান। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই একরূপ। সর্ব্বদা আত্মদৃষ্টি অভ্যাসের দ্বারা এই সাম্য যাঁহাদের অন্তর্নয়নে জাগিয়া উঠে, তাঁহারা কি অন্তর রাজ্য কি বহিরাজ্য যে দিকে লক্ষ্য করেন, সেই দিকেই সচ্চিদানন্দের অপর নাম সমতা তত্ত্বের উপলব্ধি করেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" * * ব্রহ্মৈবেদমমৃতং, পুরস্তাদ্ব্রহ্ম, পশ্চাদ্ব্রহ্ম, দক্ষিণতশ্চোত্তরঞ্চ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং, ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং।" (শ্রুতি)। ইত্যাদি মহাবাক্য সমূহের যথার্থতা অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ে কৃমি কীট হইতে আরম্ভ করিয়া কাহারও প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ আসিতে পারে না। আবার কিন্তু মৈত্রী বা করুণা ভাবের উদয় হয় না। ঐকাত্ম্যদর্শনই তাহার কারণ। নিজের আত্মার বিদ্যমানতা যাঁহার সর্ব্বত্রই জাগ্রত, তিনি আবার কাহার জন্য দুঃখিত হইবেন? মোহের ফলস্বরূপ স্নেহ মমতাই বা তাঁহার কাহার প্রতি হইবে?

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ।" (শ্রুতি)।

এইরূপ ভাগ্যবান্ পুরুষের পক্ষে ঘৃণা বিদ্বেষাদির নিষেধ করা নিষ্প্রয়োজন। স্বতঃই যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার আর নিষেধ বিধি কি? অতএব আমরা

তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঘৃণা বিদ্বেষ বর্জ্জনের অনুরোধ করিতেছি না। কিন্তু যাঁহারা অকৃতার্থ পুরুষ, সাংসারিক অনুকূল প্রতিকূল তরঙ্গে যাঁহারা সর্ব্বদা ভাসমান, সুখ দুঃখের অনুকূলতা প্রতিকূলতা সর্ব্বদা যাঁহাদের হৃদয় বিকম্পিত করিতেছে, তাঁহারা সাম্যতত্ত্ব স্বরূপ সমুদ্রের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া তদ্বারা ঘৃণা বিদ্বেষাদি হইতে বিমুক্ত হউন, এইরূপ অনুরোধ ও আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আর যতদিন সে সৌভাগ্য দূরবর্ত্তী থাকে, ততদিন অদ্বৈততত্ত্বের আশ্রয় লইয়া ঘৃণা বিদ্বেষাদি সুদারুণ শত্রুদিগকে পদদলিত করিয়া কর্ত্তব্যবোধে অস্পৃশ্য স্পর্শাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করুন, ইহাই তীব্রতর অনুরোধ। যখন সর্ব্বভূতের মধ্যেই সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় বস্তু ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহা হইতে যখন কিছুই পৃথক্ করা যায় না, তখন যাহাকে বিদ্বেষ করিব, যাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিব, তাহাতেই রূপান্তরে সেই পরম তত্ত্বকে ঘৃণা বিদ্বেষ করা হইবে। সেই পাপের ফলে তিনি ততই আমাদের দূরবর্ত্তী হইবেন, আমাদের জ্ঞানের বাহিরে লুকাইয়া থাকিবেন, সুতরাং অনন্ত দুঃখ পরম্পরায় ভাসিয়া যাইব। আবার পক্ষান্তরে যতই সকলের প্রতি সস্নেহ মৈত্রী করুণার উদয় হইবে, ততই অন্তঃকরণের কলঙ্ক কাটিয়া যাইবে, হৃদয় স্বচ্ছ হইবে, আর সেই সত্তামূর্ত্তি উপলব্ধির আনুকূল্য হইবে। অতএব ঘৃণা বিদ্বেষাদি বিপুদ্দলনপূর্ব্বক সকলকেই সস্নেহে মিত্রতার চক্ষে দেখা আবশ্যক।

অন্য প্রকার বিচারেও সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা বা হিংসাদি করা অত্যন্ত পাপজনক। এমন কি, উহাকে আত্মহত্যা বা কৃতঘ্নতার রূপান্তর বলিলেও হয়। এই জগন্নিবাসী একটা মক্ষিকা হইতে ছোট বড় মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের পরম উপকার সাধন করিতেছে। সাক্ষাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে সকলেই আমাদের জীবন যাত্রার সহায়। সকলের আনুকূল্য হইতেই আমরা যথাযোগ্য আহার ব্যবহারাদির সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করি ও নিরাপদে থাকি। অতএব সকলেই আমাদের জীবনের বন্ধু। অধিক কি, বিষবৃক্ষ আর কৃষ্ণ-সর্পও অনেক সময় আমাদের জীবন দান করিয়া থাকে।

রাজা, দস্যু চোর ও দুর্নীতিমানবগণের অত্যাচার হইতে সতত আমাদিগকে রক্ষা করেন। যতপ্রকার রাজকীয় কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারাও সেই কার্য্যেরই সহায়। আবার দস্যু চৌরাদিগণ একদিকে অনিষ্টকারী হইয়াও অপরদিকে উপকারী হয়। তাহারা আমাদের ধৈর্য্য বীর্য্য সাহস ও সাবধানতাদি অভ্যাসের সহায়তা করে। কৃষিকারকগণ বহু প্রকার ফল মূল ও শস্যাদি উৎপাদনের দ্বারা

আমাদের শরীর রক্ষা করে। শ্রমজীবিগণও সর্ব্বদা কত প্রকার আনুকূল্য করিতেছে। শিল্পীদিগেরও আনুকূল্যের সীমা সংখ্যা নাই। এই ভাবে মোটের উপর জগতের সমস্ত মনুষ্যগণই সকল মানুষের বন্ধু। পরস্পর সকলেই সকলের সহায়। তৎপরে গো মহিষাদি পশুর সহায়ও সর্ব্বদা সকলের প্রত্যক্ষ বিষয়। কাকাদি পক্ষিগুলি সর্ব্বদা বিরক্ত করে বটে, কিন্তু তাহারাও পূতিগন্ধযুক্ত পচা গলা ইত্যাদি কদর্য্য পদার্থ খাইয়া ফেলিয়া আমাদের উপকার করে। শকুন গুলিও যত পচা মরা খাইয়া নিঃশেষ করে। মক্ষিকাগণ পর্য্যন্ত নানাবিধ অমেধ্য ক্লেদাদি আত্মসাৎ করিয়া হিতসাধন করে। উদ্ভিজ্জের তো কথাই নাই, তাহারা ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই নিজের শরীর ও শরীরজাত পত্র পুষ্প ফল মূলাদির দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। আবার ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি পশুগণ আমাদের মারক জন্তু হইলেও আমাদের অত্যাবশ্যক অরণ্যের রক্ষক। তদ্ব্যতীত মৃগয়াব্যাজে কষ্টসহিষ্ণুতা ও সাহস বৃদ্ধি প্রভৃতির যথেষ্ট অনুকূল হয়। এইরূপে জগতের যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, আমাদের সামান্য জ্ঞানেও, সেই দিকেই বন্ধুময় প্রতিভাত হয়। এখানে সকলেই সকলের মিত্র, পরস্পর সকলেই সকলের প্রাণের সহায়। টানা-পড়েনের সূত্রের পরস্পর সহায়তায় যেমন একখানি বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ পরস্পরের সহায়তায় আত্মলাভ করিয়া এই জীব-সমাজ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, জীব-সমাজের অস্তিত্ব অচিরে অন্তর্হিত হয়। অতএব জীবগণের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ করিলে তাহার ফল বিপরিবর্ত্তিত হইয়া নিজের উপরই সংক্রান্ত হয়। তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলিলেও আত্মহত্যার সমাকৃষ্ট হয়। মনুষ্যের পক্ষে ত কথাই নাই। তাহারা ত সকলেই পরস্পরের মুখ্যতম বন্ধু, অপরিহার্য্য জীবন সহায়। অতএব উচ্চই হউক আর নীচই হউক, কোন মানুষের প্রতি কখনই কোনরূপ ঘৃণা বিদ্বেষ প্রযোক্তব্য নহে। অন্য প্রাণীর প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ অপেক্ষা, ইহা অতীব অনিষ্টের হেতু।

হিংসা বিদ্বেষাদি প্রবৃত্তিগুলি ক্রোধজ ব্যসনের অন্তর্গত, ইহাতে লিপ্ত হইলে আত্মবিয়োগ পর্য্যন্ত সম্ভাবিত।

"কামজেষু প্রসক্তোহি ব্যসনেষু মহিপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু॥
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণং।
বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপিগণাষ্টকঃ॥"

দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল বৃত্তিগুলি আত্মার অত্যন্ত অধঃপাতজনক। ইহার

অনুষ্ঠানে আত্মা নিরয়গামী এবং পুনর্জ্জন্মে কদর্য্য যোনি প্রাপ্ত হয়। ইহকালেও বিদ্বেষের প্রতিবিদ্বেষের দ্বারা নানারূপে কষ্টভোগ করে। অতএব ঘৃণা বিদ্বেষাদি প্রবৃত্তিগুলি আমাদের ঘোরতর বৈরী। সর্ব্বদা ইহাদের দমনের চেষ্টা করা আবশ্যক এবং ইহা বর্জ্জনপূর্ব্বক অস্পৃশ্যের স্পর্শ ও অপেয়াদির পান ভোজন ত্যাগ করিতে হইবে।

এখন হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে যে, ঘৃণা বিদ্বেষাদি ব্যতীত স্পর্শাদি বর্জ্জন কিরূপে সম্ভবে? তোমার স্বগণের মধ্যে যদি কাহারও দারুণ বসন্ত রোগ উপস্থিত হয়, তবে তুমি তাহার সহিত মাখামাখি করা ভালবাস না কিরূপে? তাহার কারণ কি বিদ্বেষ বা ঘৃণা? ঘৃণা বিদ্বেষ কি সেখানে মিশ্রিত থাকে? অথবা তোমার আত্মরক্ষার ইচ্ছাই তাহার হেতু? প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় পক্ষই সত্য। তাহা হইলে নিষিদ্ধ পান ভোজনাদি কালেও ঘৃণা বিদ্বেষ না করিয়া কেবল শাস্ত্রের আদেশ পালনের জন্য, না হয় পূর্ব্ববর্ণিতরূপে নিজের ব্রাহ্মণ্যাদি ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত, অস্পৃশ্যস্পর্শ, অপেয় পান ও অভোজ্য ভোজন পরিহার করিবে, ইহাই আমার পরামর্শ। এইরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণগণ অন্ত্যজের জলপানাদি কখনও করেন নাই। ইচ্ছাপূর্ব্বক অস্পৃশ্যস্পর্শেও চিরদিনই পরাঙ্মুখ কিন্তু ঘৃণা বিদ্বেষ কখনও কাহাকে করেন নাই, অদ্যাপি তাহা করিতেছেন না। যদি কেহ করেন, সে পাপের ভোগ তাঁহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। এস্থলে আর একটা পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; ইহাতে কোনরূপ পাপ বা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

ব্রাহ্মণ! তুমি কাহাকেও ঘৃণা করিও না, "অস্পৃশ্য অস্পৃশ্য" বলিয়া উপেক্ষাও করিও না। আবার কাহারও সহিত আলিঙ্গন করিতেও যাইবে না। তুমি নিজেই সকলের অস্পৃশ্য হও, তবেই নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত আপদ মিটিয়া যাইবে। যাহাতে তোমাকে অন্য কেহ স্পর্শ না করে, সেইরূপ ব্যবস্থা কর। আপনা হইতেই সকলে যাহাতে সভয় ভক্তির সহিত তোমার দূরে থাকে, সেইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার স্বর্গদ্বার অপাবৃত হইবে, সমাজ শান্তিময় হইবে। ভ্রাতৃব্য ব্রাহ্মণ! তুমি ব্রাহ্মণ হও, সর্ব্বদা ব্রহ্মণ্যনিরত হও, সন্ধ্যাহ্নিকাদি ব্রহ্মণ্যানুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্বদা আপনাকে সুপবিত্র রাখ, নিজেকে পূত করার জন্যই বাহু বক্ষঃ ললাটে পরম পবিত্র বিভূতি লেপন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ, আর নামাবলী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য চিহ্নগুলি সতত ব্যবহার কর, আত্মতত্ত্বের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখ, নিরন্তর সংসারের নশ্বরতাদি দোষ চিন্তা করিয়া অর্থ পুত্রকলত্রাদির প্রতি

অনাসক্তির অভ্যাস করিতে থাক, সকলের প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত ও ভাষা প্রয়োগ করিতে থাক, সকলের দুঃখের সহযোগী হও, নরক জ্ঞানে ভোগ বিলাসে বিরত হও এবং অবকাশ পাইলেই মৃগচর্ম্মাদি বিশুদ্ধ আসনে উপবিষ্ট হইয়া বেদান্ত মহাবাক্য পাঠে সময় যাপন কর। কোনরূপ কদাচার করিও না, কদাহার করিও না, কায়মনবাক্যে সতত সত্যপরায়ণ হও, ইন্দ্রিয়গণের সহিত অন্তঃকরণবর্গকে সংযত রাখ, সকলের প্রতি আশীর্ব্বাদনিরত হও; তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে, অন্য সমস্ত জাতি আপনা হইতেই তোমা হইতে একটু দূরে থাকিবে। কেহই আর তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এমন কি ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণগণও তোমার স্পর্শে সাহসী হইবে না। তবেই তুমি সকলের অস্পৃশ্য হইতে পারিবে। পান ভোজনের কথা আর কি বলিব। তুমি পান ভোজন করিবে ইহা কোন নিম্নশ্রেণীর লোক স্বপ্নেও মনে করিতে পারিবে না। এই ভাবে তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইলেই অস্পৃশ্য, অপেয় পানাদি সমস্ত দোষ নিজ হইতেই দূরপরাহত হইতে পারে। কাহাকে ঘৃণাও করিতে হয় না বিদ্বেষও করিতে হয় না। স্পর্শ করিব না পান করিব না বলিয়া কর্কশোক্তিরও প্রয়োজন নাই। শান্তির সহিত যাবৎ প্রকার আশঙ্কা ঘুচিয়া যায়। অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণগণ! এস আমরাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়া সকলের অস্পৃশ্য হই। আমা-দিগকেই যেন কেহ স্পর্শ করিতে সাহস করেন না। (বঙ্গবাসী)

ব্রজাঙ্গনার শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি

(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।)

মিরাবাই বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরূপগোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলে তিনি বলিলেন,—

"গোসাঞি কহেন মুঞি বনে করি বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ॥
এ কথা শুনিয়া বাই ক্ষোভ পাই মনে।
পুনঃ কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে॥
এত দিন শুনি নাই শ্রীমন্ বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥

পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদি অগম্য।
তেহ্‌ যে আইলা তাতে নাহি বুঝি মর্ম্ম॥
প্যারিজীর প্রিয় সখী ললিতা জানিলে।
কেমনে রহিবে তেহ্‌ অন্তঃপুর স্থলে॥
এতেক প্রহেলী যদি কহি পাঠাইলা।
শুনিয়া শ্রীরূপ কিছু লজ্জিত হইলা॥
কহিতে কহিলা পুনঃ বাইজীব স্থানে।
কৃপা করি আসি যেন দেন দরশনে॥
তবে বাই হৃষ্ট মনে গোসাঞিব স্থানে।
যাইয়া অষ্টাঙ্গ করি পড়িলা চরণে॥
পরম সুন্দরী বাই অলপ বয়েস।
গোপী উদ্দীপনে রূপের হইল প্রেমাবেশ॥
দুই জন পরস্পর কৃষ্ণ কথা রসে।
মগন হইল প্রেম-আনন্দ-উল্লাসে॥

ব্রজ প্রেম বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, সেই রসিক শেখর কানাইয়া লালই একমাত্র পুরুষ।

এই রাসলীলা উচ্চাঙ্গের সাধনার কথা। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ না হইলে সাধারণ জীবে এই উচ্চ অবস্থার কথা ধারণায়ও আনিতে পারে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, আপ্তকাম। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁহাতেই ত বর্ত্তমান। তিনি ত আপনার আনন্দেই পূর্ণ, তাই তিনি আত্মারাম। তিনি আপনাতে পূর্ণ তাঁহার কোন অভাব নাই তাই তিনি আপ্তকাম। তবে তিনি ভক্তের কাছে চির বিক্রীত। তাই গোপীরা তাঁহাকে স্বামী ভাবে চাহিয়া পাইয়াছে; আত্মায় আত্মায় নহে স্থূল দেহেই তাঁহারা তাঁহার বহু বল্লভ মূর্ত্তির আলিঙ্গন ও সম্ভোগাদিও লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ভাগবতকার যে বলিতেছেন তিনি আপনাতে শুক্র অবরুদ্ধ রাখিয়া অনুরক্তা গোপাঙ্গনাগণের সহিত শৃঙ্গার রস সম্ভোগে চন্দ্রালোকিত সেই সমুদায় শারদ রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন" এ কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। শাস্ত্রকার বলিতেছেন বিন্দুপাতই মৃত্যু এবং বিন্দু ধারণই জীবন। এখন যাঁহাকে আমরা ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি তিনি যে বিন্দু পাত করেন নাই ইহা কি আমরা ধারণা করিতে পারিব না। ব্রহ্মা শিবও মদন বাণে ব্যথিত হইয়াছেন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

অপর নাম মদন মোহন। আরও আমরা দেখিতেছি এই রাস রজনীতে সেই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ শত শত নানাভরণ ভূষিতা রস কেলি কলাভিজ্ঞা অত্যনুরাগ নবযৌবন সম্পন্না তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা যুবতীবৃন্দের সহিত সুরত ক্রীড়া করিয়াও আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ ছিলেন। ইহাই কাম জয়। এইখানেই তাঁহার মদন মোহন নামেব সার্থকতা। শুক্র স্খলনই ত কামের ধর্ম্ম। কিন্তু তিনি ত কামের অধীন নহেন। আব এতদুপলক্ষে মহাত্মা শ্রীধর স্বামীব বাক্য "এবমপি আত্মন্যেব অবরুদ্ধ সৌরতশ্চরম ধাতুর্ন তু স্খলিতো যশ্বেতি কাম জয়োক্তিঃ।" স্মরণ করিতে হইবে।

জীবেব চরম আস্বাদ্য পরম পবিত্র এই রাস লীলা আমরা অতি সংক্ষেপে মাত্র আলোচনা করিয়া গেলাম। বিশেষতঃ সাধন ভজন দ্বারা শক্তি লাভ না হইলে এতদ্বিষয়ে আলোচনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। ব্রজাঙ্গনাব শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের তুলনা নাই। কথিত আছে, কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, দ্বারকার মহিষীগণ ও গোপাঙ্গনাগণের মধ্যে কাহারা তাঁহার অধিকতর অনুরক্তা?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসা এখনই করিয়া দিতেছি। আপনি দ্বারকায় গিয়া মহিষীদিগকে বলুন যে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) অত্যন্ত পীড়িত আর তাঁহাদের পদধূলি মাথাইতে পারিলেই এই পীড়া আরোগ্য হইবে। নারদ মহিষীগণের জনা জনার নিকট গমন করিয়া ঠাকুরের সংবাদ প্রদান করিলেন কিন্তু তাঁহারা কেহই পদধূলি দিতে সাহস করিলেন না। অতঃপর দেবর্ষি বাসুদেবের পরামর্শ মত ব্রজাঙ্গনাগণের নিকট গিয়া শ্রীকৃষ্ণেব উৎকট পীড়ার সংবাদ দিয়া পদধূলি প্রার্থনা করিলে তাঁহারা প্রিয়তমেব পীড়ার সংবাদে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া আপন আপন পদধূলি দিয়া পুঁটুলি বাঁধিয়া নারদেব মাথায় চাপাইয়া দিলেন। আর বলিলেন ঠাকুর তুমি বিলম্ব করিও না এখনই ইহা লইয়া যাত্রা কর।

নারদ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর বলিলেন, নারদ! দেখিলে, গোপীকারা আমা অন্ত প্রাণ, আমার হিতের জন্য তাহাদের স্বর্গ নরক জ্ঞান নাই। আমার হিতের জন্য তাহারা তাহাদের পদধূলি তোমার মাথায় তুলিয়া দিতেও একটুকু দ্বিধা করে নাই। সুতরাং এমন যে গোপী-প্রেম এ প্রেমের কি তুলনা আছে? এখন দেখা যাউক আমাদেব মহাপ্রভু এই জলন্ত প্রেমের কি সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া যে সুখ অনুভব করেন, তাহা কত মধুর, তাহা আস্বাদ করিবার নিমিত্তই তিনি শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ। প্রভু এই সুমধুর ব্রজলীলা আপনি আচরিয়া আর যেখানে তাহার সম্ভাবনা নাই; সেখানে বর্ণনা করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ইহাই প্রভুর গম্ভীরা লীলা। গম্ভীরা লীলায় প্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। আর এই লীলায় প্রভু কর্ত্তৃক প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ রস প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের সীমা নাই। প্রভু রাধা ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিরহ-কাতর চিত্তে বলিতেছেন, সখি! আমার ভাগ্যের সীমা নাই। দেখ কৃষ্ণকে সকলেই ভালবাসে। এমন কি আমি যেমন ভালবাসি—এই ব্রজে কে না শ্রীকৃষ্ণকে সেইরূপ ভালবাসে? এই ব্রজে আমার মত কত কত রূপসী রমণী রহিয়াছে। কিন্তু তিনি আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন। সখি! আমার কি সৌভাগ্য! আবার উর্দ্ধে চাহিয়া হাত যোড় করিয়া বলিতেছেন, "নাথ! তোমার বড়ই করুণা, তোমার ঋণ ত আমি শোধিতে পারিব না। মা দুর্গা তোমায় চিরদিন সুখে রাখুন। আমার যত কিছু শুভ আছে সব তুমি লও।" প্রভু রাধা ভাবে এই সব বলিতেছেন। চক্ষু দিয়া অবিরত ধারা পড়িতেছে। প্রাণনাথের গুণাবলী স্মরণ করিয়া ক্রমে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেছেন না। স্বরূপের গলা ধরিয়া অঝোরে ঝুরিতে লাগিলেন। এখানে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে অনুকূল নাগরের পদ দিয়াছেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার নিখুঁত ছবি শ্রীগৌর আমার গম্ভীরা গৃহে বসিয়া প্রকটীত করিয়া গিয়াছেন। জীবের প্রতি প্রভুর এ করুণার তুলনা নাই। মহাজনগণ তাঁহাদের অতুলনীয় পদাবলী সাহায্যে তৎকালীন গোরাচাঁদের কি সুন্দর চিত্র আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন দেখুন—

বিরহ ভাবে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর ভূমে পড়ি মুরছয়।

* * *

পুনঃ পুনঃ মুরছি অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে হয় কত ত্রাস॥
উচ্চ করি ভকত বলে হরিবোল।
শুনিয়া চেতন পাই আঁখি ঝরু লোর॥

গৌর ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই মহাবিরহের প্রেম-চিত্র আমাদের চিত্ত ক্ষেত্রে অক্ষুন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার সৌভাগ্য লাভ হয়। জয় শ্রীগৌরহরি!

আবাহন-গীতি

(শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক)

এস প্রেমময় নারায়ণ।
এস বাঞ্ছিত মন বিমোহন,
প্রাণে প্রাণে আনি' জাগরণ।
এস দেব, দীন-মন্দিরে—
সঞ্জীব কর শুষ্ক পরাণ
মুক্ত কর গো বন্দীরে।
এস ত্রিভুবন-বন্দন,
গানে ও গন্ধে ভরিয়া ভুবন
এস হে শ্রীনন্দ-নন্দন।

দেশবন্ধু ও শ্রীগৌরাঙ্গ

মাননীয় "ভক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে সমগ্র দেশবাসী শোক সন্তপ্ত। যিনি যেপ্রকারে পারেন, সকলেই পরলোকগত মহাত্মার গুণকীর্ত্তন করিয়া তৎপ্রতি আপন আপন হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। কিন্তু, অনেকেই হয় ত জানেন না যে, তিনি একজন কত বড় বৈষ্ণব ছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার কতদূর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁহার কার্য্যে ও ব্যবহারে, বক্তৃতায় ও প্রবন্ধাদিতে নানাভাবে এই গৌরাঙ্গ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লিখিত "কবিতার কথা" ও "বাঙ্গালার গীতি-কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটিতে সেই প্রীতি অতি উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার গৌরাঙ্গ-প্রীতি ও বৈষ্ণবীয় ভাব সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুহ সঙ্কলিত করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা আমারপক্ষে অসম্ভব।

"ভক্তি"র পাঠক পাঠিকাদিগের জন্য সাময়িক পত্র ও প্রবন্ধাদি হইতে কয়েকটি অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। ইহা হইতে দেশবন্ধুর অপূর্ব্ব ত্যাগ ও সাধনার

মূল উৎস যে কোথায় তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমমূর্ত্তিই যে তাঁহার জীবনকে সব সংস্কার মুক্ত করিয়া পরিবর্ত্তনের পথে আনিয়াছিল, এ কথা তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাপ্রাণ দেশভক্তের এই স্বীকারোক্তি বৈষ্ণবের চক্ষে অতি অপূর্ব্ব সামগ্রী। যদি ইহা "ভক্তি"র পাঠক পাঠিকাদিগের মনোরঞ্জন হয় এবং কেহ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করেন তাহা হইলে বাধিত হইব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়

"আমাদের দেশে ধর্ম্ম-সাধনার একটা গূঢ় মর্ম্ম আছে যেটা না ধরতে পারলে সে ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী ও সাধকদের ভিতর সেই মর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়। বিজয়কৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করলে বোধ হয়, তিনিও তাঁর গুরুর সাহায্যে সেই মর্ম্মস্থলে প্রবেশ ক'রে ছিলেন। রামকৃষ্ণের জীবনে সেটা বেশ পরিস্ফুট ছিল। বলতে কি, গৌরাঙ্গের জীবনী পাঠ ক'রে আমি প্রাণে একটা সাড়া পেয়েছিলাম। বর্ত্তমান কালের artificial life কিম্বা artificial religion আমাকে বিন্দুমাত্র তৃপ্তি দিতে পারে না। বাংলা দেশকে বুঝতে হ'লে গৌরাঙ্গ ছাড়া বুঝা যায় না। গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব জীবন ও সাধনা এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী গান আমাকে নূতন আলো দেখিয়েছে। আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় যদি কোনও সাধু মহাপুরুষ আমাকে সেই মর্ম্মস্থলে পৌঁছিতে সাহায্য করেন। * * * * আমার জীবনের পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। সঙ্গদোষে জীবনে নানা রকম দোষ আমার ঘটেছে, কিন্তু গৌরাঙ্গের আত্মহারা প্রেমমূর্ত্তি আমার সব সংস্কার, সব দোষ দূর ক'রে দিচ্ছে ও দিয়েছে। মহা প্রেমের—মহা ভাবের কি মহান্ পরিপূর্ণ আদর্শ! আমার মনে হয় এই সাধন রহস্য জানা মহাপুরুষদের সাহায্য সাপেক্ষ।"

("বঙ্গবাণী," চিত্তরঞ্জন সংখ্যা)

"এই নরদেহ ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া অজ্ঞ, বৃদ্ধ, শ্রান্ত, তৃষিত, তাপিতের জন্য যে করুণা মহাপ্রভুতে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে আমরা তাহার জীবন্ত, সজীব, জাগ্রত মূর্ত্তির ভাব পাই। যখন কলসীর কাণায় কপাল কাটিয়া দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে, তখন নিতাই গাইতেছেন—

"মেরেছ কলসীর কাণা
তা ব'লে কি প্রেম দেব না?"

এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন প্রাণ এক অদ্ভুত নব-রসে উছলিয়া উঠে, আঁখি ছলছল করে, মনে হয় আমার জন্ম সার্থক, সার্থক আমি বাঙ্গলায় জন্মিয়াছি।"

"বৈষ্ণব কবিদিগের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের রাধা, তাঁহাদের জীবনের প্রাণের মর্ম্মে শতদলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগলরূপই বাঙ্গালার সভ্যতা, সাধনা, শিক্ষা, দীক্ষার মধ্যে শত শত বিচিত্ররূপ প্রকাশিত করিয়াছে। বাঙ্গলা দেশকে নূতন করিয়া বৈষ্ণব হইতে হইবে না। বাঙ্গলা যে প্রাণে বৈষ্ণব।" ("বাঙ্গলার গীতি-কবিতা")

(চিত্তরঞ্জনের একটি গান)

নামিয়ে দাও জ্ঞানের বোঝা সইতে নারি বোঝার ভার।
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে নয়নে হেরি অন্ধকার॥
সেই যে শিরে মোহন চূড়া সেই যে হাতে মোহন বাঁশী,
সেই মূরতি দেখবো ব'লে পরাণ আমার অভিলাষী,
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও শ্যাম আলো করি কুঞ্জ-দুয়ার,
এস আমার হৃদয় মাণিক বেদ বেদান্তে কায কি আমার।

("ভক্তি"সম্পাদক কৃত কীর্ত্তন-গীতি-সংগ্রহ)

প্রশ্ন

(শ্রীযুক্ত ব্রজহরি ওয়াদ্দাদার)

১। পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে সকল আদিরস ঘটিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ কি? এবং ঐ সকল মূর্ত্তি মন্দির নির্ম্মাণের সময় হইতেই আছে কিম্বা পরবর্ত্তীকালে স্থাপিত হইয়াছে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট সময় ঐ ভাবের মূর্ত্তি ছিল কি না?

২। শ্রীমন্দির কতদিনের স্থাপিত এবং পশ্চিমদিকে প্রধান দরজা কেন?

৩। ব্রহ্ম হরিদাস যে দৈনিক তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন সে কোন্ নাম? যদি তারকব্রহ্ম নাম হয় তবে স্নানাহারের ও নিদ্রার সময় কই? ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে আলাপাদিও করিতেন, দেখা যায় ২১৬০০ বার অজপা (দৈনিক)। একবার অজপাতে বহুবার নাম করিতেন শোনা যায়।

আশা করি পাঠকগণ "ভক্তি" পত্রিকায় আমার এই তিনটী প্রশ্নের সদুত্তর দানে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

১। **শ্রীশ্রীবাদশগোপাল**—লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বৈষ্ণবসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট প্রণীত। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশজন পরিকর সম্বন্ধে যত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিতে পারে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার পরিব্রাজক রূপে প্রতি শ্রীপাটে ভ্রমণ করিয়া তৎ সমুদয় সংগ্রহ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ভাণ্ডারে উক্ত অমূল্যরত্ন উপহার প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পারিষদবর্গের লীলা-নিকেতন বা পদাঙ্কিত ভূমি ভক্তের নিকট মহাতীর্থ। এতদিন এই পুন্যভূমিগুলি সাধারণের নিকট এক প্রকার অজ্ঞাতই ছিল। পঞ্জিকাতে স্থানগুলির নাম থাকিলেও তাহার নির্ণয় খুব অল্প ভক্তেই জানিতেন। ভট্ট মহাশয়ের গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ায় এইবার সকলেই অনায়াসে উক্ত শ্রীপাটগুলি পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারিবেন। পথ পরিচয়াদি কোন বিষয়ের জন্যই আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শ্রীপাটের ইতিহাস আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই। গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের পরিশ্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রত্যেকেরই উচিত। মূল্যও বেশী নয়, মাত্র ১৲ টাকা গ্রন্থকারের নিকট পোঃ পানিহাটী; ২৪ পরগণা অথবা ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা দেবকীনন্দন কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

২। **বৃহৎ বৈষ্ণব-চরিত অভিধান**:—এখানিও উক্ত ভট্টমহাশয়ের প্রণীত, মূল্য প্রথম খণ্ড ৸৹ আনা। উপরের ঠিকানায় পাওয়া যায়। এখানিতে বর্ণমালা অনুসারে প্রাচীন প্রায় ৬।৭ হাজার গৌর-ভক্তের বা বৈষ্ণব সাধুর জীবনচরিত প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম-খণ্ড যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে স্বরবর্ণ শেষ হইয়া ব্যঞ্জন বর্ণের "চ" অক্ষরের নাম মালা চলিতেছে।

যাবতীয় প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ মন্থন করিয়া এই অভিধানখানি সঙ্কলন করা হইয়াছে। আমরা ভট্ট মহাশয়ের গৃহে ইহার সমুদয় পাণ্ডুলিপি দর্শন করিয়াছি, সে বিরাট ব্যাপার। মুদ্রিত গ্রন্থে একা "কৃষ্ণদাস" শব্দে ২৮ জন "কৃষ্ণদাস" নামা প্রাচীন গৌড়ীয় ভক্তের পরিচয় দেখিলাম। এইরূপ যে নামটী দেখি, তাহাতেই কত নূতন নূতন ভক্ত ও তাঁহার লীলা কাহিনী পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়া যাই। এইগুলি সংগ্রহ করিতে গ্রন্থকারকে যে কত বৎসর

ধরিয়া কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে ও কত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে তাহা ভাবিয়া ভট্টমহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিকট এই অভিধানখানি যে কি মহামূল্য রত্ন হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। একমাত্র এই অভিধানখানি গৃহে থাকিলে ভক্ত কাহিনী জানিবার জন্য আর রাশি রাশি গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে হইবে না।

ভট্ট মহাশয় যদি গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে একমাত্র এই গ্রন্থ দ্বারাই তিনি কেবল বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট নহে ভারতের সমুদয় হিন্দুর নিকট চিরজীবী হইয়া থাকিবেন।

আমরা ভক্তির গ্রাহক অনুগ্রাহক সকলকেই ভট্টমহাশয়ের গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

নিবেদন

ইতিপূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি "শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল" নামে, গৌড়মণ্ডলের একখানি ভৌগলিক গ্রন্থ সঙ্কলিত হইতেছেন। এই গ্রন্থে বিস্তৃত গৌড়মণ্ডলের যাবতীয় বৈষ্ণব সংক্রান্ত স্থানগুলি বর্ণমালা ক্রমে সজ্জিত ও বর্ণিত হইয়া প্রত্যেক জেলার পৃথক মানচিত্রে প্রদর্শিত হইবে। বিরাট বৈষ্ণব সমাজ কি প্রকারে গৌড়মণ্ডলে বিস্তৃত, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ, পরিকর ও সিদ্ধ ভক্তদিগের বিলাস ভূমি সকল, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান বংশধরদিগের বাসস্থান, প্রাচীন শ্রীবিগ্রহদিগের বিবরণ ও শ্রীপাট, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীনরহরি ঠাকুর ও শ্রীঅভিরাম ঠাকুর প্রভৃতি গুরু পরিবারের বংশ ও শাখা বিস্তার ইত্যাদি বৈষ্ণবের যাহা কিছু এই একখানি গ্রন্থে নখদর্পণের ন্যায় প্রদর্শিত হইবে। বর্ত্তমান যথেচ্ছাচারের যুগে এইরূপ একখানি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বৈষ্ণব মাত্রেরই অনুভব করিবার কথা। হায়! যথেচ্ছারের কথা আর কি বলিব? বৈষ্ণব সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ প্রাচীন গুরুকুল, গোস্বামী ও সিদ্ধ-বংশীয়দিগের বংশগৌরব অস্বীকার করিয়া, দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, মহান্ত, প্রভুপাদ, আচার্য্য, অধিকারী প্রভৃতি সৃষ্ট হইতেছেন! এই ঘোর বৈষ্ণব-বিপ্লবের দিনে প্রাচীন বৈষ্ণব-পরিবার কি "তরোরিব সহিষ্ণু" হইয়া এই অত্যাচার

উপেক্ষা করিয়াই বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য দেখাইবেন? তবে প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজ কিরূপে রক্ষিত হইবে? শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ, পরিকর, ভক্ত ও সিদ্ধ বংশধরগণ, যিনি যে স্থানে বাস করিতেছেন, বিরাট বৈষ্ণব সমাজের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্যের কথা একবার স্মরণ করিয়া আত্মপরিচয় ও বংশ-গৌরবের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সকলে সমবেত ও একপ্রাণ হইয়া এই বৈষ্ণব-বিপ্লবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউক। নতুবা, অচিরে এই কল্পিত ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, মহান্ত, অধিকারী ও আচার্য্যের স্রোতে আপনাদিগকে ভাসিয়া যাইতে হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যের অভিন্ন প্রেমাবতার শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বহু বিস্তৃত বংশধরগণ! আজ গৌড়ের যে বৈষ্ণবতার আমরা গৌরব করিতেছি, ইহার মূলে আপনাদের সেই শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভু, ("যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কাঁহা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥") শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজাভিষ্ট ও বৈষ্ণবের প্রাণ যে পরকীয়া ভাবাত্মক ভজনের আজ আমরা গৌরব করিতেছি, আপনাদের শ্রীশ্রীপ্রভু রাধামোহন না থাকিলে, দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে ইহার লেশ মাত্রও থাকিত না। গৌড়ের বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণব-সমাজ আপনাদিগের নিজস্ব সম্পত্তি এবং আপনারাই ইহার রক্ষাকর্ত্তা। আর একবার জাগরিত হইয়া সেই গোস্বামীদিগের প্রদর্শিত আদর্শ বৈষ্ণবতার বিস্তার করুন। যথেচ্ছাচারের প্রবল স্রোত হইতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে রক্ষা করুন।

যদি প্রভুর ইচ্ছায় "শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েন, তবে দেখিবেন আমার এই উদ্যমের মূলে কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে। অদ্যাবধি গৌড়মণ্ডলের প্রায় ৪০০ বৈষ্ণব তীর্থের বিবরণ সংগ্রহ ও সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার প্রায় অধিকাংশই শ্রীপাট পানিহাটি নিবাসী আমাদের পরম সুহৃৎ শ্রীযুত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, শ্রীপত্রিকাগুলিতে পুনঃ পুনঃ কাতর প্রার্থনা করিয়াও সেরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছি না। অনেকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও কিছুই করিতেছেন না। আমার একান্ত ইচ্ছা গ্রন্থখানি যাহাতে প্রথম উদ্যমেই সম্পূর্ণ হয়। কৃপাময় বৈষ্ণবগণ! এ বিষয়ে যিনি যাহা পারেন, এই সময় আমাকে সাহায্য করুন। আপন আপন বংশ-গৌরব এবং সেবিত প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ ও বাসস্থানের পরিচয় প্রভৃতি ঐ সংক্রান্ত বিবরণ যিনি যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন এই সময় আমার নিকট নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

মৎপ্রণীত "বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনীর" দ্বিতীয় সংস্করণও আরম্ভ হইয়াছে—গ্রন্থখানি

যে উপায়েই হউক একবার সংগ্রহ করিয়া আমার ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটিগুলি আমাকে প্রদর্শন করিয়াদেন এবং প্রকটাপ্রকট যে সকল ভক্তদিগের নাম গ্রন্থকলেবরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই কিম্বা পরবর্ত্তী সংস্করণে উল্লেখযোগ্য, তাঁহাদিগের নাম ও পরিচয় সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দেন—এই আমার কাতর নিবেদন। "বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনীর বিষয় বিজ্ঞাপনপৃষ্ঠায় দেখুন।"

শ্রীমুরারিলাল অধিকারী

১৮।১এ অখিল মিস্ত্রীলেন কলিকাতা।

আলোচনা

বৈষ্ণব-সাপ্তাহিক "পল্লীবাসী"র সহিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকার খুবই কথার কাটাকাটি চলিয়াছে। আমরা বলি, দুই জন সম্পাদকই ত বৈষ্ণব সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনালইয়াইত তাঁহারা নিজ নিজ কাগজ লিখিয়া থাকেন। যদি কোন বিষয়ে মতের অমিল হয় সেটা সাধারণে প্রকাশ না করিয়া ঘরোয়া ভাবে মীমাংসা করিলে চলে না? "সোণার গৌরাঙ্গ" নামক একখানি মাসিকের নাম কাগজে দেখিতেছি (যদিও তাহার কোন সংখ্যা আমরা পাই নাই।) গোস্বামী মহাশয়ের মতের সহিত তাহাদের মতের মিল নাই ইহা গোস্বামী মহাশয়ের কাগজ পাঠে আমরা জানিতে পারি। এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনায় যে কয়জন কর্ম্মী কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন সকলে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া ঝগড়া কেন করেন বুঝি না। আমাদের মনে হয় অন্য সম্প্রদায়ের কবাল কবল হইতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে এক এক জন একা যত না শক্তি পাইবেন, সম্মিলিত চেষ্টায় তাহার বহুগুণ বেশী হইতে পারে। প্রবীন বৈষ্ণব-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় যে ভাবে গৌর-কথা কীর্ত্তন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিকট পরিচিত তাহাতে তিনিই সকলকে একত্রে মিলাইয়া মিশাইয়া প্রাণভরিয়া গৌরগুণ সম্প্রদায়কে শুনাবার ভার লউন ইহাই আমাদের নিবেদন।

* * *

ভক্তির একজন বিশেষ শুভানুধ্যায়ী পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন যে, "তরজার লড়াই ভক্তির শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ না হইলেই ভাল হয়।" আমরা যথার্থই এটা ভাল বাসিনা তবে সময় সময় একই সম্প্রদায়ের ভাই ভাই যেভাবে তান ধরেন, তাহাতে দুঃখিত হইয়াই দু'চার কথা বলিতে বাধ্য হই। আমাদের কাহারও সহিত ঝগড়া নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি সকলে মিলিয়া মিশিয়া সম্প্রদায়ের কাজ করুন।

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২৪শ বর্ষ } ভক্তি { আশ্বিন মাস
২য় সংখ্যা } { ১৩৩২

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

আনন্দময়ীর আবাহন

(রায়সাহেব ৺দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় রচিত)

এস মা আনন্দময়ী উদয় হও মা মহীতলে।
জীবের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখে যা সর্ব্বমঙ্গলে॥
শুনি মা বেদে পুরাণে,
আছ তুমি সর্ব্বস্থানে,
আমি গো বুঝেছি মনে (তুমি) লুকিয়ে থাক হিমাচলে॥
নৈলে কি হয় এ দুর্দ্দশা,
চৌদিকে হেন নিরাশা,
বারে বারে যাওয়া আসা (তায়) পীড়ন করেগো কালে॥
জননী জগদীশ্বরী,
সন্তান তার ভিখারী,
এ লীলা বুঝিতে নারি (আর) ভুলাস্‌নে অজ্ঞান বলে॥
দারা সুত ধন পেয়ে,
রয়েছি তোরে ভুলিয়ে,
সেই রোষে না দেখ চেয়ে, সে যে শুধু মায়ার ছলে॥
জনক পাষাণ তব,
পতি যে তোর সদাশিব,
সতী নিন্দে পতির ভাব, না শুনি যে কোনকালে॥

আগমনী গীত

(শ্রীমৎস্বামী সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ রচিত)

[রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা]

শারদীয় শশী উদিত গগনে
আয় মা ঈশানী দুর্গে নারায়ণী।
আয় মা শারদে কুলদে বরদে
অভয়ে যশোদে দ্রবিণ দায়িনী॥
মহালক্ষ্মী বাণী সঙ্গে মা ভবানী,
ভবপতিরাণী গণেশ জননী,
এস মহাবিদ্যা ব্রহ্ম স্বরূপিণী
উমা মহাকালী মঙ্গলরূপিণী॥
ল'য়ে ষড়াননে প্রসন্ন বদনে,
সিদ্ধিদাতা সুত মূষিক বাহনে,
এস মা বিজয়া জয়াদির সনে
দরিদ্র ভবনে শঙ্কর ঘরণী॥
পূজিব চরণ জবা বিল্বদলে
ভাসিয়ে সকলে নয়ন সলিলে,
হেরি ভক্তিভরে (ঐ) বদন কমলে
আনন্দে যাপিব দিবস যামিনী॥
মহিষমর্দ্দিনী মৃগেন্দ্র বাহিনী,
সুরানন্দরূপা দনুজ দলনী,
কলুষ হারিণী বিপদ নাশিনী
শিব বিধায়িনী ত্রিলোক তারিণী॥
শিশুবালকৃষ্ণ ডাকে সকাতরে,
এস দশভুজে প্রতি ঘরে ঘরে,
সন্তান সন্ততি রক্ষ কোলে ক'রে
দুর্গে তারা শিবে শিব-স্বরূপিণী॥

যদুবংশ ধ্বংস ও কংসের পথ

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন বি, এ, লিখিত)

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রারম্ভেই কংশের কথা বলা হইয়াছে। যাঁহারা তত্ত্বরূপী কংস বা নিত্যকংসকে ধরিতে চাহেন তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ অংশ ধীরভাবে আলোচনা করিলে পৌরাণিক ঋষির যাহা অভিপ্রায় তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রথমে কংসের কথা, আর একাদশ-স্কন্ধের প্রথমে যদুবংশের ধ্বংসের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। কংশের ভিতরে যাহা ছিল তাহা যে কেবল কংসের মধ্যেই ছিল তাহা নহে, অল্প বিস্তর পরিমাণে অনেকের মধ্যেই ছিল। কেবল ছিল বলিতেছি কেন, আছে এবং থাকিবেও।

কংস বধ হইয়া গেল কিন্তু কংসের বিষ গেল না। ক্রমে ক্রমে জরাসন্ধ গেলেন, শিশুপাল দন্তবক্র গেলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধন দুঃশাসন গেলেন কিন্তু বিষ গেল না। শেষে যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল, দ্বাপর গেল কলি আসিল, কলিরও পাঁচহাজার বৎসর হইয়া গিয়াছে কিন্তু কে বলিবে কংস নাই? কে বলিবে কংস ধ্বংস হইয়াছে? পুরাণের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে—শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে নিত্য লীলার এই রহস্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদুবংশ কি প্রকারে ধ্বংস হইল তাহার আলোচনা করিলে আমরা ঐ কংস-কেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে কংসের কথা শুনিয়াও যদি কেহ ঠিকমত কংসকে না বুঝিতে পারিয়া থাকেন তাহা হইলে একাদশ স্কন্ধের এই যদুবংশ ধ্বংসের কথা শুনিবেন, কংসকে বুঝিতে অনেকটা সুবিধা হইবে।

মহাভারতে মৌসল পর্ব্ব বলিয়া একটী পর্ব্ব আছে, সেখানে আটটী অধ্যায়ে এই করুণ ও ভীষণ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই একই কথা, কিন্তু বর্ণনার একটু প্রভেদ আছে। মহাভারত ইতিহাস আর শ্রীমদ্ভাগবত কেবল পুরাণ নহে, মহাপুরাণ এ কথাটিও মনে রাখা দরকার।

মহাভারতের মৌসল পর্ব্বে উগ্রসেনের কথা নাই কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় উগ্রসেনের কথা আছে। উগ্রসেন কংসের পিতা, কংসের যাহা ধর্ম্ম তাহা উগ্র-সেনের মধ্যেও ছিল। তবে পিতার মধ্যে যাহা বেশ ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই, পুত্রের মধ্যে তাহা সুপরিস্ফুট। কাজেই কংসকে বেশ ভাল করিয়া চিনিতে হইলে এই যদুবংশ ধ্বংসের বেদনাময়ী কথা একবার স্মরণ করার লাভ আছে।

ব্যাপার কি শুনুন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারতবর্ষের বড় বড় রাজবংশ অনেক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা আছেন তাঁহাদেরও অবস্থা মলিন, সে শৌর্য্য বীর্য্য আর নাই। এখন যদুবংশের সম্মান খুব অধিক। রাজসূয় যজ্ঞের দিন ভীষ্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করিতে, কারণ ভীষ্মই সর্ব্বপ্রথম বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই ভারতবর্ষের আত্মা। শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ তাহার সেদিনের যুগবাণী ঘোষণা করিতেছিলেন। দেবব্রত ভীষ্ম তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার ফলে বুঝিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণই কালাত্মা। কিন্তু তখনও শিশুপাল প্রবল, ভীষ্মের চেষ্টা সফল হয় নাই। বাঁচিয়া থাকিতে ভীষ্ম যাহা করিতে পারেন নাই স্বেচ্ছায় শরশয্যা আশ্রয় করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া তাহা কিয়ৎ পরিমাণে করিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ এখন ভারতবর্ষে অবশ্য মৃতপ্রায় দুর্ব্বল ভারতবর্ষে স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের দ্বারা যদুবংশ এখন ভারতবর্ষে একরূপ সর্ব্বোচ্চ সম্মানের স্থান লাভ করিয়াছে। বংশের সম্মান খুব বাড়িয়াছে কিন্তু বংশের ছেলেগুলি সেই সম্মানের উপযুক্ত হয় নাই, কেবল তাহাই নহে, যাহার জন্য এই সম্মান তাঁহাকেও ভাল করিয়া চিনিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে পারে নাই।

ভিতরের এই অবস্থা শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িল। বিশ্বামিত্র, নারদ প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণ একদিন দ্বারকা নগরের পথে যাইতেছেন। যদুবংশীয় বালকগণ পথে খেলা করিতেছে, মহর্ষিদিগকে দেখিয়া তাহাদের মনে হইল এই সব প্রাচীন মহর্ষি, ইহাদের সহিত যদি কৌতুক করা না যায়, তাহা হইলে জীবনই বিফল? কি প্রকারে কৌতুক করা যাইবে তাহা নির্ণয় করিতে বিলম্ব হইল না, মস্তিষ্ক খুব উর্ব্বর। জাম্বুবতীর পুত্রের নাম শাম্ব। শাম্ব বালক, দেখিতে স্ত্রীলোকের মত, একজন শাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রীলোক সাজাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া মহর্ষিগণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। যথারীতি প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করা হইল—"দেখুন, আপনারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই জানেন, এই বালিকাটী গর্ভবতী, ইহার কি সন্তান হইবে তাহা জানিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু লজ্জায় কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না; আপনারা দয়া করিয়া যদি বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা বড়ই অনুগৃহীত হই।

প্রাচীন মহর্ষিগণ বালকদিগের ব্যবহার বুঝিলেন, তাঁহারা যে রুষ্ট হইলেন তাহা নহে। তাঁহারা যেন ধ্যানযোগে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা অনুভব করিয়া বলিলেন—"ইহার গর্ভে একটী কুলনাশন মুসলের জন্ম হইবে।" এই বলিয়া মহর্ষিগণ চলিয়া গেলেন।

শাম্বের উদর কিসের দ্বারা স্ফীত করা হইয়াছিল তাহা সকলে জানিত না। মহর্ষিদের কথা শুনিয়া তাহারা উপরের আবরণ বস্ত্র সরাইয়া দেখিল, সত্যই মুসল রহিয়াছে। একটু চিন্তা হইল। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—"একটা মুসলের জন্ম হইবে এবং সেই মুসল তোমাদের কুলনাশক হইবে।" ঋষিরা যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেক অংশ ফলিয়াছে। শাম্বের উদরে কাপড়ের নীচে যে মুসল আছে ইহা মহর্ষিগণ কেমন করিয়া বুঝিলেন? প্রথম অর্দ্ধাংশ যখন মিলিয়াছে তখন শেষ অর্দ্ধাংশও ফলিতে পারে। বালকগণের মনে এই প্রকারের একটা ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহারা ঐ মুসলটি লইয়া উগ্রসেনের নিকটে গেল। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যায় নাই, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের কথা। মহাভারতের বর্ণনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্থানে একটু প্রভেদ আছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করিতেছি। উগ্রসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া বালকেরা যখন সকল কথা বলিল, তখন উগ্রসেন বালকদের তিরস্কার করিলেন না, বা তাহাদিগকে বলিলেন না যে, মহর্ষিগণের চরণে ধরিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর।

উগ্রসেন চিন্তা করিতেছেন। কংস দৈব-বাণীতে শুনিয়াছিল—"দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র তোর হন্তা হইবে।" এই কথা শুনিয়া কংস যে পদ্ধতিতে চিন্তা করিয়াছিল মহর্ষিগণের অভিশাপ বা ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া উগ্রসেনও ঠিক্ সেই পদ্ধতিতে চিন্তা করিলেন। কংস ভাবিয়াছিল—"দেবকী আধার, আর আমার মৃত্যু এই আধারকে আশ্রয় করিয়া আসিবে, সুতরাং আজ যদি এই আধার নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আর মরণ কি প্রকারে আসিবে?" উগ্রসেনও চিন্তা করিল, এই মুসলটি কারণ, এই মুসলের সাহায্যেই যদুবংশের যে বিনাশ তাহা আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং বিনাশের যন্ত্ররূপী এই মুসলটি যদি এখনই নষ্ট করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে কুলনাশ আর কি প্রকারে আসিবে?"

বসুদেবের জন্য কংস দেবকীকে বিনাশ করিতে পারে নাই। বিনাশ করিলে কি প্রকারে কংসের মৃত্যু আসিত তাহা আমরা জানি না, তবে মৃত্যু যে আসিত, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা যে অবশ্যই ঘটিত ইহাতে আমাদের কোনরূপ সন্দেহ নাই। উগ্রসেন ব্যবস্থা করিলেন—"এই মুসলের দ্বারা কুল নাশ হইবে, আচ্ছা এই মুসলটিকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দাও, কেমন করিয়া মরণ আসে দেখা যাউক।"

উগ্রসেনের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যে পরিণত হইল। মুসলটিকে চূর্ণ করা হইল।

সমগ্র মুসল চূর্ণ হইল না, তাহার ভিতরের সামান্য একটু অংশ যেমন তেমনই থাকিয়া গেল। সমস্তটা সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই লোহার গুঁড়ার সহিত সমুদ্রের জলের যোগ হইলে কি যে রাসায়নিক ক্রিয়া হইল তাহা ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন। লৌহ চূর্ণগুলি সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আসিয়া প্রভাসের সমুদ্রতীরে সংলগ্ন হইল। তাহা হইতে ক্রমে এড়কা নামক একপ্রকার তৃণের জন্ম হইল। সে তৃণ কেমন তাহা বলিতে পারি না কিন্তু একদিন এই তৃণ মুসলের কাজ করিল এবং ইহারই আঘাতে যদুবংশীয়গণ পরস্পরকে বিনাশ করিল।

এদিকে যে লৌহখণ্ড চূর্ণ হয় নাই, তাহা ফেলিয়া দিবামাত্র একটী সমুদ্রের মৎস্য আসিয়া উহা গ্রাস করিল। এক ধীবর জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে দৈবক্রমে সেই মাছটিকে ধরিয়া ফেলিল। যথাকালে মাছটিকে ছেদন করিতে গিয়া ধীবর লৌহখণ্ড প্রাপ্ত হইল। ঐ ধীবরের সহিত এক ব্যাধের বড় বন্ধুতা ছিল, ব্যাধের নাম জরা। তাহার তীরের একটী লৌহ-ফলক হারাইয়া গিয়াছিল। সে যখন খবর পাইল তাহার ধীবর-বন্ধু এক সামুদ্রিক মাছের পেট হইতে একখণ্ড ইস্পাত পাইয়াছে তখন সে অনায়াসেই ঐ ইস্পাতখণ্ড বন্ধুর নিকট সংগ্রহ করিয়া তীরের ফলক করিয়া লইল। উগ্রসেন ও তাঁহার বন্ধুগণের অজ্ঞাতসারে কাল-চক্রের স্বাভাবিক ঘূর্ণনে মুসল তাহার কুলনাশন কার্য্যের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিল। জরা ব্যাধের তীরস্পর্শে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়া যদুবংশের ধ্বংসাভিনয় সম্পূর্ণ করিলেন। এই গেল উগ্রসেনের ব্যাপার। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে—কংস কি এবং উগ্রসেনই বা কি! ইহারা বাঁচিতে চায় কিন্তু অমরতার উপায় অন্বেষণ করে বাহিরে।

কেবল কংস আর উগ্রসেনের কথা বলিলেই ইহাদের ইতিহাস শেষ হইবে না। হিরণ্য-কশিপুও ঠিক এই পথে পর্য্যটন করিয়া ছিল। হিরণ্য-কশিপু দৈব সহস্র বৎসরকাল মন্দার পর্ব্বতে কঠোর তপস্যা করিয়াছিল তপস্যার জোরে ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। কেবল উপস্থিত হওয়া নহে, সৃষ্টি রক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়া তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

হিরণ্য-কশিপুও অমরতা চাহে। ব্রহ্মাকে বলিল—"আমাকে অমর বর দিন।" ব্রহ্মা বলিলেন—"আমি নিজেই অমর নহি, আমি তোমাকে অমর বর কেমন

করিয়া দিব?" হিরণ্য-কশিপু বলিল—"তবে আমার বর লওয়ার প্রয়োজন নাই।" সে আবার সুতীব্র তপস্যা আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা আসিয়া বর লইবার জন্ত সাধা-সাধি আরম্ভ করিলেন। হিরণ্য-কশিপু চাতুরী করিয়া এমন বর লইল যাহাতে দুইদিক্ আগলাইয়া রাখিতে পাবে।

"দিবসে মরিব না রাত্রিতে মরিব না। আকাশে মরিব না পৃথিবীতে মরিব না। মানুষে মারিবে না পশুতে মারিবে না। ইহাই ছিল হিরণ্য-কশিপুর প্রার্থনা। আর সৃষ্টি রক্ষার জন্ত ব্রহ্মা তাহার প্রার্থনা পূরণ করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। হিরণ্য-কশিপু ভাবিয়াছিল, প্রকারান্তরে অমর হইলাম। কিন্তু দিন নয় রাত্রি নয় এমন সময় আছে, আকাশ নয় পৃথিবী নয় এমন স্থান আছে, মানুষ নয় পশু নয় এমন প্রাণী আছে, হিরণ্যকশিপু তাহা বুঝিতে পারে নাই। হিরণ্য কশিপুর মৃত্যু তাহারই প্রমোদ-ভবনের স্ফটিকস্তম্ভের ভিতর লুকাইয়া ছিল আর তাহারই আত্মজ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সেই মৃত্যুকে প্রকট করিয়া দিল।

এই প্রকারে আমরা নিজের কাজেই প্রতিনিয়ত পরাজিত হই। ব্রহ্মা বহির্ম্মুখ করিয়া আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্ত আমরা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু তাঁহাকে যে না দেখিতে পাইবে সে মরণ হইতে মরণের দিকেই ছুটিয়া চলিবে।

কত বড় বড় মানুষ, কত বড় বড় জাতি এই প্রকারে মরিয়াছে। অমৃতের দেবতা যিনি, প্রেমরূপে—রসরূপে আপনাকে বিলাইয়া দিতে আসিলেন যিনি, তিনি আমাদের নিকট মৃত্যুরূপে উপস্থিত হইতেছেন। বাঁচিবার ভুল রাস্তা ধরিয়া আমরা মরিয়া যাইতেছি; এখন মরিবার ঠিক রাস্তা পাইলে চিরজীবনে বাঁচিয়া উঠিতে পারি। মরিবার ঠিক রাস্তাই বৃন্দাবনের পথ। এই গেল কংসের কথা।

কংসের বিপরীত ছবি শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক আছে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজগোপীগণ পর্য্যন্ত এই চিত্রের ক্রম-বিকাশ। আমরা এই বিপরীত চিত্র একখানি দেখিতেছি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে। আমরা এখানে সেই উপাখ্যানটি বর্ণন করিব।

অবন্তী নগরে এক ধনবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কদর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়া বিপুল ধন-সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আদৌ কোনরূপ সদ্ব্যয় ছিলনা। তিনি সকলের সহিত কলহ করিতেন, সকলের অপ্রিয় আচরণ

করিতেন। তাঁহার ব্যবহার এতই খারাপ ছিল যে, পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন।

অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের ধন নাশ আরম্ভ হইল। গৃহদাহ দস্যু তস্করের উপদ্রব, রাজ-পীড়ন প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। এই আকস্মিক দারিদ্রে ব্রাহ্মণের উপকার হইল, কারণ দারিদ্রের সহিত বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ অতীত জীবনের দুষ্কর্ম্মের জন্য সবল ভাবে অনুতাপ করিতে করিতে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলেন। দুষ্টলোক ব্রাহ্মণের উপর যৎপরো-নাস্তি অত্যাচার করিতে লাগিল। সে অত্যাচার অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধ হইলেন না, তিনি ভাবিতেন, এই সমদয় দুঃখ আমার ভোক্তব্য।

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মাগ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যঃ॥"

এই সকল দুষ্ট লোক বা দেবতাগণ, গ্রহ কর্ম্ম ও কাল, ইহারা কেহই আমার সুখ দুঃখের হেতু নহে। যে মন সর্ব্বদা সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছে সেই মনই ইহার হেতু। অতএব মনকে নিগ্রহ করা প্রয়োজন, নতুবা সমস্তই ব্যর্থ।

"দানং স্বধর্ম্মো নিয়মোদমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরোহি যোগোমনসঃ সমাধিঃ।"

দান, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌতকর্ম্ম ও ব্রতাচরণ এ সমুদয় মনের নিগ্রহের উপায় মাত্র কিন্তু মনের যে সমাধি তাহাই পরম যোগ।

"সমাহিতং যস্যমনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদতস্য কৃত্যম্।
অসংযতং যস্যমনো বিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ॥"

যাহার মন প্রশান্তভাবে সমাহিত হইয়াছে, দানাদিদ্বারা তাহার আর কি কার্য্য হইবে? আর যাহার আলস্যাদি দ্বারা মন অসংযত হয় তাহার দানাদি দ্বারাই বা অপর কি কার্য্য হইবে? এই প্রকারে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের মন যখন সমাহিত হইল, যখন সংসারের তরঙ্গাঘাত হইতে তিনি আপনাকে নির্ম্মুক্ত করি-লেন তখন তিনি পরাত্মনিষ্ঠার যে সনাতন পথ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিলেন যে, মুকুন্দচরণপদ্ম সেবা দ্বারা আমিই এই ঘোর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব। ব্রাহ্মণের এই অবস্থায় কথিত শ্লোকটি এই—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন এই শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেন।

চব্বিশবৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিয়া পবিত্র কৈলা সব রাঢ়দেশে॥
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মকুন্দ-সেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ।
পরাত্মনিষ্ঠা এই সারবেশ ধারি।।
মকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ॥ .
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ নিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া॥"

এই পথ বৃন্দাবনের পথ—আর কংসের পথ ঠিক ইহার বিপরীত।

সহজিয়া সাধন

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা লিখিত)

আজকাল নবীন শিক্ষিত দলের মধ্যে অনেকেই বলেন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিকৃতি ঘটিয়াছে। আরও বলেন দুই শত বৎসরের মধ্যেই যে ধর্ম্মের বিকৃতি ঘটে সে ধর্ম্মের গৌরব কোথায়? এখন দেখিতে হইবে মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত এই সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কিরূপে বিকৃতি ঘটিল এবং কেই বা তাহার বিকৃতি ঘটাইল।

আমরা জীবনে যে ছয়টী রিপুর দৌরাত্ম ভোগ করি, কামই তাহার মধ্যে রাজা। এই কামপ্রবৃত্তি দমনের জন্য আমাদের এই সমাজে বহু বিধি নিবন্ধ হইয়াছে। সংযম প্রবৃত্তির শিক্ষাদানই হিন্দু-ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানব জীবনে এই কামপ্রবৃত্তির প্রভাব কিরূপ প্রবল তাহা সম্যকভাবে পর্য্যালোচনা করা বড় সহজ নহে। অতীব কঠোর বিধি নিষেধ সত্বেও এই

প্রবৃত্তির বিজয় নিশান জগতের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়কে কলুষিত করিয়া উড্ডীন হইতে দেখা গিয়াছে। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে Monk ও Nan দিগের অবাধ মিলনে নৈতিক বায়ু যে প্রকারে দূষিত হইয়াছিল ইতিহাস চিরকাল তাহার সাক্ষ্য দিবে। শুধু ইহাদিগের মধ্যে বা ভারতবর্ষে নহে—আরব দেশ, গ্রীস, মিশর, রোম কোথায় না এই প্রবল প্রবৃত্তি তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে?

আমরা ভুল বুঝিয়া ধর্ম্মের দোষ দিই। কিন্তু ধর্ম্ম চিরকালই ধর্ম্ম, তাহা কখনও কি দূষিত হইতে পারে? ধর্ম্মকে ধরিয়া মানুষ—মানুষ। সুতরাং মানুষের এই যে পতন—ধর্ম্মের মধ্যেই তাহা রূপান্তরিত হইয়াছিল?

আমাদের এই ভারতবর্ষে, বৌদ্ধধর্ম্মই প্রথমে বিকৃত হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই তাহদের আবিলতার বিষ ছড়াইয়া দিয়াছে। বুদ্ধদেব "ত্যাগ" পথই খুব করিয়া প্রচার করিলেন। তাহার ফলে দেশে খুব বড় একদল মুণ্ডিত মস্তক, পীতবসন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এই নবীন ধর্ম্মবলে বলীয়ান সম্প্রদায় তখন আমাদের দেশে বড়ই গৌরবের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। তাই রমণীগণও এই সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণের পার্শ্বে ভিক্ষুণীরূপে দাঁড়াইতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। বুদ্ধদেব প্রিয়শিষ্য আনন্দের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্ত্রীলোকদিগকেও জরা মরণ ব্যাধির হাত হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য ভিক্ষুণী হইবার অধিকার দিয়াছিলেন।

হায়! বুদ্ধদেব বোধহয় ভুল করিয়াছিলেন, কারণ, কালে ভিক্ষু ভিক্ষুণী-দিগের অবাধ মিলন হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম কলুষিত হইয়াছিল। হীনযান, মন্ত্রযান, মহাযান, বজ্রযান, সহজযান, প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র-শক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থায় এই সহজযান অতীব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সহজযানের মূল ছিল শক্তি সাধনা। প্রত্যেক সাধকের এক বা ততোধিক শক্তি ছিল। ইহাদের পৈশাচিক অত্যাচার এবং অতিশয় ঘৃণিত আচরণ লিপিবদ্ধ করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করা উচিত বোধ করি না। তাহাদের যুগপৎ বল প্রয়োগে ও ধর্ম্মের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কত যে নরনারী আপনাদিগের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ধর্ম্মের নামে এই সমস্ত অনাচার কখনই তিষ্ঠিতে পারে না। ইহাতে যে প্রবল প্রতিবাদ উঠিয়াছিল তাহার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নবীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া পুনরায় দেখা দিয়া ছিল।

কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য্য ও উদয়নাচার্য্যের চেষ্টায় এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

আমরা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখিব, এই ধর্ম্মের নামটাই মাত্র দেশ হইতে গিয়াছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সম্প্রদায় ও তাহাব কলুষিত আচার এবং তাহাদের কল্পিত বিবিধ দেবদেবী নামান্তর গ্রহণ করিয়া দেশমধ্যেই বাস করিয়াছিল। পববর্ত্তী যুগে এই সমস্ত সহজযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণই তান্ত্রিক হইয়া শক্তি উপাসনা পদ্ধতি চালাইয়াছিল। সহজিয়া বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্মের তাড়নায় হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া ভৈবব ভৈরবী নাম ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে তাহাবাই সহজিয়া বৈষ্ণব হইযাছিল।

সহজিয়া বৌদ্ধগণেব এক সম্প্রদায়কে নেড়া ও নেড়ি বলা হইত। ইহারা সমাজে অতীব অবজ্ঞাব পাত্র হইয়া বাস করিত। পরবর্ত্তী যুগে প্রভু বীরভদ্র ইহাদিগকে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-ভুক্ত কবিয়াছিলেন। বৌদ্ধদেবের স্থায় চৈতন্যদেবের প্রচাবিত বৈষ্ণবধর্ম্মেও এতদ্বারা পরবর্ত্তী যুগে মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। এই সমস্ত বামাচারী বৈষ্ণব বৈষ্ণব মহাজনগণেব চরিত্রেও কলঙ্ক কালিমা লেপন করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। আনন্দ ভৈরবে স্বয়ং বীরভদ্র প্রভুর চবিত্রও কিরূপ কলুষিত করা হইয়াছে দেখুন---

বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বৈরাগীরে শিখাইল আপন কারণে॥
যদি এহো বাক্যে কেহ প্রতীত না হয় মনে।
বাবশত নাডাকে তের শত নাড়ী দিল কেনে॥
যে সব বৈবাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে।
এখন প্রকৃতি বিনে তিলার্দ্ধ না থাকে॥
অনন্ত হরি প্রভু সহজ তত্ত্ব ধর্ম্ম।
বৈরাগীকে শিখাইল প্রকৃতির ধর্ম্ম॥”

কথিত আছে বীরভদ্র প্রভু তাঁহার শিক্ষায় উন্নত নাড়াগণের সাতিশয় তেজ দেখিয়া এবং তাহাদের উপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের ঐ তেজ হ্রাস করিবাব জন্য তের শত নাড়াকে তের শত নাড়ী গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রবন্ধান্তরে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা আছে।

এই নাড়ানাড়িগণ হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পতন হইয়াছে। চৈতন্য দেবের

ধর্ম্মে প্রকৃতি সম্ভাবণ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া যাঁহাদের গৌরব ছিল সেই সাড়ে তিন জন মাত্র মর্ম্মী ভক্তের অন্যতম বৃদ্ধা মাধবী দাসীর নিকট হইতে তণ্ডুল চাহিয়া আনিয়া ছিলেন বলিয়া প্রভু ছোট হরিদাসকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদরূপ গোস্বামী পরমাবৈষ্ণবী মীরাবাইএর সহিত প্রকৃতি বলিয়া সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে এমন বৈষ্ণব ধর্ম্মের মুখ্য অঙ্গ হইয়াছিল "প্রকৃতি সাধনা" ইহা কি নিতান্ত পরিতাপের বিষয় নহে ? বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

সহজে সাধকগণের নিকট, প্রকৃতি সাধনার করণ—তাহাদের সহবাস সাধনার অঙ্গ ছিল। ভগবৎ প্রেম সাধ্য না হইয়া রমণীর প্রেমই তাহাদের সাধ্য হইয়াছিল। তাহারা তাহাদের যুক্তি দৃঢ় করিবার জন্য "পঞ্চ রসিকের" মত নজীর ধরিয়া ছিল। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল ও রায় রামানন্দ ইহাঁরাই পঞ্চ রসিক বলিয়া বিখ্যাত। পরকীয়া সাধনায় ইহাঁরা কি ভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন তাহা আমরা এ স্থলে স্থূল ভাবে আলোচনা করিব।

জয়দেব আপনাকে "পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তিনি পরকীয়া সাধক বলিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু পদ্মাবতী তাঁহার পরকীয়া নহেন, স্বকীয়া। তখন সহজেগণ বলিলেন, না না পদ্মাবতী নন, আর একজন রমণী তাঁহার সাধক জীবনের অবলম্বন ছিলেন তাহার নাম রোহিণী। কিন্তু এ কথা একেবারে অশ্রদ্ধেয়। যে গীত-গোবিন্দের গান শুনিবার জন্য স্বয়ং জগন্নাথ সদা ব্যাকুল, এমন কি সেই মোগল এই কাহিনী শুনিয়া যখন ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া, ঘোড়া ছুটাইয়া গীত-গোবিন্দ গান করিতে করিতে গিয়া ছিলেন তখন জগবন্ধুকে সেই গান শুনিবার জন্য ঘোড়ার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া কাঁটা প্রভৃতিতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইয়াছিল বলিয়া ভক্তমাল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। যিনি স্বীয় ভক্তের গ্রন্থ মধ্যে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিয়া স্বয়ং পাদ পূরণ করিয়া গিয়াছিলেন। মাতা সুরধুনী যাহার ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আপনি আসিয়া তাঁহার গ্রাম সন্নিধান দিয়া প্রবাহিত হইয়া ছিলেন, সেই ভক্ত শ্রেষ্ঠ জয়দেব কখনও সহজে সাধকগণের আদর্শ এই জুগুপ্সিত ধর্ম্মের সাধক হইতে পারেন না।

বিদ্যাপতির কবিতায়, তাঁহার ভাবের বন্যায় সুধার লহরী তুলিয়াছে। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি অনন্যসাধারণ ছিল। রাণী লখিমা বা লছিমা দেবী তাঁহার সভাসদ অমর কবির কাব্য-সুধাপানে তৃপ্ত হইয়া কবিকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে

পারেন; এবং এজন্য তাহাদের প্রতি কুৎসিৎ কটাক্ষ-পাত করা—এক মাত্র সহজেগণের পক্ষেই সম্ভব। যদিও ইহাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সঞ্জাত হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ ভালবাসা কি জাতীয় তাহা আমরা চণ্ডীদাসের চরিত্র আলোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

চণ্ডীদাস তাঁহার কৃত পদাবলীতে তাঁহার উপাস্য রাধা কৃষ্ণের প্রণয় মহিমা যে ভাবে প্রচার করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। এই প্রেমিক কবির চরিত্র আলোচনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। বঙ্গ-ভাষার বহু বরণীয় লেখক এজন্য তাঁহাদের অমর লেখনী ধারণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস যে কি জাতীয় প্রেমিক কবি ছিলেন তাহা আমরা রায় সাহেব দীনেশ বাবুর গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে ভালরূপে বুঝিয়াছি। রজকিনী রামী, চণ্ডীদাসের কোন্ শ্রেণীর নায়িকা ছিলেন পাঠক আসুন, আমরা তাহা তৎকৃত পদ হইতেই বুঝিবার চেষ্টা করি,—

এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রাণী।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রি-সন্ধ্যা যাজন তোমার ভজন
তুমি বেদ-মাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ-মর্ত্ত পাতাল পর্ব্বত
তুমি যে নয়নের তারা॥
তুমি বিনে মোর সকলি আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।

যেদিকে না দেখি ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি ॥
ওরূপ মাধুরী পাশরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা রস ॥
ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে
কি আছে আমার আর।
বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী চরণ সার ॥

চণ্ডীদাস বলিতেছেন—তোমরা আমার সম্বন্ধে যাহাই মনে কর না কেন, কিন্তু আমার মন ত আমি জানি। রামীকে আমি আমার ইষ্টদেবী কিশোরীর (শ্রীরাধার) মত দেখি। অধিক কি তিনি যে একাধারে আমার বাপ মা, এতে কি কাম-গন্ধ থাকিতে পারে? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে—তিনি যে আমার বেদমাতা গায়ত্রী।

চণ্ডীদাস বলিতেছেন, আবাব প্রেমের গতি তোমবা বুঝিবে কিনা জানি না। কিন্তু আমার হৃদয়েব কথা তোমাদিগকে খোলসা করিয়াই বলিতেছি,—

নারীব সৃজন অতি যে কঠিন
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি নারিলেক বিধি
বিষামৃতে একত্র বয় ॥
যেমন দীপিকা উজরে অধিকা
ভিতরে অনল-শিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা ॥
জগৎ ঘুরিয়া তেমতি পুড়িয়া
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে ॥

হংস চক্রবাক ছাড়িয়া উদক
মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়।
তেমতি নহিলে কোথা প্রেম মিলে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

চণ্ডীদাস প্রেমের সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, কামের সাধনায় নহে।

কাম আর প্রেম হয় বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

আসক্তি যখন বহির্ম্মুখী থাকিয়া চিত্তকে কলুষিত করে তখনই উহা কাম, আর আসক্তি যখন অন্তর্ম্মুখী হইয়া প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে লুব্ধ হয় তখনই উহা প্রেম। চণ্ডীদাসের ভজনা রাগানুগামার্গে। এই রাগানুগা মার্গের সাধনার কথা আমরা রায় রামানন্দের বিষয় আলোচনা করিবার সময়ও বলিতে পারিব। চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

"পরকীয়া সাধন, বড়ই গোপন,
বড়ই নিগূঢ় এর কথা।
অতীব যতনে, রাখিবে গোপনে,
না কহিবে যথা তথা॥"

প্রেমের সার পরকীয়া প্রেম। ইহার অধিকারী হওয়া সোজা কথা নহে। এই প্রেমের চরম উৎকর্ষ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃষভানু রাজকুমারী শ্রীরাধা। এই ভাবে ভাবিত হইয়া, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম ও রস আশ্রয় করিয়া এবং প্রেমের দেবতা দ্বয়কে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই সাধনা করিতে হয়। নহিলে স্খলন পদে পদে। নহিলে সাধনা-সাগর মন্থনে বিষ উঠিবে। চণ্ডীদাস এই সাধনায় সিদ্ধ হইয়া অমৃত পানের অধিকারী হইয়াছিলেন। অপরদিকে সহজে সাধকগণ নারী লইয়া সাধনার নামে নারী সহবাস করিয়া বিষ পান করিয়াছে। ফলে অমরত্বের পরিবর্ত্তে মৃত্যু লাভ হইয়াছে ও হইতেছে।

সহজযানের বৌদ্ধগণই পরবর্ত্তী যুগের সহজিয়া বৈষ্ণব ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহারা বুঝিয়াছিল সুখ জীবনের কাম্য—ইন্দ্রিয় এই সুখের দ্বার আর চরম সুখ কামিনী বিলাস। এমন কি তাহারা জঘন্য মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার সাক্ষ্য বহুস্থানে রহিয়াছে। পুরীর মন্দির যাহারা দেখিয়াছেন তাহাদিগকে একথা বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি এ কথায় সাড়া দিবে না? তাহা কখনই নহে। বৈষ্ণবগণ

আপন আপন ইন্দ্রিয়গুলিকে উন্মুলিত না করিয়া ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় রাখিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবি লোচনদাস বহুকাল পরে যখন শ্বশুর বাড়ী যান, তখন সেই বাড়ীর নিকটে গিয়া স্বীয় যুবতী ভার্য্যাকে অপরিচিতা স্ত্রীলোক ভাবিয়া মাতৃ সম্বোধন করিয়া ঐ গৃহের উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পরে তিনি তাহাকে চিনিয়াছিলেন বটে কিন্তু একবার অজ্ঞাতসারে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া আর দৈহিক সম্পর্ক রাখেন নাই। কিন্তু তত্রাচ স্ত্রীকে তিনি প্রাণ দিয়াই ভালবাসিতেন। আপন পদে স্ত্রীকে তিনি "প্রাণের ভার্য্যা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহারাই প্রকৃত বৈষ্ণব। সহজিয়ারা বৈষ্ণব নহেন পরন্তু বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক।

এক্ষণে পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি কি বলিতেছেন দেখা যাউক।—

পরকীয়া-ভাব হয় রসের ভাণ্ডার।
গোপী গোপীনাথ ভিন্ন নাহি অধিকার॥
পরকীয়া ভাব হয় সদা প্রেমময়।
কাম-গন্ধ পেলে তাহা পশুত্বক হয়॥"

অন্যত্র—

পরকীয়া গোপী প্রেম গোলকের রস।
মর্ত্তে প্রকাশিলা হরি করি মহারাস॥
পরকীয়া গোপীগণ গোলকের জন।
গোলক বিহারী হরি শ্রীরাধারমণ॥
ব্রজ গোপ গোপীগণ রাধা কৃষ্ণসহ।
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে এ ভাব অন্যে না সম্ভবে॥"

বিল্বমঙ্গলের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার নাই। প্রথম জীবনে চিন্তামণি তাঁহার রক্ষিতা ছিল। এই চিন্তামণির কথাতেই তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছিল। তাই তিনি তাঁহার অতুলনীয় গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতে প্রথমে চিন্তামণিকে গুরু স্বীকার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। সাধক জীবনে আর একবার তাঁহার চিত্ত টলিয়াছিল, সেবার বণিকের রূপবতী ভার্য্যাকে দেখিয়া, কিন্তু তাহার পর স্বহস্তে চক্ষুর বিনাশ করিয়া সে পাপের উৎকট প্রায়শ্চিত্তই করিয়াছিলেন। ফলে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। ব্রজেশ্বরের সহিত ব্রজের খেলা খেলিতে খেলিতেই তিনি ব্রজধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কলুষিত কামিনী প্রসঙ্গ লইয়া আর তাহাকে জীবনাতিবাহিত করিতে হয় নাই।

এবার রামানন্দ রায়ের কথা। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম' প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি, রামানন্দের দেবদাসী সঙ্গের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু প্রভু এ সন্দেহ উত্তমরূপেই নিরসন করিয়াছেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করিবার জন্য বহু পথ পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে সচল নীলাচল চন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। মিশ্র প্রভুর নিকট আপন মনোভাব জানাইলে প্রভু বলিলেন, ঠাকুর! আপনি যদি কৃষ্ণ-কথা শুনিতে চান তাহা হইলে রায় রামানন্দের নিকট যান তিনিই কৃষ্ণ কথা কথনের উপযুক্ত পাত্র। আমিও তাঁহার নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিয়া থাকি। প্রভুর কথায় ব্রাহ্মণ রামানন্দের গৃহে গমন করিলেন। দ্বারী তাঁহাকে যত্ন করিয়া বসাইয়া বলিল যে, রামানন্দ এক্ষণে নিভৃত উদ্যানে দুইটী পরমাসুন্দরী দেবদাসীকে আপনার রচিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের অভিনয় শিখাইতেছেন। সরল বুদ্ধি ব্রাহ্মণ এ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পরে রায় আসিলে তিনি আর তাঁহাকে কৃষ্ণ কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু অবান্তর কথার আলোচনা করিয়াই উঠিয়া গেলেন। পরে প্রভুর নিকট গিয়া সমস্ত কথা জ্ঞাত করিলে ভক্তমণ্ডলী এমন পাপ-জনক বাক্য শ্রবণে চমকিত হইয়া উঠিলেন। তখন প্রভু বলিলেন, তোমরা চমকিত হইতেছ কিন্তু রামানন্দের কোন দোষ নাই। তাঁহার দেহ মন অপ্রাকৃত। তিনি পূর্ব্ব হইতেই গোপী অনুগা ভাবে ভজন করিয়া সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাই আজ তিনি নিভৃত উদ্যানে পরমা সুন্দরী দেবদাসীকে শিক্ষা দিবার অধিকারী হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি স্বহস্তে তাহাদের অঙ্গ মার্জ্জনা ও বেশ বিন্যাস করিয়া দেন। কিন্তু তাহাতেও রায়ের মনে তিলমাত্র বিকার ঘটে না। রায় রায় ভাবেন, দেবদাসীরা শ্রীকৃষ্ণের গোপী, আর আমি সেই গোপীদের দাসী! তখন তাঁহার আর দেহ বুদ্ধি থাকে না। ভাবের পরি-পুষ্টির জন্য স্বহস্তে মনোমত করিয়া গাত্র মার্জ্জনা ও বেশ বিন্যাস করিয়া দেন। সুন্দরী যুবতী না হইলে এবং বেশের পারিপাট্য না থাকিলে গোপী ভাব আসিবে কিরূপে? শ্যাম সুন্দরের মনোরঞ্জনই বা কিরূপে হইবে। এইরূপে সুন্দরী যুবতীকে উত্তম বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া হাব ভাব লাস্যাদি শিক্ষা দিয়া ও আপনার উত্তম গ্রন্থ জগন্নাথ বল্লভের অভিনয় শিখাইয়া রায় শ্রীকৃষ্ণকে গান শুনাইবেন এবং অভিনয় দর্শন করাইবেন। তাঁহার সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য। রায় রামানন্দ বহুকাল হইতে গোপীর অনুগত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। তাই আজ নিভৃতে পরমাসুন্দরী দেব দাসী সঙ্গ করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। কিন্তু এই

অধিকার একমাত্র রায়েরই জন্মিয়াছে অপরের ইহাতে অধিকার নাই। এই ঘটনা কবিরাজ গোস্বামী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ধন্য প্রভু! ধন্য তোমার ভক্ত বাৎসল্য। তুমি ভবিষ্যৎ বুঝিয়াই আপন প্রিয় ভক্তের গোপন মাধুর্য্য সাধারণকে জ্ঞাত করাইয়া গিয়াছিলে। এখন সহুজেগণ এই সমস্ত প্রভুর উক্তি চাপা দিয়া রামানন্দের পূত চরিত্র কলুষিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

এই সমস্ত কামুকগণের কাম সাধনার গোপন কথা প্রকাশ করিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া দেওয়াই আজ বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। যাহা এক্ষণে আমাদের ঘরের কলঙ্ক বলিয়া পরিচিত তাহা যে এই ভাবে সঞ্জাত হইয়াছিল এবং তাহার সহিত যে সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদৌ সম্পর্ক নাই তাহারই আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করা হইল।

প্রত্যাবর্ত্তন

(শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রমাণিক লিখিত।)

ফিরিয়া এসেছে শ্যাম আজিবুঝি ব্রজেতে।
তাহার বাঁশীর তান
শুনিয়া কাঁপিছে প্রাণ
তাহারই পরশ যেন লাগে আজি বুকেতে
ফিরিয়া এসেছেশ্যাম আজিবুঝি ব্রজেতে॥
ওই যে যমুনা আজ কূলে কূলে ভর পূর,
কি যেন উদাস সুরে হিয়া কাঁপে দুর্ দুর্;
ওই যে পাপিয়া গায়
মরমে পশিছে হায়
কানন মুখর হ'ল বিহগের গীতিতে।
ফিরিয়া এসেছেশ্যাম আজিবুঝি ব্রজেতে॥
ওই যে কদমতলে নূপুর বাজিছে আজ,
ঘাটেবা'ট আজি ওই উঠেধ্বনি সাজসাজ,
ওই যে ফুলের গায়
অলিকুল গান গায়
ময়ূর ময়ূরী নাচে ওই হাসি মুখেতে।
ফিরিয়া এসেছেশ্যাম আজি বুঝি ব্রজেতে॥
ওই যে আঙিনা আজ শ্যামগানে মুখরিত,
ব্রজ-গোপ গোপীগণ আজি নব হরষিত;
ওই যে রাখালরাজ
পরিয়া রাখাল-সাজ
গাহিছেন রাধা নাম চির সাধা বাঁশীতে।
ফিরিয়া এসেছেশ্যাম আজিবুঝি ব্রজেতে॥

বাঁশীর গানে

(৺আশুতোষ বসু লিখিত।)

তোমারি কারণ এত গঞ্জন
ঘরে পরে দেয় মোরে,
শ্রাবণের ঘন হয়েছে নয়ন
দিবানিশি আঁখি ঝরে।
কি করে লজ্জায় গুরুজন ভয়
কিছু নাহি বাধে মনে,
যখন বাঁশরী রাধা নাম ধরি
বাজে নিকুঞ্জ বনে।
তিমিরা যামিনী মাঘের হিমানী
তাহে বৃষ্টি বায়ু ঘন,
দগ্ধ হৃদয় কভু না ডরায়
বাঁশরী বাজিলে হেন।
নব কুশাঙ্কুর মেদিনী-বন্ধুর
কভু না চরণে বাজে,

যমুনা পুলিনে নিকুঞ্জ কাননে
যদি তব বাঁশী বাজে।
যাইতে প্রান্তরে আকুল অন্তরে
তাহে কিবা আছে বাধা,
যদি তুমি হরি বাজাও বাঁশরী
বলিয়া শ্রীরাধা রাধা।
যদি তব বেণু চরাইতে ধেনু
পরশে শ্রবণে মোর,
অমনি তবাসে ত্যজিয়া গরাসে
বাঁধি গো কটির ডোর।
শ্যাম গুণমণি তব বাঁশী শুনি
প্রাণ হয় দেহ ছাড়া,
তোমার বিহনে থাকা গৃহ কোণে ?
সে যে মরণের বাড়া॥

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব।

(শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত।)

এস মা আনন্দময়ী নিরানন্দ ভবনে।
আশা-পথ চেয়ে আছি জবা দিব চরণে॥
সম্বৎসর হ'ল গত, শরৎ পুনঃ আগত,
শরৎশশী সমুদিত সুদূর গগনে,
কৃপা কর কৃপাময়ী ত্রাসিত সন্তানে॥

এস বিশ্বেশ্বরী বিশ্ববন্দিনী মা! ভারত-ভুবন আলোকিত করিতে, তোমার

অনুগত ত্রাসিত সন্তানগণকে পুলকিত করিতে বিশ্ববিমোহিনী রূপে আসিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। আমরা আশা-পথ চাহিয়া আছি, তোমার মোক্ষমূলাধার পাদপদ্মে জবা-পুষ্পের অঞ্জলি দিয়া নবজন্ম সার্থক করিব। এস মা! ভারতের গগন-পবন পবিত্র করিয়া তোমার ঐ দেব-দুর্লভ মূর্ত্তিতে আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজ কর, আমরা তোমার ঐ অভয়া মূর্ত্তির পূজা করিয়া ধন্য হই, কৃতকৃতার্থ হইয়া যাই।

মা, বলিয়াছিলাম ত—"সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ" বৎসর ত অতীত হইয়াছে, বর্ষার মেঘ-মলিনতা ত কাটিয়া গিয়াছে, শরতের সুন্দর গগনে ত আবার শরতশশীর উদয় হইয়াছে, ধরিত্রী-সতী আবার নানাবিধ পুষ্প-পল্লবে সুসজ্জিতা হইয়াছে, কুমুদ-কহ্লার, সেফালী, কোকনদও ফুটিয়া তোমার চরণ-সরোজে শোভা পাইবার জন্য হাস্য আস্যে বিরাজ করিতেছে। মরি মরি! কান্তারে কাশকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া বায়ু-ভরে হেলিয়া-দুলিয়া কতই না আনন্দ বিহ্বল হইতেছে। সকলেই আনন্দিত, বিশ্ব যখন আনন্দে ডগমগ, তখন আনন্দময়ী তুমি আসিবে না কেন মা।

যদিও তুমি ভক্তের হৃদয়-রাজ্য ছাড়া কখনও হও না, যদিও তুমি আমার মনোমন্দিরে মনোময়ী প্রাণময়ী রূপে সতত বিরাজিতা, যদিও তোমার করুণা-কটাক্ষ বিনা আমার প্রাণের স্পন্দন সমাহিত হয় না, তোমার শক্তি না পাইলে আমার "আমিত্ব" লোপ পায়, তখন তুমি যাও কোথায়, আর আইস বা কোন্‌খানে? তুমি ত সতত সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছ। তথাপি মা! শরৎকাল আসিলে, শরতের এই জ্যোৎস্না-বিধৌত, সেফালী-সৌরভ-স্নাত ধরিত্রীর প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলে, দেবীপক্ষে ভিক্ষুকের কোমলকণ্ঠে আগমনী সঙ্গীতের সেই ললিত-রাগিণী শ্রবণে প্রবেশ করিলে মন যেন স্বতঃই মাতিয়া উঠে, প্রাণে যে কি একটা পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত করিয়া দেয়, ত্রেতায় সেই রাবণ বধের কথা, সতী উদ্ধারের জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেই শক্তি উদ্বোধনের কথা, গদগদকণ্ঠে সেই স্তব-স্তুতির কথা, কমল অভাবে কমল-লোচনের সেই লোচন উৎপাটনের কথা যখনই মনে পড়ে, করুণাময়ী! তখনই তোমার সেই সাকার মূর্ত্তির প্রভাব নয়নের সম্মুখে প্রচলিত না করিয়া থাকিতে পারি না। শরতের এ সময়টা এমনি প্রীতি-প্রদ, এমনি ভক্তিভাবযুক্ত যে, প্রীতি, ভক্তি চেষ্টা করিয়া আনিতে হয় না। বাঙ্গালী হৃদয়ে কোথা হইতে, কোন্ অজানিত অমরধাম হইতে অমরের এই অমিয়-সুধা আপনি আসিয়া পড়ে। যখন এই সাকার

মূর্ত্তির পূজার জন্য প্রাণে একটা ধাক্কা মারিতে থাকে, মনকে মা-ময় করিয়া তুলে, তখন ভক্ত আর থাকিতে পারে না, সে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত এই পুতুল পূজায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী এইরূপে পুতুল পূজা করে বলিয়াই বাঙ্গালী পৌত্তলিক। অনেকে ইহার নিন্দা করে, সর্ব্বশক্তির আধারভূতা, বিশ্ব-বন্দিনী, চিদানন্দময়ীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া বাঙ্গালীর এই অখ্যাতি। যাহারা অখ্যাতি করে—তাহারা জানে না যে, বাঙ্গালীর এই সব সাকার মূর্ত্তির পূজা করাই তাহাদের সাধনার বিশেষত্ব। প্রবৃত্তি হইতেই নিবৃত্তি, সগুণ হইতেই নিগুণ, তেমনি সাকার হইতেই নিরাকার। অথবা মাকে আমার নিরাকার নিগুণ বলিতে যেন প্রাণ চায় না, মনের তৃপ্তি হয় না, যে সাধক যেখানে মাতৃদর্শন পাইয়াছেন মায়ের প্রসাদলাভ করিয়াছেন—সবই ত সাকারে, মা ত সকল ভক্তকেই ভুবন ভুলান মাতৃরূপে আসিয়াই কৃতার্থ করিয়াছেন, তবে মা আমার নিরাকারা কিসে?

আর নিরাকারে পূজা উপাসনা, ধ্যান ধারণাই বা কোথায়, কেমন করিয়া সমাহিত হয়? শ্রীরামচন্দ্র কি রাবণ বধের সময় নিরাকার মায়ের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, না শুম্ভ-নিশুম্ভ নিরাকারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন অথবা ভক্ত রামপ্রসাদের মনোরঞ্জনের জন্য মা আমার নিরাকারে তাঁহার বেড়া বাঁধিয়া ছিলেন। ভক্তের ভোগের জন্য কখনই মা আমার নিরাকার দর্শন দেন নাই, যাঁহার আকার নাই তাহার আবার দর্শন কোথায়? তাঁহার প্রসাদ লাভই বা কেমন করিয়া হইতে পারে! অতএব মা আমার নিরাকার নহেন, অন্তরে বাহিরে তিনি সাকারা সগুণা। বাঙ্গালীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে হৃদয়-সিংহাসনে যে মূর্ত্তি গড়ে, ভক্তি পুষ্পে প্রীতি চন্দনে যাঁহার পূজা করিয়া আপনার প্রাণের তৃপ্তি সাধন করে—সেই মূর্ত্তিই সাধক পুনরায় হৃদয়ের বাহির করিয়া সাকার ভাবে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর করিয়া পূজা করে—এই সাকার ভাবই হিন্দুর বিশেষত্ব—ইহাতেই হিন্দুর কৃতীত্ব, আর কোনখানে ইহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া হিন্দুর প্রতিমা পূজা অতুলনীয়।

হিন্দু সাধক অতি গোপনে হৃদয় সিংহাসনে মনোময়ী মায়ের প্রাণময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যখন পূজা করে, তখন সে বড়ই স্বার্থপর, তাহার সে আরাধ্য মূর্ত্তি আর কাহাকেও দেখাইতে চায় না, তখন সে স্বার্থপরতার সহিত বলে—

আদর ক'রে হৃদে রাখ (আমার) আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন মন কেউ না দেখে।

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি সেও যেন মা ব'লে ডাকে ॥
অজ্ঞান কুসঙ্গী যত, নিকট হ'তে দিয়ো নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ সে যেন সাবধানে থাকে ॥
কমলাকান্তের মন, আমার এই নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন সে কি অন্যের কাছে রাখে ॥

ভক্ত যখন দরিদ্র, ভক্তিধনে নিতান্ত দীন, যখন তাহার প্রাণের আশা একান্ত মেটে নাই—তখন সে হৃদয়ের প্রত্যেক পরতে পরতে সেই ভুবন ভুলান অনুপম রূপ জাগাইয়া রাখে, দিবারাত্র জাগিয়া জাগিয়া অন্তর মধ্যে অনিমিষ লোচনে তাহাই দেখে, আর ভক্তিগদগদ স্বরে মা মা বলিয়া কোলের ছেলের মত ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনার আকুল প্রার্থনা সেই বিশ্ববন্দিনী ত্রিতাপহারিণী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পদে জ্ঞাপন করে—ভক্তবৎসলা যখন ভক্ত সন্তানের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, অভয় দানে যখন তাহাকে কৃতার্থ করেন, তখন সেই আনন্দ বিহ্বল সন্তান আর থাকিতে পারে না, নিজের একটা ক্ষীণ কণ্ঠে মা মা বলিয়া ডাকিয়া আর তাহার তৃপ্তি হয় না, তাই তখন সে হৃদয়ের আরাধ্য মূর্ত্তি বাহিরে আনিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত মা মা রবে ডাকিয়া মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয়—ইহাই হিন্দু সাকার মূর্ত্তি।

ইহা কি কাল্পনিক, না হৃদয়ে হৃদয়ে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া তবে বাহ্য জগতে তাহার সৃষ্টি নৈপুণ্য প্রকাশ। দেবগণ নিজেদেরই শক্তি-সমন্বয়ে এই দুর্গা-শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সাধক আজ সেই শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া হৃদয়-সিংহাসনে বিশিষ্ট রূপে তাহা সংস্থাপিত করিয়া তবে সাধারণের হিতের জন্য সাকার রূপে বাহিরে পূজার বিধি বিধান করিয়াছেন। বাঙ্গালী কি একান্ত স্থির সুনিশ্চিত সাধনার এই মূলীভূত মূর্ত্তির পূজা না করিয়া থাকিতে পারে? কর বাঙ্গালী, ভক্তি প্রাবল্যে, প্রার্থনা সাফল্যে বিশ্বশক্তির আধারভূতা মায়ের এ প্রতিমা পূজায় ব্রতী হও, নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্যে দেবীর আরাধনা কর, জাঁক জমক হউক, আর নাই হউক, মায়ের ছেলে, ছেলের মত তারস্বরে ডাকিয়া, ভক্তি অশ্রুসিক্ত হইয়া বল—"প্রসীদ পরমেশ্বরী ত্রাহি দুর্গে" তোমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হইবে, শক্তি সঞ্চয় করিয়া তোমরা জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। শক্তির সেবক তোমরা অশক্ত কিসে? বরাভয় হস্তে মা তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, আজ প্রপন্ন শরণাগত হইয়া বল :—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে,
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥

বল ভাই— "ভগবতী ভয়চ্ছেদে শক্তি ভূতে সনাতনী,
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥

এই আধিব্যাধি প্রপীড়িত জগতে মায়েব কৃপা হইলে আর তোমাদের কোন চিন্তাই থাকিবে না – তোমবা সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইবে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট লিখিত)

নবদ্বীপ।—তা আছে বৈকি ! আচ্ছা, পুনবায় জিজ্ঞাসা করি তুমি আহার কর কেন ?

আনন্দ।—ক্ষুধা নিবৃত্তি ও শরীব পালনের জন্য আহার করি ?

নবদ্বীপ।—ক্ষুধা জিনিষটা কি ?

আনন্দ।—অভাব।

নবদ্বীপ।—এই অভাব দূর করাই যদি আহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে তো যাহা তাহা খাইলেই চলিত। ভাল কালীয়া পোলাও, দুগ্ধ ঘৃত খাইবার ইচ্ছে কর কেন ?

আনন্দ।— ওটা অবস্থা ও প্রবৃত্তিব অনুরূপ। ভাল খাইতে কার না ইচ্ছা হয় ? তবে অবস্থায় কুলায় না বলিয়া যাহা তাহা খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

নবদ্বীপ।—তবেই হইল, আহাব করা কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নয়, উহার সঙ্গে একটা প্রবৃত্তির যোগ আছে ; যাহার জন্য মানুষ ভাল খেতে চায়।

আনন্দ। তা আছে বটে।

নবদ্বীপ। আচ্ছা, সে প্রবৃত্তিটা কি ?

আনন্দ। আমার বিশ্বাস সেটা সুখেচ্ছা।

নবদ্বীপ। কেমন ভাই ! প্রথম বলিয়াছিলে আহার বিহারই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এখন বুঝিলে আহারের সঙ্গে আনন্দও চাই ?

আনন্দ। এ ত সত্যকথা, কারণ, যে কার্য্যই করিতে যাই, সুখ না পাইলে করিতে পারি কি ?

নবদ্বীপ। তবেই এখন বেশ করে বুঝে দেখ, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কেবল আহারাদি নয়, আনন্দ। কেহ হয় তো ১০ দিন অনাহারে একাসনে বসিয়া দিন কাটাইতেছে, কেহ নিচে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সূর্য্যের প্রখর কিরণের মধ্যে উর্দ্ধপদে হেঁট মাথে রহিয়াছে, আবার কেহ বা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া দিন যাপন করিতেছে। বল দেখি সকলেরই উদ্দেশ্য এক নয় কি ? প্রথম মনে হয় দুইটী, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে এক ভিন্ন আর কিছুই মনে হইবে না।

আনন্দ। তা ত সত্য, আনন্দই সকলের উদ্দেশ্য।

নবদ্বীপ। তবে এখন প্রকৃত বিষয় হইল আনন্দ, আনন্দ পাইবার জন্য কেবল মানব কেন জীব মাত্রই লালায়িত। এই আনন্দ নিত্য কি অনিত্য বল দেখি ?

আনন্দ। জীবের যখন নিত্যতা নাই, তখন তদাশ্রিত আনন্দ নিত্য কিরূপে হইবে ?

নবদ্বীপ। আশ্রয়ের সহিত আশ্রিতের এমন কোন নিকট সম্বন্ধ হইতে পারে না, যাহাতে আশ্রয়ের অনিত্যতায় আশ্রিতের অনিত্যতা হইবে। আনন্দ নিত্য পদার্থ; সচ্চিদানন্দ আদিপুরুষ গোবিন্দের হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশেষ। আনন্দ অপ্রাকৃত। আমরা সংসারে যে আনন্দ উপভোগ করি, সেইটি আনন্দের ছায়া মাত্র। আহার বিহার, সংযোগ বিয়োগ আনন্দ নয়, আনন্দের সহায় বা অবলম্বন। ধর তোমাকে যদি এই কটক হইতে পুরী যাইতে হয়, তবে তোমাকে প্রথম ঘোড়ারগাড়ী শেষে রেলগাড়ীতে চড়িয়া তবে যাইতে হইবে। এই পুরী তোমার প্রাপ্তির বিষয় তবে রেলগাড়ী প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু সেই বিষয় প্রাপ্তির সহায় বা অবলম্বন। সেইরূপ আনন্দই একমাত্র জীবের প্রাপ্তির বিষয়, সাংসারিক তাহার সহায়।

আনন্দ। আচ্ছা ! এই জগৎ প্রকৃত না অপ্রাকৃত ?

নবদ্বীপ। জগৎ প্রাকৃত।

আনন্দ। জাগতিক ব্যাপার অবলম্বনে চিন্ময় অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ হইতে পারে কি ? ধর, আহার বিহারাদি তুমি বলিলে আনন্দের অবলম্বন, এদিকে আবার বলিলে আনন্দ নিত্য এবং অপ্রাকৃত। অনিত্য বস্তু অবলম্বনে নিত্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় কি ?

২৪শ বর্ষ
৩য়, ৪র্থ সংখ্যা

ভক্তি

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ
১৩৩২

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

এস

প্রভু, হৃদি-বৃন্দাবনে, আসিয়া গোপনে
মলিনতা মোর নাশিবে।
তব নাম গানে সতত ও ধ্যানে
পরাণ আমার মাতিবে ॥
মোর, বাসনা হে মনে, পূজিব যতনে,
এসহে করুণা করিয়া।
ডাকি সকাতরে, এস হৃদিপরে
রেখেছি আসন পাতিয়া ॥
নাথ, কামনা বাসনা, জাগিলে এ প্রাণে,
দূরে সরি তুমি যেওনা।
নাশি সে কামনা জীবন আকাশে
ফুটাও প্রেমের জ্যোছনা ॥
প্রভু, মানস কুসুম, করিয়া চয়ন,
নয়নের জলে ধুইব।
ও পদ কমলে, দিব তাহা তুলে,
আর কিছু নাহি মাগিব ॥

শ্রীচণ্ডীচরণ রায়।

মঙ্গলডিহির ঠাকুর বংশ

(শ্রীযুক্ত বসুশক্তি দাস লিখিত)

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় প্রণীত, "শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল বা শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর (ব্রজের সুদাম সখা) প্রসঙ্গে লেখা আছে "বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামে সুন্দরানন্দের জ্ঞাতি বংশ আছেন, তথায় শ্রীশ্রীবলরাম জীউর সেবা হয়।" মঙ্গলডিহির নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া উক্ত বংশের ও স্থানের বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মে এবং তাহার ফলে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাই এক্ষণে 'ভক্তি'র পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি একখানি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। ই, আই, রেলওয়ে অণ্ডাল সাঁইথিয়া ব্রাঞ্চের সিউড়ি ষ্টেশন হইতে গো-গাড়ীযোগে বা হাঁটা রাস্তায় ১০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে যাইতে হয়। থানা ইলামবাজার ও পোষ্ট আফিস বাতিকার।

সেখানে ঠাকুর বাড়ীর দুইটী পৃথক মন্দিরে নিম্নলিখিত শ্রীমূর্ত্তিগুলি বিরাজমান। সেখানকার লোকে দুইটী দেবমন্দিরকে সাধারণতঃ 'বড়বাড়ী' ও 'ছোট বাড়ী' নামে অভিহিত করেন।

'বড়বাড়ীর' শ্রীমন্দিরে এক সিংহাসনে—(১) শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ ও (২) শ্রীশ্রীবলরাম জীউ। অন্য সিংহাসনে (১) শ্রীশ্রীরাধারাণী ও (২) শ্রীশ্রীরেবতী, তাঁছাড়া শ্রীশ্রীবাল গোপাল ও নানাবিধ শালগ্রাম শীলা বিরাজমান। দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে সদাব্রত ব্যবস্থা আছে, অনেকগুলি অতিথি অভ্যাগত ও বৈষ্ণববৃন্দ প্রত্যহ প্রসাদ পাইয়া থাকেন। ঠাকুর সেবার ব্যবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনক।

'ছোট বাড়ীর শ্রীমন্দিরে—(১) শ্রীশ্রীমদনগোপাল, (২) শ্রীশ্রীরাধারাণী (৩) শ্রীশ্রীবিনোদ রায় (ধাতু-মূর্ত্তি, কুলদেবতা) তাছাড়া অন্যান্য শ্রীশ্রীবালগোপাল ও বহুবিধ শালগ্রাম শীলাও পূজিত হন। এখানকার দেবসেবার ব্যবস্থাও বেশ সুন্দর।

যতদূর জানা যায়, তত্রত্য ঠাকুর বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সখ্য ভাবের চরম সাধক শ্রীপর্ণগোপাল বা পান্নুয়া ঠাকুর সর্ব্ব প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি পান বিক্রয়লব্ধ অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে পান্নুয়া ঠাকুর বলিয়া ডাকিত, তাঁহার প্রকৃত নাম গোপালচন্দ্র, পিতার নাম মনসুখ, পত্নীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া ও ভগ্নীর নাম মাধবীলতা। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী বাৎসল্য ও মাধবীলতা গোপীভাবে ভগবানের ভজনা করিতেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাবতারে শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর (দ্বাদশগোপালের একমূর্ত্তি) বৃন্দাবন গমন কালে পান্থুয়া ঠাকুরকে—কৃষ্ণমন্ত্র প্রদানে চরিতার্থ করেন। মঙ্গলডিহির সুবিখ্যাত কবি জগদানন্দ তাঁহার রচিত "শ্যামচন্দ্রোদয়" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্বে নন্দের গৃহে, বোঝা কভু নাহি বহে
পান্থুয়ার পিরীতে বহে পান॥"

কথিত আছে পান্থুয়া ঠাকুরের পানের বোঝা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিত না। ভক্তপ্রিয় ভগবান্ ভক্তের বোঝা নিজে বহন করিতেন। ভক্তাধীন গোবিন্দ চিরকালই ভক্ত-মর্য্যাদা এইরূপে বাড়াইয়া আসিতেছেন। অর্জ্জুনমিশ্র গীতার 'বহামাহং' পাঠ কাটিয়া 'দদাম্যহং' করার ফলে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল ভক্ত পাঠকবৃন্দ সকলেই তাহা অবগত আছেন, সুতরাং ঠাকুর সুন্দরানন্দের কৃপা-লাভে সৌভাগ্যবান্ সখ্যভাবের সাধক পান্থুয়া ঠাকুরের পান বহন করা—ভগবানের নিকটে কিছু নূতন জিনিস নয়। বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী দৃষ্টে যতদূর জানা যায়, পান্থুয়া ঠাকুর মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সুন্দরানন্দ ঠাকুর ১৪৩৯ শকে শ্রীপাট পানিহাটীর দণ্ড মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। যথা—

রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।
মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস।
উদ্ধারণ আদি আর যত নিজগণ।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন॥

চৈঃ—চঃ

১৫০৪ শকাব্দে খেতুরীর মহোৎসবে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয় না, ইহা হইতে অনুমান করা যায়, সুন্দরানন্দ ঠাকুরের ১৪০০ শত শকের কিছু পূর্ব্বে বা পরে আবির্ভাব এবং উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে তিরোভাব। পান্থুয়া ঠাকুরের আবির্ভাব ও তিরোভাবকাল ইহার কিছু পরবর্ত্তী বলিয়া কল্পিত হইতে পারে।

পান্থুয়া ঠাকুর কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইষ্টমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" ঘটনাক্রমে জনৈক সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া তাঁহার নিত্য-পূজিত শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ ও শ্রীশ্রীবলরাম বিগ্রহদ্বয় সহ মঙ্গলডিহি গ্রামে আসিয়া পান্থুয়া ঠাকুরের গৃহে অতিথি হন। তাঁহার আতিথেয়তায় ও ভক্তি দর্শনে চমৎকৃত

হইয়া স্বীয় বিগ্রহদ্বয় সেবারভার তাঁহার উপরে অর্পণ করিয়া শ্রীধাম পুরুষোত্তম তীর্থদর্শনে গমন করেন, তীর্থ-প্রত্যাগত সন্ন্যাসী কিন্তু শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় লইয়া যাইতে পারেন নাই, কারণ পরম ভক্ত পান্নুয়ার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীর প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, তাঁহারা পান্নুয়া ঠাকুরের প্রীতি-বন্ধন ছিন্ন করিতে অক্ষম; সুতরাং মঙ্গলডিহিতেই অবস্থান করিবেন। ভক্তির দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা পড়িলে কি আর সে বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায় আছে? তাহা হইলে ভক্তাধীন ভগবানের নামে যে কলঙ্ক আরোপিত হয়?

পান্নুয়া ঠাকুর সম্বন্ধে এতদঞ্চলে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। শুনা যায়, একদা পান্নুয়া ঠাকুরের একটী গাভীকে একটী ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের নিকট গিয়া গাভীকে রক্ষা করেন এবং ব্যাঘ্রকে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিয়া পশুজন্ম হইতে চিরমুক্ত করেন।

তৎকালে মঙ্গলডিহির নিকটবর্ত্তী কুষ্টিকুড়ি গ্রামে সাহ আবদুল্লা নামক জনৈক সিদ্ধ পুরুষ বাস করিতেন। একদিন পান্নুয়া তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া ব্যাঘ্রের উপর আরোহণ করিয়া গমন করেন, সে সময়ে উক্ত মিঞা সাহেব প্রাচীরের উপর বসিয়া একটী তেঁতুল বৃক্ষের ডালে দন্ত মজ্জন করিতেছিলেন। তিনিও কিছু ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন মানসে দাঁতন কাটি সেখানে ফেলিয়া দিয়া প্রাচীরকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। কথিত আছে উক্ত দাঁতনকাটি উক্ত স্থানে পতিত হইয়া একটি তেঁতুল গাছ জন্মে। এখনও গ্রামস্থ একটী সুবৃহৎ তেঁতুল বৃক্ষকে গ্রামবাসীরা উক্ত বৃক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

তত্পরে একদিন পান্নুয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া মিঞা সাহেব এক আসনে তাঁহার জাতি ভাই সহ তাঁহাদের যাবনিক খাদ্য দ্রব্যাদি বস্ত্রাবৃত করিয়া— পান্নুয়া ঠাকুরের সম্মুখে প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান ফাটিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং খাদ্যাদি তাঁহার শুভ-দৃষ্টিতে পুষ্পপুঞ্জে পরিণত হয়; মিঞা সাহেব তাঁহার অলৌকিক প্রভাব দর্শনে বিস্মিত হন। এইরূপে উভয়ের বন্ধুত্বেরও গাঢত্ব হয়।

দেখা যায়, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ফলে সে সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব বিদূরিত হইয়াছিল। ধর্ম্মবল্ ভিন্ন কখনও জাতীয় একতা সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, যতই সভা-সমিতি, গলাবাজি আন্দোলন চলুক না কেন, ভারতবাসী যতদিন না ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইবে,

ততদিন ভারত অধঃপতিত থাকিবেই থাকিবে। পামুয়ার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন সম্বন্ধে যে সব প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা যে ভক্তের পক্ষে বিশেষ গৌরব-জনক তাহা মনে করি না। ভক্ত সর্ব্বদাই আত্ম-গোপন করিতে চান। বিশেষতঃ "তৃণাদপি সুনীচ" হওয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। তবে ভক্ত-মহিমা প্রচার জন্য ভগবান্ ভক্তের দ্বারা মাঝে মাঝে ওরূপ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করান।

পামুয়া ঠাকুরের ঔরসজাত কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না। তিনি গড়গড়ে গ্রাম নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের পাঁচটি পুত্রকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন। তাঁহাদের নাম, (১) অনন্ত (২) কিশোর (৩) হরিচরণ (৪) লক্ষ্মণ ও (৫) কানুরাম। পামুয়ার তিরোভাবের পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও শ্রীবিগ্রহ সেবা তাঁহাদের অধিকারে আইসে।

অনন্তের বংশধরগণ মঙ্গলডিহি হইতে শ্রীবলরাম শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়া দুব্‌রাজপুরের নিকট খয়রামোলে বসবাস করেন। কিশোরের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। একটি মাত্র কন্যা, নাম হীরামুণী। কাটোয়ার সন্নিকটে কোনও সদ্বংশে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহারই বংশধরগণ শ্রীমদনগোপালের সেবাকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন এবং এই দৌহিত্র বংশ হইতে ৺মদনগোপালের পাট নামে তথায় অপর একটী পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিবারকে তত্রত্য অধিবাসীরা 'ছোটবাড়ী' বলেন। শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে তাহা সঠিক জানা যায় না, তবে অনেকে বলেন শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীমদনমোহন ও শ্রীমতীকে আনান হইয়াছিল। 'বড়বাড়ীর' শ্রীমন্দিরে এক্ষণে যে শ্রীবলরামজীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন, উক্ত শ্রীমূর্ত্তি পামুয়া ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত নহেন। পরবর্ত্তীকালে কোনও বংশধর উক্ত শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীশ্রীরাধারাণী ও শ্রীশ্রীরেবতী মূর্ত্তিদ্বয় স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীমদনগোপালের সহিত শ্রীশ্রীবিনোদরায়জীউর একটি ধাতুময়ী শ্রীমূর্ত্তি আছেন, তিনি পামুয়া ঠাকুরের আদি কুলদেবতা, পরবর্ত্তীকালে স্থাপিত হন নাই।

হরিচরণ অপুত্রক ছিলেন। লক্ষ্মণের বংশ পরিচয়ও কিছু জানা যায় না। কানুরামের পুত্রের নাম গোপাল চরণ। ইঁহারই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া মঙ্গলডিহি গ্রামের গৌরব বৈষ্ণব জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠের নাম গোকুলানন্দ ও কনিষ্ঠের নাম নয়নানন্দ, জ্যেষ্ঠটি পরম প্রেমিক ও সুগায়ক ছিলেন, কীর্ত্তনের পদ রচনায় তাঁহার অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহার পদ রচনায় সন্তুষ্ট হইয়া কাশিপুরাধিপতি গোস্বামীডিহি ও মোতাবেক নামক

দুইখানি নিষ্কর গ্রাম প্রদান করেন, উক্ত সম্পত্তির আয় এখনও ৺শ্যামচাঁদ শ্রীবিগ্রহের সেবায় ব্যয়িত হইতেছে। কনিষ্ঠ নয়নানন্দ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন, তিনি "শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রস-কদম্ব" ও "প্রেয়োভক্তি রসার্ণব" নামে দুইখানি গ্রন্থ ও অনেকগুলি কীর্ত্তনের পদ রচনা করেন। তাঁহার মধুর পদাবলী এখনও ঠাকুর পরিবারের—অনেকে গান করিয়া আনন্দানুভব করেন। গ্রন্থগুলি এ যাবৎ ঠাকুর বংশে সযত্নে রক্ষিত ছিল। কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন সম্পাদিত বীরভূমিতে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব' গ্রন্থখানি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থখানি ১৬৫২ শকাব্দে ৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শুক্ল প্রতিপদে লিখিত হয়—। 'প্রেয়োভক্তি রসার্ণব' গ্রন্থখানি তাহার একবৎসর পরে রচিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থখানি এখনও প্রকাশ হয় নাই বলিয়া বিশ্বাস।

গোকুলানন্দের পুত্র জগদানন্দও সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন এবং সুকবি বলিয়া খ্যাতি ছিল। তাঁহার রচিত "শ্যামচন্দ্রোদয়" নাটক তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব শক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। নয়নানন্দের পৌত্র ব্রহ্মানন্দ, ইনিও সুগায়ক ও সুকবি ছিলেন, জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর—"রামচন্দ্রোদয়" নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জগদানন্দের একটি পৌত্রের নাম শ্যামসুন্দর তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ও সুগায়ক ছিলেন।

মঙ্গলডিহি ঠাকুর বংশের বংশ তালিকা ধারাবাহিকরূপে সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যদি "শ্যামচন্দ্রের কৃপায় সংগ্রহ করিতে পারি, ভবিষ্যতে ভক্তির পাঠকগণকে উপহার দিব।

যদিও উক্তবংশে এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে, কিন্তু বংশগতি বৈষ্ণবতা ও কবিত্ব এখনও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল উক্তবংশের ৺হরিকিঙ্কর ঠাকুর বি, এল মহাশয় সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ে—তাঁহার মত আচার নিষ্ঠ বৈষ্ণব বড় একটা দেখা যায় না। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত রচনায় তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়া মনে হয়, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের উপযুক্ত বংশধর। তিনি "বরটীকা" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ হেতমপুর রাজষ্টেটে বিশেষ দক্ষতার সহিত ম্যানেজারের কার্য্য করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সর্ব্বদা রামকৃষ্ণ নাম স্মরণ করিতেন। তাঁহার রচিত পদাবলী বড়ই মধুর ও প্রাণস্পর্শী।

অধিকাংশ ব্রজভাষায় লিখিত। তাহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বনবিহারী ঠাকুর বি, এল এক্ষণে হেতমপুরের মহারাজকুমার রায় সদাশিবরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের ষ্টেটে ম্যানেজারের কার্য্য করিতেছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে জয়দেব কেন্দুলী ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, তাহার অমায়িক ব্যবহার বৈষ্ণবতা ও দানে মুক্ত হস্ততা সবিশেষ প্রশংসনীয়। তাহার ভ্রাতৃবৃন্দও তাহার আদেশে গঠিত হইতেছেন।

উক্ত বংশের ছোট বাড়ীর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গাঙ্গুলী ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গাঙ্গুলী বি,এ বর্ত্তমানে হেতমপুর রাজ হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন, তাঁহারা উভয়েই অমায়িক প্রকৃতির এবং বৈষ্ণবোচিত গুণরাশিও তাহাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ভোলানাথ বাবুর নিকট প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য পাইয়াছি এবং হেতমপুরের মহারাজ কুমার মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত "বীরভূম বিবরণ" হইতেও কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে।

মঙ্গলডিহিতে শ্রীশ্রীরাসযাত্রা উপলক্ষে বেশ ধুম ধাম হয়। তথায় একটী স্থান এখনও "বলরামের ঢিপ" বলিয়া কথিত হয়। যতদুর মনে হয় উক্তস্থানে শ্রীশ্রীবলরাম প্রভু জীউর শ্রীমন্দির পুর্ব্বে ছিল। পরবর্ত্তীকালে কোনও বংশধর কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর

(শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিত)

এই দীন লেখক এক সময় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের পবিত্র চরিত্র অনুধ্যানের সৌভাগ্য পাইয়াছিল, এ লেখক কৃত "শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর" নামক গ্রন্থ তখন রচিত হইতেছিল, সে গ্রন্থখানা এখন আর ছাপা নাই। "ভক্তি" পত্রিকার গত ১ম সংখ্যায় শ্রীহরিদাস সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দেখিয়া পুরাতন লালসার উদ্রেক হইতেছে।

সম্প্রতি "হরিদাস ঠাকুর" নামে একখানা অতি সুন্দর সচিত্র গ্রন্থ উপহার পাইয়াছি; জেলা খুলনা—দৌলতপুর হিন্দু একাডমীর প্রোফেসার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র এম, এ, ইহার রচয়িতা। গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, তাঁহার সুনিপুণ তুলিকায় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চিত্র অতি অপরূপ ফুটিয়াছে, হরিদাস

ঠাকুর সম্বন্ধে এত সত্য অভ্রান্ত তথ্য পূর্ণ গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হয় নাই নিঃসঙ্কোচে ইহা বলা যাইতে পারে।

শ্রীঅদ্বৈত বংশীয় গৌরাচাঁদ গোস্বামী ভ্রমণ করিয়া স্বয়ং হরিদাসের লীলা সংস্পৃষ্ট স্থানগুলি দর্শন করেন এবং শত বৎসরের প্রাচীন বৈষ্ণব উদ্ধবদাসের কাছে হরিদাস সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জ্ঞাত হন; এ সমস্ত অবলম্বনে তিনি ১১৩২ সালে "শ্রীশ্রীসঙ্কীর্ত্তন বর্ণি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন, এই অপ্রকাশিত হস্ত লিখিত গ্রন্থ সতীশবাবু প্রাপ্ত হন ও নিজ গ্রন্থের পরিবর্ত্তে উহারও একাংশ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, বুড়ন পরগণার অন্তর্গত ভাট কলাগাছি গ্রামে হরিদাসের জন্ম হয়, তাঁহার পিতার নাম মনোহর ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থে কিন্তু ইহার নাম সুমতি শর্ম্মা ছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য সঙ্গীতা গ্রন্থ ছিল আমার অবলম্বন। তখন প্রাচীন মহাজন জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল প্রকাশিত হয় নাই। প্রায় কুড়ি বৎসর হইল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ঐ গ্রন্থখানা প্রকাশ করিলে দেখা গেল যে, হরিদাস ঠাকুর প্রকৃতই ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন, এবং তাহার পিতার নাম সুমতি নহে মনোহর, নিবাস বুড়ন নহে ভাটকলাগাছি। যাহারা অনুসন্ধান ব্যতীতই মত প্রকাশ করেন, তাহারা এই চৈতন্য মঙ্গলের কথাটি শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি হইতে স্বতন্ত্র দেখিয়া এই গ্রন্থ সম্বন্ধে নানারূপ কটাক্ষ করিতে ছাড়িলেন না। যাহা হউক, সম্প্রতি সতীশবাবু এই সব কথার খুটিনাটি ভাঙ্গিয়া দেখাইয়াছেন। ভাটকলাগাছি গ্রামেই হরিদাসের জন্ম কিন্তু ঐ গ্রামটি বুড়ন পরগণার মধ্যে অবস্থিত, বুড়ন গ্রামে নহে, বুড়ন বলিয়া কোন গ্রামই নাই। হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণ কুমারই ছিলেন, পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় শৈশবে মুসলমান কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি "যবন হরিদাস" বলিয়া খ্যাত হন।

আমরা প্রাচীন অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে পাইয়াছিলাম—"যবন পালিত শিশু।" গোসাই গোরাচাঁদের গ্রন্থেও লিখিত আছে—

"যবনত্ব প্রাপ্তি তার যবনান্ন দোষে।"

এ গ্রন্থে পিতৃ-পরিচয় সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"মনোহর চক্রবর্ত্তী সুমতি ব্রাহ্মণ।"

মনোহর চক্রবর্ত্তী "সুমতি" ছিলেন—সৎলোক ছিলেন, তাঁহার এই গুণটি লোকমুখে নামের মতই বোধ হয় ব্যবহার হইত এবং সেই জন্যই চৈতন্য

সঙ্গীতাকার এইটিকেই প্রকৃত নাম মনে করিয়া ভ্রম করিয়া থাকিবেন। অথবা মনোহরের নামান্তর সুমতিও হইতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে, তৎকালে অনেকেরই একাধিক নাম থাকিত। মনোহরের স্ত্রীরও দুইটি নাম থাকা অসম্ভব নহে।

হরিদাস নামই তাঁহার হিন্দু পিতা কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। শৈশবে মাতা তাঁহার পিতৃ বিয়োগের পর চিতারোহণ করিলে, প্রতিবেশী কাজি হরিবুল্লা শিশুকে একা কাঁদিতে দেখিয়া দয়া পরবশ হন ও শিশুর রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, গোরাচাঁদ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"হরিবুল্লা নাম তার যবনকুলের মণি।
বুঝিল শিশু হইবে কালে সর্ব্বগুণের খনি॥"

কাজেই তিনি শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তিনি হরিদাসের একটি যাবনিক নাম রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হরিদাস সে নামে খ্যাত হন নাই।

হরিবুল্লার গৃহে হরিদাস বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের আচার ব্যবহার তাঁহার ভাল লাগিত না, তাঁহার উদাস চিত্ত কোথায় যেন উধাও হইয়া ছুটিত, সদাই তিনি অন্যমনস্ক থাকিতেন। এতদ্দৃষ্টে কাজি মনে করিলেন যে, বালকের বিবাহ দিয়া ফেলিতে হইবে এবং এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করিতে লাগিলেন—

"বৈরাগ্য নাশিতে কাজি নানা যত্ন করে,
বিবাহ দিলে ভাল হইবে কহে পরস্পরে॥"

হরিদাস বিবাহের কথা শুনিলেন এবং বিবাহবন্ধনের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক বেনাপোলের জঙ্গলে চলিয়া গেলেন।

বেনাপোলে লোকে একটি কুড়ে করিয়া দিয়াছিল, হরিদাস তথায় থাকিয়া হরিনাম করিতেন। এইরূপে দুই বৎসর গেল, তাঁহার খ্যাতিতে চারিদিক প্রপূরিত হইল, কিন্তু ইহাতে—

"পরশ্রী কাতর যারা সহিতে না পারে।
বাহিরে বাহিরে ঠাকুরে গালি পাড়ে॥"

সেইস্থানের জমিদার ছিলেন রামচন্দ্র খান। গোসাই গোরাচাঁদ ইহার বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য প্রদান করিয়াছেন। লোকে কোথায় তাঁহার মত প্রকাণ্ড জমিদারের গুণগান করিবে, না তৎপরিবর্ত্তে এক গৃহহীন ফকিরের যশে

দেশ পূর্ণ। অভিমানী রামচন্দ্রের ইহা সহিবে কেন? তিনি তখন এক উপায় করিলেন। লক্ষ্যহীরা নামে এক পরমাসুন্দরী বারনারী তাঁহার রক্ষিতারূপে ছিল, রূপ যৌবন সম্পন্না এই লক্ষ্যহীরাকেই হরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে তিনি পাঠাইলেন।

হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। রামচন্দ্র প্রেরিত বারনারী হরিদাসের গৃহদ্বারে গিয়া নাম জপ করিত। হরিদাসকে দেখিয়া তাঁহার অবসরের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। কিন্তু নাম জপ করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, হরিদাস বেশ্যাকে আশ্বাসবাক্য বলিয়া প্রাতঃকৃত্য করিতে চলিয়া গেলেন। অবশেষে সাধুসঙ্গ প্রভাবে বেশ্যার মন ফিরিয়া গেল; সে সর্ব্বত্যাগী হইয়া হরিদাসের উপদেশে অশেষ মঙ্গলপ্রদ হরিনামেরই আশ্রয় লইল।

হরিদাস বত্রিশ অক্ষরযুক্ত ষোল নামাত্মক হরিনাম মহামন্ত্র প্রত্যহ তিন লক্ষ জপ করিতেন। এই মহামন্ত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সকলেই জ্ঞাত আছেন ও জপ করিয়া থাকেন। দেখা গিয়াছে যে, এই মহামন্ত্র খুব দ্রুত উচ্চারণ করিলেও লক্ষ নাম জপ করিতে প্রায় সাতঘণ্টা সময় লাগে, তিন লক্ষ জপিতে একুশ ঘণ্টা সময়ের আবশ্যক। চব্বিশ ঘণ্টাত্মক দিবারাত্রির একুশ ঘণ্টা কেবল জপে অতিবাহিত হইলে তিনঘণ্টা মাত্র সময় বাকি থাকে। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার স্নানাহ্নিক ও পাক এবং ভোজনক্রিয়া সমাধা করিতে হইত। এ সব শেষ করিয়া সামান্য একটু নিদ্রা যাইতেন, তাহাও অনেকদিন ঘটিয়া উঠিত না। লক্ষ্যহীরার সঙ্গে আলাপে যে একটু সময় গিয়াছিল, তাহাতেই ঐ তুইদিন তাঁহার নিদ্রারও সময় হয় নাই এবং বেশ্যাও তাঁহার অবসর দেখে নাই।

অপর তুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না। গত ১৩২৮ বঙ্গাব্দের "শ্রীগৌরাঙ্গসেবক" পত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে অশ্লীল চিত্র ও শ্রীমূর্ত্তি-তত্ত্ব প্রবন্ধে তাহার সদুত্তর আছে।

শ্রীশ্রীনাম

(শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বক্সি লিখিত)

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

ভাই হরি বল! মহৎ ব্যক্তির আজ্ঞা পালন অতি কর্ত্তব্য, নচেৎ নরাধম, পতিত, তাপিত, মায়ামোহ-বিজড়িত, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মূর্খ আমি বৈষ্ণবগণের দাসানু-

দাসেরও উপযুক্ত নই, পূর্ণব্রহ্ম মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের 'নাম' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। বৈষ্ণবপ্রভুগণের শ্রীচরণে শতকোটী দণ্ডবৎ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছি আমার ধৃষ্টতা; মার্জ্জনা করিবেন।

নাম-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে হইলেই নামাবতার ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণ ও বন্দন কর্ত্তব্য। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বর্ণনে আমা-হেন অধম অক্ষম। বৈষ্ণবধর্ম্ম কি? বৈষ্ণব কি? গৌরধর্ম্ম বা গৌরাঙ্গদেব কি? ইহা বর্ণনা করিতে হইলে যেমন রাধাপ্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত ভগবানকে স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তদ্রূপ পুনরায় তাঁহার দেহ ধারণের প্রয়োজন। বৈষ্ণব কি বৈষ্ণবই জানেন। গৌরাঙ্গদেব কি গৌরাঙ্গদেবই জানেন। গৌরাঙ্গদেবের উপমা গৌরাঙ্গদেব। "তোমারি তুলনা প্রভু তুমি এ মহী-মণ্ডলে।" বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। গৌরাঙ্গদেবের বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা একটি স্থূলকায় পুস্তকেও হয় না। এ প্রবন্ধেও নিষ্প্রয়োজন। তবে সর্ব্বপ্রধান যে চারি সম্প্রদায় এক্ষণে বর্ত্তমান আছে; যথা রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য এই চারি সম্প্রদায়ই বিষ্ণুভক্ত। কিন্তু এই সকল সম্প্রদায় বা ইহাদের শাখা প্রশাখা কোন সম্প্রদায়ই আচণ্ডালে আলিঙ্গন দানে প্রস্তুত নন। ভক্তিব্যাখ্যা, মায়াবাদ খণ্ডন প্রভৃতি নানা প্রকার আলোচনা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় কিন্তু কেবল গৌরভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবই আচণ্ডালে আলিঙ্গন দেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বে কেহই আচণ্ডালে নাম প্রেম বিতরণ করেন নাই এবং নাম-ধর্ম্মের বহুল প্রচারও হয় নাই।

আমি যে এ বিষয় নূতন কিছু প্রকাশ করিতেছি তাহা নয়, তবে সাধুসন্ন্যাসী-দের নিকট যে সকল শাস্ত্রের উপদেশ পাইয়াছি এবং উপদেশগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ও আমাদের বিশেষ উপকারী বলিয়াই সর্ব্বসাধারণে তাহা প্রকাশ করিতেছি। হিন্দু শাস্ত্র খেলার জিনিষ নয় বা অনুমানের উপরও স্থাপিত নয়, প্রত্যক্ষ অনুভব-গম্য জানিবেন। পাঠক পাঠিকাগণ! আমার একটি অনুরোধ, আমার ভাষার ভুল না ধরিয়া বিষয়টির গুরুত্ব বিচার করিলেই সার্থক মনে করিব।

হে প্রভু! হে ইচ্ছাময়! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সাধক-হৃদয়নিধি শ্রীগৌরাঙ্গ! তোমার "তত্ত্ব" তুমি নিজে না বুঝাইলে কে বুঝিতে পারে? কৃপাময়! ইচ্ছাময়! তুমি নিজে ইচ্ছা করিয়া তোমার সেই সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত না হইলে কি এই পাপপরিক্লান্ত চির নিরুদ্যম জীবের সন্ধানে তোমার "তত্ত্ব"

বুঝা যায় ?—অসম্ভব। কৃপানিধান! দয়াময়। তুমি নিজেই কৃপা করিয়া ও সদয় হইয়া যদি এ দগ্ধহৃদি-কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হও তাহাহইলেই তোমার "তত্ত্ব" এ জগতে বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। প্রভু! তাই তোমায় সূচনায় স্মরণ করিতেছি। হে পাপিত্রাতা দীনদয়াল ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু। দয়া করিয়া তোমার সেই দিব্যমূর্ত্তিতে একবার এ হৃদয় মরুভূমিতে আসিয়া আসন পরিগ্রহ কর, মরুক্ষেত্র শান্তিক্ষেত্রে পরিণত হউক, এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমারই দয়ায়, তোমারই ভাষায়, তোমার "তত্ত্ব" জগতে প্রচারিত হউক। নতুবা একি বুঝিবার বা বুঝাইবার বস্তু ?

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের কথা জগতে কেইবা অবিদিত আছেন ? তৎসম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় অবশ্য উল্লেখ যোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি। ইহাতে আমার মৌলিকতা কিছুই নাই বা এ ক্ষেত্রে আমি সেরূপ কোনও বিষয়ের প্রয়াসী নহি। যিনি আপন স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে আত্মমহিমায় আপনিই উদ্ভাসিত, তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য লৌকিক ভাব ও ভাষার যে কোনও উপযোগিতা আছে,—একথা আমি স্বীকার করি না। তবে কেন যে আমি কিঞ্চিৎ কালের জন্য আমার এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মধ্যে, এই অমৃতাস্বাদনের উদ্‌ভ্রান্ত পাঠক পাঠিকাগণকে সংবদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট হইতেছি, তাহার কারণ অন্য কিছুই নহে, "নাম" রূপ এই অমৃতের পুরে এক বিন্দু কর্পূরের সংযোজনাই আমার উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণে ও কীর্ত্তনে প্রাণের মাঝে কি যেন কি এক নব ভাব জাগাইয়া দেয়, হৃদয় তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, অশ্রুধারায় বুক ভরিয়া যায়, চন্দ্রালোকের সুশীতল স্পর্শের ন্যায় এক অজানা আনন্দের স্নিগ্ধ স্পর্শ যেন দেহের প্রতি অণুতে অণুতে অনুভব হইতে থাকে। সেই অমূল্য নিধি সমূহ প্রবন্ধের উপকরণরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায়, আমার ইচ্ছা সেই ভগবান মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পাষাণ গলান সুমধুর পতিতোদ্ধারণ লীলা কথা আত্মশুদ্ধির বাসনায় এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আশা করি অমৃতের পুরে কর্পূর বিন্দুর প্রয়োগ ভক্তজন মাত্রেরই প্রীতি বর্দ্ধক হইবে।

অতি শৈশবকাল হইতেই মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব অলৌকিক গুণাবলী ও অসাধারণ প্রতিভায় ভূষিত ছিলেন। আপামর যে কেহ তাঁহাকে সন্দর্শন করিত সেই যেন কি একটা স্নিগ্ধ মধুর ভাব উপলব্ধি করিত। মহাপ্রভুর নব ভাবের উচ্ছ্বাসে ভারত ভূমিকে আকুল করিয়া দিয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের হাস্য, ক্রন্দন, উদ্বেগ, দৈন্য ইত্যাদি অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাব সমূহ সন্দর্শন করিয়া সাধারণ লোকে

এমন কি তাঁহার জনক জননী পর্য্যন্ত মনে করিতেন নিমাই আমার পাগল হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ সাধারণ উন্মত্ততা নহে ভগবদ্ভক্তমাত্রেই বুঝিতে পারিলেন যে ইহা প্রেম কৌমুদীর পূর্ণ বিকাশ। আহা! যে প্রেম মদিরা পান করিয়া পাগল হইবার জন্য, শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ অনাদিকাল ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রাদি সুদুর্ল্লভ সেই প্রেমোন্মাদনায় মহাপ্রভু সতত উন্মত্ত। এই সময় হইতে মঙ্গলময় সুমধুর শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রচার আরম্ভ হয়। সে সময় ভারত ভূমি এক নূতন শোভা ধারণ করিয়াছিল। নাম সংকীর্ত্তনের মধুর বোলে খোল করতালের সুমধুর তালে, বঙ্গ ভূমি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আহা! মহাপ্রভুর নূতন পদে, নূতন ভাবে চতুর্দ্দিকে একটা নূতন মাধুরী ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর নাম ও প্রেম কল্লোল বারিধির ঘাত প্রতিঘাতে ভারতবর্ষ টলমল করিয়াছিল। প্রাণমাতান সুমধুর ভুবন মঙ্গল হরিনামের উচ্ছ্বাস তুলিয়া বঙ্গভূমিকে সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করিয়াছিল। গৌরলীলার কি অত্যদ্ভুত প্রভাব, যে শান্তিসুধা লীলাকথা শুনিতে শুনিতে নবজগতের ত্রিতাপদগ্ধ মনুষ্যগণ অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিতেন। কথিত আছে, যখন মহাপ্রভু সপার্ষদে কীর্ত্তন করিতেন তখন গোলক ও ভূলোক এক হইয়া যাইত। ধন্য সেই কীর্ত্তন! ধন্য সেই সম্মিলন! ধন্য আমাদের সেই মহাসংকীর্ত্তনের প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব! যাঁহার নাম সংকীর্ত্তনে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, সাধু, সন্ন্যাসী, উদাসী, ফকির, মহাজন, পতিত, ঘৃণিত, অধম, আচণ্ডাল সকলেই উদ্ধার পায়। আমি মহাসংকীর্ত্তনের কথা প্রকৃত ভাষায় বলিতে অসমর্থ। ভাবুক ভক্ত, পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারা ভাবনেত্রে সে অপূর্ব্ব চিত্র বোধহয় অনুভব করিতে পারিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন যে, "প্রতিযুগের অবস্থা ও শিক্ষানুসারে ভগবান যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞাদি, দ্বাপরে ঈশ্বর সেবা ও কলিতে নাম সঙ্কীর্ত্তন, এইরূপে যুগ চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম নিরূপিত আছে। আমার বিবেচনায় আর সমস্ত কুটিনাটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'নাম' সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন, নাম সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম হইবে, তখন আপনি অনায়াসে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বরতত্ত্ব কি? তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না, আপনা আপনি অনুভব করিতে হয়।" যিনি গৌর প্রেমে না মজিয়াছেন তিনি কেমন করিয়া জানিবেন কেমন করিয়া বলিবেন এ কিসের ভাব! এ কোন আনন্দ সাগরের প্রবল ঘাত

প্রতিঘাত। শ্রীশ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গলীলা মাধুর্য্য শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অত্যদ্ভুত প্রভাব তাঁহার হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে অনুভব করিতেন ; সেই অনুভূতিই জগতে ব্যক্ত করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গের দুটিপদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তারে হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী॥"

মহাপ্রভুর প্রকটকালীন বাণী :—এসো,দীনহীন পাপী তাপী যে যেখানে আছ এসো, এসো, দয়াল নিতাই ব্যাকুল হইয়া তোমাদের নাম প্রেম নিবার জন্য ডাকিতেছেন। শুনিতেছ না—

"ধর' নাও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়॥"

পতিত শোনো—বৈষ্ণবগণ উচ্চনাদে বলিতেছেন :—

"যারা মার খেয়ে প্রেম বিলায়
তারা—তারা দু'ভাই এসেছে রে।"

তবে আর ভয় কি ? ভব সাগর ত গোষ্পদ! বিশ্বাস করো, বৈষ্ণবের বাক্য মিথ্যা নয়। তাই বলি ভাই—"নামকর।"

বৈদিক সাধন অতি কঠোর, এই নিমিত্ত তন্ত্র কলিতে বিধি দিয়াছেন,—"জপাৎ সিদ্ধিঃ"। কিন্তু কলির দুর্দ্দম শাসনে ক্রমে দুর্ব্বলতর জীবের পক্ষে তাহাও কঠিন। মহাপ্রভু দেখিলেন, কলির জীব জপ করিতে অক্ষম। দয়াল প্রভু এই নিমিত্ত অতি গুহ্যতর তত্ত্ব জীবের হিতার্থে প্রচার করিলেন—নামই সর্ব্বস্ব, নামই ব্রহ্ম, নাম ও ব্রহ্ম অভেদ জ্ঞান করো, ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায় পার হও। কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত নামে রুচি জন্মে না। চিত্ত শুদ্ধির বহুবিধ উপায় শাস্ত্রে নিরূপিত আছে কিন্তু কলির জীব সে সকল পন্থা অবলম্বনে অপটু। পতিত পাবন গৌরাঙ্গদেব বলিলেন, জীবে দয়া রাখো, কোটী কোটী কঠোর তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবে নাম ব্রহ্ম অভেদ বুঝিবে, মানব জন্ম সার্থক হইবে। নাম

ধর্ম্ম চারি যুগে বর্ত্তমান থাকিলেও প্রচার ছিল না। পূর্ণব্রহ্ম মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের সময় হইতে ইহার বহুল প্রচার ও নাম ধর্ম্মের বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। নামাবতার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব এই নূতন নাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ইং ১৪৮৫ অব্দে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্ধান হয়।

"চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান।" (চৈতন্যচরিতামৃত।)

নাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব ও প্রেম-লহরী পূর্ণ জীবনী সিন্ধুর এক বিন্দুও আমি যে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিয়াছি ইহা মনে হয় না। তবে কোনদিন যদি সাধু বৈষ্ণব ভক্তগণের কৃপাকণা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে সেই কৃপারশ্মির প্রভাবে ভবিষ্যতে জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। গৌরাঙ্গদেব ও গৌরধর্ম্মের বিষয় আমূল অবগত হইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক "চৈতন্য-চরিতামৃত" ও "চৈতন্য ভাগবত" পাঠ করেন ইহাই বিনীত নিবেদন। আমি শুধু এই বলি গৌরধর্ম্মের তুল্য উদার মহান্ ধর্ম্ম আর নাই।

হায়! হায়! দীনহীন অধম আমি, আমার আপনাদের উপদেশ দিবার ক্ষমতা নাই, তবে গললগ্নীকৃতবাসে অনুরোধ করি, যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ভগবানের ভাণ্ডারে নাই, যাহা অতুলনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সহজ ও মনোরম সেই "নাম" আপনারা করুন। আমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ "নাম" করুন। নাম করা অপেক্ষা প্রধান যজ্ঞ, মহা তপস্যা, প্রধান ব্রহ্মচর্য্য, প্রধান পূজা, শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কিছুই নাই; সকল দিকে দৃষ্টি শূন্য হইয়া খেতে শুতে, জাগিতে ঘুমাতে সুধামাখা হরিনামটী করুন। নামের জন্য আসন প্রাণায়াম ভূতশুদ্ধি করন্যাস অঙ্গন্যাস, কিছুই আবশ্যক হয় না। গঙ্গাজলের জন্য কোন মন্ত্র শুদ্ধির আবশ্যক হয় না কেন না সে নিত্য শুদ্ধ, "নাম" তাহা অপেক্ষাও শুদ্ধতর, গঙ্গার এত শুদ্ধতর পবিত্রতা কেবল বিষ্ণুপাদ স্পর্শ নিমিত্ত, কিন্তু "নাম" যে গঙ্গা অপেক্ষাও অধিকতর পবিত্র সে কথা ধ্রুব সত্য, তাহার জন্য কোন বিচারের আবশ্যক নাই। অতএব পাঠক পাঠিকাগণ! সব ছেড়ে নামে মগ্ন থাকুন। নামই আপনাদের প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া দিবেন। কোনরূপ সাহায্যের আবশ্যক হইবে না। অন্ধকারের আলো "নাম", হৃদয়ান্ধকারের মধ্যে পবিত্র নির্দ্দিষ্ট পথ "নাম" রূপ আলোর সাহায্যে দেখিতে পাইবেন। তাই বলি—"নাম" করুন, নাম

করিবার জন্য কোন প্রকার পদ্ধতি বা কাল নিয়ম নাই, শুচি অশুচির প্রয়োজন নাই। যে কোন প্রকারে নাম গ্রহণ করুন, আর যাঁহারা নামে মগ্ন তাঁহাদের সঙ্গ করুন, পরম কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

"নামতত্ত্ব" কি বুঝিবার বা বুঝাইবার বস্তু? নামী স্বয়ং বুঝাইয়া না দিলে নামী স্বয়ং হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া "নামতত্ত্ব" বুঝিবার জন্য হৃদয়ের তন্ময়ত্ব-ভাব জন্মাইয়া না দিলে, আর কাহার সাধ্য যে "নামতত্ত্ব" বুঝিতে পারে বা বুঝাইতে পারে? দয়াল! প্রভু! নামতত্ত্ব যে বাঙ্মনোবুদ্ধির অগোচর, চিন্তার বহির্ভূত, কল্পনার অতীত! যাহাকে তুমি জানাও সেই তাহা জানে, যাহাকে তুমি বুঝাও সেই তাহা বুঝে, যাহাকে তুমি মজাইয়াছ সেই তাহাতে মজিয়াছে। নচেৎ তোমার "নামতত্ত্ব" কে বুঝিবে প্রভু! এ অধম, দুর্ভাগ্য, পাপীর সাধ্য কি যে, বুঝিবে বা বুঝাইবে। তুমি যে প্রভু পতিত পাবন! গতি মুক্তির উপায়ও পতিতোদ্ধারের ভার চিরকালই তোমার উপর। এক মাত্র ভরসা তুমি প্রভু! হে সর্ব্বনিয়ন্তা! হে জগদীশ্বর! তুমি না শিখাইলে আর কে শিখাইবে প্রভু! তাই কাতর কণ্ঠে নিবেদন—তুমি অকূল কাণ্ডারী, অনাথ বন্ধু, "নামতত্ত্ব" হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় বিধান তুমিই কর দয়াময়!

কৃপাময়! আর কিছুই চাই না—কেবল মাত্র তোমার সেই শক্তি চাই, যে শক্তির বলে তোমার "নামতত্ত্ব" আমার হৃদয়ঙ্গম হয়। দয়াল! আমার আর কোন অভিলাষ নাই, মাত্র এই অভিলাষ, যেন তোমার নামতত্ত্বে চিরদিন মতি থাকে।

নামাশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই, নামাশ্রয় করিয়া চলিলেই প্রেম আসিবে তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই, প্রেম আসিলেই প্রেমময় ভগবান দর্শন দিবেন। "নাম" ছাড়িলে চলিবে না, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব অবস্থায় নামটী স্মরণ থাকা চাই, নতুবা কোন সন্ধান মিলিবে না। নাম সৎ, নাম চিৎ, নামই আনন্দ। নামের দ্বারাই সচ্চিদানন্দ প্রেমের বিকাশ সর্ব্বত্র। পূজ্যপাদ, প্রেমিক ভক্ত-চূড়ামণি সাধক শ্রেষ্ঠের, উক্তি :—

"অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি দেবগণ দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥

শতভার সুবর্ণ গোকোটি কন্যা দান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই নাম সঙ্কীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন॥
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥
কৃষ্ণ নাম হরি নাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর॥"

আমাদের দীন হীন মূর্খের একান্ত অনুরোধ আপনারা সর্ব্বাশ্রয়—পরিত্যাগ করিয়া নামাশ্রয় গ্রহণ করুন। আপনাদের ভয়ই বা কি—ভাবনাই বা কি? নাম করিলে ভবভয় দূর হয়—ঐহিক ভয় কোন ছার। দয়াল, বাঞ্ছা-কল্পতরু আপনাদের সমস্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন—যেন নাম বিস্মরণ না হয়। নামকারীর ভয় জন্মায় এরূপ ভয় আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই—মাভৈঃ। আহা! আহা! নামাশ্রয়ে কি আনন্দ, কি শান্তি তাহা প্রকাশ করিবার বা বুঝাইবার যোগ্যতা আমার নাই। এসব জিনিস বাক্য দ্বারা বুঝান বা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। একমাত্র সাধনের দ্বারাই ইহা প্রস্ফুটিত ও অনুভূত হয়। জন্মান্ধকে কি কখনও কোন দৃশ্য বস্তু ও কারুকার্য্য উদাহরণের দ্বারা বুঝান যায়? চিনির মিষ্টত্ব কি ভাষায় উপলব্ধি হয়? অসম্ভব। নামাশ্রয়ের আনন্দ ও শান্তি বুঝানও তদ্রূপ। তবে ভ্রাতৃবৃন্দ! 'নাম' করুন—নামে মগ্ন হউন, অচিরেই সমস্ত উপলব্ধি হইবে।

নাম সর্ব্বত্র। আকাশ ব্যাপিয়া নাম, হৃদয় ভরিয়া নাম, অন্তরে বাহিরে নাম,—এই কথাই সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রকাশ। সাধু মহাজনদিগের নিকট এই কথাই শুনি—তথাপি আমাদের চৈতন্য কোথায়? আমরা মিথ্যা অসার পদার্থেই সর্ব্বদা মগ্ন; প্রকৃত সত্য, বিশুদ্ধ সর্ব্বদুঃখহর নামকে অন্তর হইতে অন্তরে রাখিয়াছি। হায়রে মানব! ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি আছে? "কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরম্"

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দস্তব।

(শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত)

একচক্রাসুধাকর হাড়াইসুত।
পদ্মাবতী কুমার রূপ গুণ যুত॥
প্রেমভক্তি প্রকাশিতে কলিযুগে।
অবতীর্ণ হইলেন মহাপ্রভু আগে।
মহাজনগণ বলরাম গণে।
নিত্যানন্দ দয়া কর দীন হীনে। ১॥
অভিমান শূন্য নগরে নগরে।
বিলাইল প্রেমসুধা সবাকারে॥
জাতি না বিচারি শূদ্র আচণ্ডালে।
প্রেমে মত্ত প্রভু তুলে লন কোলে॥
হেন প্রভু ভজ সদানন্দ মনে।
নিত্যানন্দ দয়া কর কর্ম্ম হীনে॥ ২॥
দুটী বাহু তুলে নাচে হরি ব'লে।
ভাসে বক্ষঃস্থল সদা অশ্রু জলে॥
শত কোটী চাঁদ যেন ধরাতলে।
গোরা প্রেম মত্ত প্রভু ধীরে চলে॥
দ্বারে দ্বারে যাচে কিবা প্রেমধনে।
নিত্যানন্দ দয়া কর জ্ঞান হীনে॥ ৩॥
বসু জাহ্নবা-জীবন সদয় চিত।
পতিত তাপিত ডাকে অবিরত॥
ল'য়ে পাপরাশি যাচে নামামৃত।
বলে "গাও সবে হরি নাম গীত॥
ভব ভয় যাবে হরি নাম গুণে।"
নিত্যানন্দ দয়া কর ভক্তি হীনে॥ ৪॥
দীন হীন উদ্ধারিতে অবতার।
হেন প্রভুপদে মতি কর সার॥
অনায়াসে ভবপারে যদি যাবে।
ত্রিতাপে তাপিত যদি না হইবে॥
লওরে শরণ তাঁহার চরণে।
নিত্যানন্দ দয়া কর গুণ হীনে॥ ৫॥

কংস

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন লিখিত)

প্রথমেই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে কংসের কথা বলিতেছি। নিত্য কংস একটি তত্ত্ব বা চৈতন্যের একটি অবস্থা, আমাদের প্রত্যেককেই একদিন না একদিন এই অবস্থা অতিক্রম করিতে হইবে। সকলের বয়ঃক্রম সমান নহে, কেহ হয়ত অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহার চরণে প্রণাম। কেহ হয়ত এখন কংসরাজ্যে

অবস্থান করিতেছেন। আবার অনেকে এখনও এতদূর আসেন নাই। এখনও জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। তাহার পর এই কংসের নিকট আসিবেন; এই নিত্যকংস। যিনি প্রকট বা ঐতিহাসিক কংস তিনি এই নিত্য কংসের ঘনীভূত মূর্ত্তি বা স্থূলপ্রকাশ। শ্রীমদ্ভাগবত বা ভারতবর্ষীয় লীলাবাদ আলোচনা করিতে হইলে এই সূত্রটি সর্ব্বদাই ধরিয়া থাকিতে হইবে, নতুবা পদ-স্খলন বা ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুসারে কংসের কথা বলিতেছি।

কংস রাজপুত্র। প্রথম যখন তাহার সহিত দেখা হইল, তখন সে মন্দলোক নহে, বরং সাধারণ সাংসারিক হিসাবে সে ভাললোকই। দেবকী তাহার ভগিনী, সহোদরা নহে, তবে সম্পর্ক নিকট। বসুদেবের সহিত দেবকীর বিবাহ হইয়াছে, সমারোহের বিবাহ। আজ বিবাহের পরদিন, খুব ঘটা করিয়া বসুদেব নববধূকে লইয়া বাড়ী যাইতেছেন। সঙ্গে বহু লোকজন, স্বর্ণমালায় অলঙ্কৃত চারিশত হস্তী, পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ, বিবিধ ভূষণে ভূষিত দুইশত দাসী এতদ্ব্যতীত বিবিধ বাদ্যভাণ্ড, শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত হইতেছে। বিশাল সমারোহপূর্ণ শোভাযাত্রা। সকলেই আনন্দিত। অন্যান্য সকলের ন্যায় কংসেরও হৃদয় আজ আনন্দে পরিপূর্ণ।

দেবকী ও বসুদেব যে সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়াছেন, কংস সেই রথে সারথী হইয়া অশ্বের লাগাম হস্তে রথ চালনা করিতেছে। পরমানন্দে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ এক দৈববাণী হইল। দৈববাণী কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ওরে মূর্খ, আজ তুই তোর যে ভগ্নীকে আদর করিয়া রথে তুলিয়া নিজে রথ চালাইয়া লইয়া যাইতেছিস্, তোর এই ভগ্নীর অষ্টমগর্ভে যে জন্মগ্রহণ করিবে সে তোর হত্যাকারী।" ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলা হইয়াছে "শত্রু জনয়িত্রী-বহনাৎ স্বমরণাজ্ঞানাচ্চ মূর্খঃ।" নিজের শত্রুর জনয়িত্রীকে বহন করিতেছিস এবং নিজের মরণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই অতএব তুই মূর্খ।

কংস এই দৈববাণী শুনিল। কংস যাহা করিল তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু সে কথা এখন থাকুক। প্রথমে আমাদের চিন্তা করা যাউক, কংস যখন মানব, তখন তাহার কি করা উচিত? কংস এই দৈববাণীর ব্যাপারটিকে যত ভয়ানক বলিয়া মনে করিল, বাস্তবিক তাহা তত ভয়ানক নহে। একথা বসুদেব কিছুক্ষণ পরে কংসকে বুঝাইয়া দিবেন। এই দৈববাণী শুনিয়া কংস যদি ভাবিতে পারিত যে "দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান আমাকে হত্যা করিবে! সে অনেকদিনের

কথা ; আমি যখন দেহধারী, আমার যখন জন্ম হইয়াছে তখন আমাকে মরিতে হইবে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে প্রকারেই হউক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র আমাকে হত্যা করিবে সে জন্ম দেবকী কি করিবে? তাহার অপরাধ কি? সে বালিকা, বিবাহের পর পতিগৃহে যাইতেছে, আজ এই আনন্দের উৎসব। দৈববাণী যাহা বলিলেন, তাহা যদি সত্যও হয় তাহা হইলেও এখন সে সম্বন্ধে কিছুই করিবার নাই। তাহার পর দৈববাণী। ভবিষ্যতের কথা। সত্য কি মিথ্যা কে বলিতে পারে?" এইরূপ চিন্তা করিয়া কংস ধীরচিত্তে এই দৈববাণীকে আপাততঃ অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পারিত। কংস যদি তাহা করিতে পারিত তাহা হইলে কংসের জয় হইত। কিন্তু তাহা হইল না।

কংস অন্য প্রকার চিন্তা করিল। আর কংসের যে চিন্তা তাহাকে চিন্তা না বলাই সঙ্গত। দৈববাণী শুনিয়া কংস উত্তেজিত, আত্মহারা ও অধীর হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই প্রকারের একটা চিন্তা উঠিল—"আমি।" "আমি মরিব!" হায় হায়! সে কি নিরানন্দ। সে কি দুঃখ! আমি মরিতে চাই না। "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে *** আমি বাঁচিবারে চাই।" "দেবকী!" "দেবকীর পুত্র আমায় মারিবে? আমার হত্যাকারীর জন্ম হইবে দেবকীর গর্ভে! দাঁড়াও দেবকীকে মারিয়া ফেলিতেছি, দেখি আমার মরণ কি প্রকারে কোথায় জন্মগ্রহণ করে!" ইহাই কংসের চিন্তা। শেষ সময় কংস ধরিল, দেবকী যেন বৃক্ষ, আর আমার যে মৃত্যু সে যেন এই বৃক্ষের একটি ফল। আজ যদি আমি এই বৃক্ষকে নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে হে আমার মরণ! তুমি জন্মাইবে কি করিয়া? তুমি জন্মাইবার গাছ না পাইয়া নিরুপায় হইয়া ফিরিয়া যাইবে, তাহার ফলে আমি অমর হইব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া কংস এক সুশাণিত খড়্গহস্তে লইয়া দেবকীর চুলের মুষ্টি ধরিয়া তাহাকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইল। নিকটে ও চতুর্দ্দিকে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও মুখে কথা নাই, অসহায়া দেবকী থর থর কাঁপিতেছে, বসুদেবও বীর, কিন্তু তিনি দৈহিক শক্তির বীরত্ব প্রকাশ করিলেন না, তিনি নিমেষমধ্যে কংসের হাত ধরিয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন ও অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

বসুদেব যাহা বলিলেন তাহা অত্যন্ত গভীরার্থ পূর্ণ, তাহার তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে কংস কি তাহা অতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি প্রথমে

কংসের প্রশংসা করিলেন, তাহাকে বলিলেন—"তুমি বীর, তোমার গুণ প্রশংসনীয় তুমি ভোজবংশের যশস্কর।" বসুদেব মিথ্যা বলেন নাই বসুদেব চাটুবাক্য বলেন নাই, বসুদেবের দেখিবার প্রণালী সাধারণ মানুষের দেখিবার প্রণালী হইতে পৃথক। আসুন, আমরা বসুদেবের চক্ষু ও হৃদয় লইয়া বসুদেবের কথাগুলি আলোচনা করি।

কংস বেচারা বাঁচিতে চায়। মৃত্যুর যাহা যাহা নিদান সে তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে চায়। ইহাতে তাহার অপরাধ নাই, তবে বেচারা অজ্ঞান, সে কিছুই জানে না, কি করিলে সত্য সত্য অমরতা লাভ করা যায় তাহা সে জানে না। তাহার অমৃত পিপাসা প্রশংসনীয়, তবে অজ্ঞান বলিয়া অমৃতলাভের প্রকৃত উপায় কি, তাহা সে জানে না ইহাই তাহার অপরাধ, অজ্ঞানতাই এই অপরাধের হেতু। সুতরাং তাহার উপর রাগ করিয়া কি হইবে? বরং তাহাকে ভালবাসিয়া বা তাহার অন্তরের অন্তরে যে ভাল জিনিষটুকু আছে সেইটুকু দেখিয়া তাহাকে তাহার অধিকারানুযায়ী সুপথ প্রদর্শন করাই উচিত। বসুদেব তাহাই করিলেন।

তাহার পর বসুদেব কংসকে বুঝাইলেন যে, এই সংসারে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব। দেহের জন্মের সহিত মৃত্যুরও জন্ম হয়, সুতরাং ভাই কংস! আজ যদি তুমি দেবকীকে মারিয়াই ফেল, তাহা হইলেও তুমি মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে ত্রিংশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—দেখ ভাই কংস! আমাদের সকলের বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা, তোমারও সেই ইচ্ছা আছে, ইহা দোষের নয়, ইহা প্রশংসার, কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কে চিরদিন বাঁচিতে চায়? সে কি এই দেহ? না তাহা নহে। একটা দৃষ্টান্ত দেখ, আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, নিম্নে একটী সরোবরে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, সরোবরের জল বাতাসে কাঁপিতেছে বলিয়া প্রতিবিম্বটিও বড়ই অস্থির, কেবলই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, একজন লোক সরোবরের জলে চাঁদের ছবি পড়িয়াছে তাই দেখিতেছে। সে লোকটী ঐ প্রতিবিম্ব দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে। তাহার মনের ইচ্ছা স্থির পূর্ণচন্দ্র দেখি, কিন্তু সরোবরের বুকে প্রতিবিম্ব ছবিটী কিছুতেই স্থির হইতেছে না, কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হইতেছে না, কেবলই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সেই লোকটী একবার চাঁদের ছবিকে, একবার সরোবরকে একবার সেই তরঙ্গ গুলিকে কাতর স্বরে অনুনয় করিয়া বলিতেছে—ও সরোবর, ও তরঙ্গ, ও চাঁদ

স্থির হও, তোমাদের পায়ে ধরি স্থির হও। আমি পূর্ণ অচঞ্চল চাঁদ চাই। অনেক অনুনয় করিয়া কিছুই হইল না, তখন করুণ রসের অভিনয় ছাড়িয়া ঐ লোকটী বীররসের অভিনয় আরম্ভ করিল অর্থাৎ একগাছি লাঠি লইয়া বা তরবারী লইয়া সরোবরকে আঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে ফল বিপরীত হইল অর্থাৎ প্রতিবিম্বের চাঞ্চল্য না কমিয়া আরও বাড়িয়া গেল, এখন উপায় কি ?

ঐ লোকটীর মনে চাঁদকে পূর্ণাঙ্গ ও অচঞ্চল অবস্থায় দেখিবার বা পাইবার ইচ্ছা জাগ্রত হইবার পূর্ব্ব হইতেই চাঁদ আকাশে পূর্ণাঙ্গ ও অচঞ্চল অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে। এমন কথাও বলা যাইতে পারে যে, চাঁদ আকাশে পূর্ণাঙ্গ ও অচঞ্চল হইয়া বসিয়া আছে বলিয়াই ঐ লোকটীর মনে অচঞ্চল ও পূর্ণাঙ্গ দেখিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে নতুবা তাহার মনে ঐ প্রকারের ইচ্ছারই উদ্গম হইত না। এখন লোকটী কি করিবে? সে নীচের দিকে চায় কেন? এ যে ছায়া, এ যে সংসার, ইহাতো স্থির হইতে পারে না। আগুনকে যদি কেহ বলে—ভাই আগুন, তুমি শীতল হও, তাহা হইলে আগুন বলিবে—ভাই, যদি শীতল হই তাহা হইলে আমি যে আগুনই থাকিব না। তেমনই সংসারকে যদি কেহ স্থির হইতে বলে তাহা হইলে সংসার বলিবে, স্থির হইলে আমি যে সংসারই থাকিব না। তেমনি ভাই কংস, তুমি বাঁচিতে চাও খুব ভাল, কিন্তু শরীর লইয়াতো বাঁচিবে না। শরীরের স্বভাবই শীর্ণ হইয়া ধ্বংস হওয়া।

বসুদেব কংসকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন। কংস অবশ্য বসুদেবের সমুদয় কথা বুঝিল না। বসুদেবের কথা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলে কংস আর কংসই থাকিত না। সাধারণ অভিধানে "কম" ধাতু হইতে কংস পদটী নিষ্পন্ন করা হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণব তোষণী টীকায় বলা হইয়াছে "কসি" ধাতু হইতে কংস পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "কসি ধাতোঃশাতনার্থত্বাৎ" শাতন শব্দের অর্থ বিনাশন, নিজে বাঁচিবার জন্য যে জগৎকে বিনাশ করিতে চায় সেই কংস, সুতরাং বসুদেবের উপদেশ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা কংসের পক্ষে অসম্ভব।

বসুদেব সর্ব্বশেষে বলিলেন, "দেখ ভাই কংস, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। দেবকীর পুত্র জন্মাইলে আমি সেই পুত্র তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তাহাকে লইয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিও।

বসুদেবের কথায় কংস দেবকীকে হত্যা করিল না। এইবার কংসের

অবশিষ্ট কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। মাতা দশমাস দশদিন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া অকথ্য প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করার পর সেই সন্তানটীকে প্রসব করিয়াছেন। সুন্দর সুকুমার শিশু, যেন নন্দনের বিকশিত পারিজাত ফুল, দেবতার আশীর্ব্বাদ—অতীত শতজন্মের তপস্যার ফল যেন মূর্ত্তিমান হইয়া কোল আলো করিয়া আসিয়া উপস্থিত। ভাব-স্তিমিত নেত্রে নবীনা জননী শিশুর মুখের পানে চাহিয়া আছেন। শিশুর নয়নে বৈকুণ্ঠের অম্লান জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া জননী পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছেন। এমন সময় নিষ্ঠুর কংস আসিয়া মায়ের কোল হইতে সেই শিশুটীকে বজ্র মুষ্টিতে কাড়িয়া লইয়া শাণিত তরবারির আঘাতে তাহার শিরচ্ছেদ করিতেছে। নিষ্কল সুন্দর শিশুর শোণিতে পৃথিবীর বুক ভাসিয়া গেল। আর জননী—"হা পুত্র! হা বিধাতঃ!" এই বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। "হায় কংস! কি করিতেছ? ঐ শিশু তোমার কি করিয়াছে?" কংস বলিল "ঐ শিশু যে নির্দ্দোষ তাহাতো আমি জানি কিন্তু আমাকে তো বাঁচিতে হইবে?" আচ্ছা, পার যদি বাঁচো।

দেবকী ও বসুদেবের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ আর কেহ নাই। তাহারা স্বপ্নেও কখন শত্রুর অনিষ্ট চিন্তা করেন না। তাহারা সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তায় বিহ্বল, বিশ্বকল্যাণ ব্যতীত তাঁহাদের আকাঙ্খার দ্বিতীয় বস্তু নাই। তাঁহাদের হস্তপদ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া কংস তাঁহাদের দুই জনকেই অন্ধকারময় কারাগারের কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। "হায় কংস! কি করিতেছ, উঁহারা পরম সাধু ইহা কি তুমি জান না?" কংস বলিল "উঁহারা সাধু এবং নিরপরাধ তাহাতো বেশ ভাল করিয়াই জানি, কিন্তু আমাকে তো বাঁচিতে হইবে।" আচ্ছা বাপু, পার যদি বাঁচো!

এই কংস। সে এই দেহ লইয়া বাঁচিতে চায়। কেবল দেবকী বসুদেবের সন্তান নয়, রাজ্যের যত ছেলে কাহারও নিস্তার নাই। পিতা কাঁদিতেছে, মাতা কাঁদিতেছে, গ্রামে গ্রামে—ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে। নিরপরাধ শিশুগণকে ছলে বলে কৌশলে বিনাশ করিতেছে। কত পিতা মাতার নয়নের তারা, কত বংশের একমাত্র প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কেন? কংসকে বাঁচিতে হইবে। ইহারই নাম কংস।

রাজ্যের নিরপরাধ শিশুগণকে হত্যা করিয়াই কংস প্রতিনিবৃত্ত হইল না। যাহারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের উপরও অত্যাচার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, গো, তপস্যা, যজ্ঞ, সকলেরই উপর সন্দেহ। দয়ালু, পরোপকারী, সত্যবাদী, ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ মনুষ্যের নিস্তার নাই, এই কংসের স্বভাব।

কংস বাঁচিতে চায়। তাহাতে আপত্তি নাই, সকলেরই বাঁচিতে চাওয়া উচিত। কিন্তু দেহাত্মবাদী, ইন্দ্রিয় সর্ব্বস্ব কংস এই দেহ লইয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগেরজন্য বাঁচিতে চায়। এই ইচ্ছা পূরণের জন্য সে এক দিকে আর সমগ্র জগত এক দিকে। কিন্তু তাহাতে তাহার দৃক্‌পাত নাই। ইহাই কংসের তত্ত্ব।

মরণকে স্বীকার করিয়া বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিবে যে সে-ই অমৃতলাভ করিবে। সে-ই লীলা দর্শন করিবে, কিন্তু কংস বৈরাগ্য বোঝে না। আজ যদি কংসের কোন অনুচর আমাদের এই ভারতবর্ষে লোক শিক্ষকের আসনে বসিতে পারিত তাহা হইলে সে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিত যে, বৈরাগ্যের সাধনা করিয়াই ভারতের এই দুর্দ্দশা। অতএব বৈরাগ্য সাধন দেশ হইতে উঠাইয়া দাও। দেশের লোককে ভোগ পরায়ণতায় দীক্ষিতকর। আজ যদি কংসের কোন অনুচর আমাদের দেশে দার্শনিক পণ্ডিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তিনি যজ্ঞ, তপস্যাদি অনুষ্ঠানগুলি লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে নিষেধ করিতেন। আজ যদি কোন কংসের অনুচর আমাদের দেশে মাসিক কাগজের কর্ত্তা হইয়া আসিত তাহা হইলে অবতার বাদ যে মিথ্যা—অসাধারণ মানুষ বলিয়া যে কোন জিনিষ নাই, আমাদের মত সাধারণ মানুষেই সমস্ত ব্যাপার চালাইতেছে ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিত। প্রকৃত কথা এই, কংস তিনটী জিনিয বুঝিত না। প্রথমতঃ সে বুঝিতনা যে আমার যাহা ভাললাগে তাহাই অনুবর্ত্তন করিলে চলিবে না বিবেক ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মন জয় করা আবশ্যক নতুবা সত্যের সহিত পরিচয় হইবে না। কংসকে কেহ মূর্খ বিবেচনা করিবেন না। কংস দেবকী ও বসুদেবের সন্তানগুলি একে একে বিনাশ করিয়া শেষে তাঁহাদের বেশ দার্শনিক পণ্ডিতের মত এক বক্তৃতা শুনাইয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও দেহের ভোগেরজন্য উন্মত্ত কংস—কিন্তু সে কথা বলে দার্শনিক পণ্ডিতের মত।

দ্বিতীয়তঃ কংস বোঝে না যে, এই জগৎ কেবল আমাদের মত মানুষের খেয়ালে দ্বারাই চলে না। দেবতা সত্য, ঋষি সত্য, পিতৃলোক সত্য। তাহাদের একটা শাসন আছে। যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্ম ব্রত তপস্যা প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি এই দেব শাসনের আনুকূল্য করিবার জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই দেব শাসনের বিরুদ্ধে যাইবার কাহারও শক্তি নাই। কারণ এই দেশ শাসন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবের আধ্যাত্মিক ক্রম বিকাশ এই শাসনের অনুবর্ত্তনের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ইহাই সনাতন ব্যবস্থা। প্রত্যক্ষবাদী বা জড়বাদী মানুষ অহঙ্কারের দ্বারা চালিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহে কিন্তু দাঁড়াইতে পারে না।

তৃতীয় কথা, ভগবৎশক্তির বিশেষ আবির্ভাব ইহাও কংস বোঝে না। কংসের চরিত্রে এই তিনটা অভাব। ১। বৈরাগ্য ২। অবতার বা ভগবদাবির্ভাব ৩। দেবশাসন বা যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্ম প্রভৃতির উপযোগিতা। কংস বাঁচিতে চায়, দেহ ও ইন্দ্রিয় লইয়া, কংস জয়ী হইতে চায় বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া।

ভাগবত পাঠে জানা যায় বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ বৃন্দাবনের অন্তরায়, তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয় লক্ষণটী আছে কিন্তু প্রথম দুইটী নাই। আর দেবগণের মধ্যে কেবল বৈরাগ্য নাই অপর দুইটী আছে একথা আমরা পরে আলোচনার চেষ্টা করিব।

কংসের একটা পরীক্ষা হইয়াছিল। দৈববাণীই সেই পরীক্ষা। আমরা বলিয়াছি কংস সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সেই পরীক্ষাটী কি একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা যাউক।

আমি আর আনন্দ এই দুইটী জিনিষ আছে। প্রত্যেক মানুষের বা প্রত্যেক সাধকের নিকট পুনঃ পুনঃ একটী প্রশ্ন আসিয়া উদিত হয়। প্রশ্নটী এই— আনন্দে আমি না আমাতে আনন্দ, কাহার জন্য কে? আমার জন্য আনন্দ না আনন্দের জন্য আমি? যে বলিবে আমাতে আনন্দ বা আমার জন্যই আনন্দ সে যাইবে অহঙ্কারে বা কংসপুরে। যে বলিবে আনন্দের জন্য আমি বা আনন্দে আমি সে যাইবে প্রেমে বা বৃন্দাবনে। কংসকে যখন দৈববাণী বলিল যে, কংস তুই মরিবি, কংস তখন বিবাহের শোভাযাত্রায় অন্য সকলের সঙ্গে মিশিয়া অর্থাৎ আপনাকে ভুলিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছিল। কিন্তু দৈববাণী শুনিবামাত্র কংস ভাবিল আমি মরিব। তবে আনন্দ থাকিবে কোথায়? এই চিন্তাতেই কংস পরাস্ত হইল। যদি সেদিন বলিতে পারিত আমিতো মরিতেই আসিয়াছি! একথা বলিয়া ভয় দেখাইতেছ কেন? আমি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই আনন্দ জয় যুক্ত হউক তাহা হইলে কংস জয় যুক্ত হইত।

এইবার কংস বেচারার অদৃষ্টের কথা ভাবুন। আনন্দ আসিলেন তিনি বৃন্দাবনে নন্দের নন্দন। চেতন অচেতন পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কেহই বাদ যায় নাই সকলেই অমৃত লাভ করিল কিন্তু কংসের অদৃষ্টে লাভ হইল কি? মৃত্যু। আমরা যেন কংসের হস্তে পরিত্রাণ পাই। আমরা যে আনন্দের জন্য তাহা যেন বুঝিতে পারি। আনন্দ আমাদের নয় আমরা আনন্দের এইটুকু যেন বুঝিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, লিখিত।)

শ্যামসুন্দরের বিশ্ববিমোহন বংশীরবের অত্যদ্ভুত শক্তি মাধুরির কথা সকলেই বলিয়া থাকেন। সকলেই বলেন শ্রীকৃষ্ণের বংশীনিনাদে চরাচর মুগ্ধ। "কৃষ্ণ কথা"র কবি বাঁশরীর গুণ গাহিয়াছিলেন—

কৃষ্ণের বাঁশরী রবে, কে আর ঘরেতে রবে,
বালবৃদ্ধ সবাই অজ্ঞান।
তুচ্ছ করি গৃহকাজ, কুলবালা পথ মাঝ
করে নেত্রে কৃষ্ণরূপ পান॥
শুনিয়া বংশীর স্বর, বনভূমি নিরুত্তর,
তরু লতা শুনে একমনে।
বিহঙ্গ নীরব রহে, যমুনা উজান বহে,
কেবা মুগ্ধ নয় ত্রিভুবনে॥
মধুর মুরলী তান, স্বরার মজায় প্রাণ
মৃগগণ নিস্পন্দ নিশ্চল।
বাঁশরীর স্বরালাপে, প্রেমেতে কন্দর কাঁপে,
চরাচর প্রেমে ঢলঢল॥
ভুজঙ্গ শার্দ্দুল হরি, হিংসাভাব পরিহরি,
কৃষ্ণরূপ গুণে মুগ্ধ হয়।
রাখাল বালকে হাসে, জগত আনন্দে ভাসে,
ভাবে গলে ভাবুক হৃদয়॥

আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, কিন্তু বুঝিলাম না "মধুর মুরলী তানে" অদ্যাপি বিশ্ব বিমুগ্ধ হইতেছে। কিম্বা ঐ ত্রিদিব বাঞ্ছিত বংশী এক্ষণে নীরব। জ্ঞানীরা বলেন শ্যামের বংশী কখন নীরব নহে—উহা প্রতিনিয়ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিনাদিত হইতেছে। দ্বাপর যুগের শেষাংশে শ্যামসুন্দরের প্রকট লীলায় যে বংশী বৃন্দাবনের বনভূমি মুখরিত করিয়াছিল—যমুনা পুলিনে, নিস্তব্ধ নিশীথে যে বংশীর মধুর আলাপ ব্রজবালাকুলকে আকুল করিয়াছিল, সেই বংশী, সেই মোহন নিনাদ,

"যাহা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে" তাহা নাকি অদ্যাপি শ্রুত হয়। শ্যামের বাঁশী যদি অদ্যাপি বাজে তবে আমি তাহা শুনিতে পাইনা কেন? আমার কর্ণ কি তবে বধির হইয়াছে? শ্যামসুন্দরের মোহন বংশীধ্বনি শুনিবার পবিত্র কর্ণ আমার অদ্যাপি বিকশিত হয় নাই। শ্রীভগবানের দিব্যরাগ দর্শন করিতে হইলে যেমন দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন, শ্যামের বাঁশী শ্রবণ করিতেও কি সেইরূপ দিব্যকর্ণের প্রয়োজন? প্রয়োজন নিশ্চয়ই। প্রেম সিদ্ধ না হইলে শ্যামের বাঁশী শুনা যায় না। তাই কৃষ্ণকথা লেখক "রাস-লীলা" প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

এতক্ষণে রাস-রসে মজিল মাধব।
গোপীগণ কৃষ্ণে হেরি করে জয়রব॥
গোপী নাচে কৃষ্ণ নাচে হাত ধরাধরি।
বসিল আনন্দ-মেলা হের প্রাণভরি॥

*　　**　　*

কৃষ্ণের মোহন বাঁশী বাজে নৃত্যসঙ্গে।
মদন গোপাল নাচে দেখ কত রঙ্গে॥
চরাচর সমুদায় রাসে মুগ্ধ হয়।
অন্তরীক্ষ থেকে দেখে দেবতা নিচয়॥
গম্ভীর প্রণবধ্বনি উঠয়ে ভুবনে।
বাজে তাহা গৃহে গৃহে মধুর নিক্কণে॥
প্রণবের তালে নাচে যত চন্দ্র তারা।
সর্ব্বত্র হেরেন রাস প্রেম সিদ্ধ যাঁরা॥

নিত্য-রাস মহারাস হয় বিশ্বমাঝে।
প্রকটিত আছে তত্ত্ব ভকত-সমাজে॥
প্রণব শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজে নিশিদিন।
প্রেমিক ভকত শুনে হ'য়ে কামহীন॥
রাসের স্বর্গীয় স্বাদ যেই নরে পায়।
ঘৃণিত ইন্দ্রিয়-সুখ কভু নাহি চায়॥
দিবানিশি শুনে কাণে মুরলীর তান।
দিব্যরসে সদা ভোর হয় তার প্রাণ॥
বিশ্ব-প্রেমে হয় তার হৃদয়-পূরিত।
শত্রু-মিত্র সবে হয় সে প্রেম ক্ষরিত॥
থাকুক তির্য্যক প্রাণী কিবা তরুলতা।
সর্ব্বভূতে হয় তার প্রেমের সমতা॥

তবেই বুঝা গেল প্রেম-সিদ্ধ না হইলে, প্রেমে পাগল না হইলে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শুনা যায় না, আর যে ভাগ্যবান ব্যক্তি সে অমর বাঞ্ছিত রব শুনিতে পান, তিনি বিশ্ব প্রেমে বিভোর না হইয়াও থাকিতে পারেন না। তবে মাদৃশ হীনমতি সংসার সর্ব্বস্ব, যশঃ মান ধন লিপ্সা বিতাড়িত ঈর্ষাদ্বেষ হিংসা ক্রোধ পরিচালিত, স্ত্রীপুত্র পরিজন পরিবৃত বিবিধ কুভাবে ও কুকার্য্য কলুষিত নরাধমের আর শ্রীশ্যামসুন্দরের বংশীরব শুনিতে পাইয়া চরিতার্থ হইবার আশা কোথায়? কিন্তু করুণা-নিধান শ্রীভগবানের করুণার অবধি নাই। তিনি মাদৃশ দীনহীন ব্যক্তিগণের নিমিত্ত হরিনাম সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংকীর্ত্তন-রবের প্রভাবও বড় কম নহে। শান্তিপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের শুভাগমন প্রসঙ্গে লেখক গাহিয়াছেন :—

ডাকিল প্রেমের বান ভক্ত সব ভাসি যান
কেহ স্থির রহিবারে নারে।
মোহান্ধ বিষয়ী যত প্রেমে নাচে গায় কত
তরঙ্গ লাগিল প্রতিদ্বারে॥

ঘাটে বাটে উঠে রোল "হরিবোল" "হরিবোল"
নরনারী সবে নাম গায়।
কুলবালা ত্যজে কাজ ভুলিয়ে সহজ লাজ
পথ-মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়॥

শুনিয়া কীর্ত্তন রব স্তম্ভিত শ্বাপদ সব
চেয়ে দেখে কোথায় শ্রীপতি।
তরুলতা প্রেম ভরে শিহরিয়া নৃত্য করে
প্রেমেতে উথলে ভাগীরথী॥

শ্রীচরণ পরশনে ধরিত্রী আনন্দ মনে
কম্পচ্ছলে প্রকাশে উচ্ছ্বাস।
উচ্চরবে প্রতিধ্বনি ঘন ঘন করে ধ্বনি
নাম সত্য আর সব পাশ॥

তবেই বুঝিলাম মাদৃশ ত্রিতাপ-দগ্ধ মোহাচ্ছন্ন জীবগণের পক্ষে হরিনাম সংকীর্ত্তনই ভব-ব্যাধির মহৌষধ। তাই "দেবর্ষির আহ্বান" প্রসঙ্গে লেখক লিখিয়াছেন—

সংসার বালুকা তাপ পুড়ায় তোদের বাপ
আর কত সহিবি রে জ্বালা।
শ্রীহরি চরণ তলে ব'সে সবে কুতূহলে
জপ মনে হরিনাম মালা॥

ভঙ্গুর দেহের তরে কেবা এত যত্ন করে
কদিন রহিবি হেথা বাপ।
শেষের সেদিন এলে দারা-পুত্রে ফেলে ঠেলে
কাঁদিবি স্মরিয়া নিজ পাপ॥

শ্রীনাথে ধরিয়া মাথে ধীরে চল মোর সাথে
কেনে বল হও দিশাহারা।
রাধাকৃষ্ণ বল মুখে থাকহ পরম সুখে
জপি নাম পিয় সুধা ধারা॥
গোপাল গোবিন্দ হরি ওই নাম সদা স্মরি
তর জীব এ ভব সাগর।
দিন ত ফুরায়ে গেল শমন নিকটে এল
প্রেমে ভজ রসিক নাগর॥
ইতর রসেতে মাতি ভুলে আছ দিবারাতি
নাহি ভাব আপন পতন।
থাকিতে সময় এবে কর জীব কুর সবে
ভক্তি ধনে লভিতে যতন।
শ্রীরাধা গোবিন্দ নাম কর জীব অবিরাম
এমত অমৃত কোথা বল।
মুকুন্দ মুরারি রাম কেশব কংসারি শ্যাম
কৃষ্ণনাম শেষের সম্বল॥

* * * *

কেন তবে বৃথা ভাবে ত্যজ নিজ কুস্বভাব
মনে প্রাণে কর হরিনাম।
গোপাল গোবিন্দ ব'লে ডঙ্কা মেরে এস চ'লে
হরি পদে লভরে বিশ্রাম॥
বল বল হরিবোল ঘুচিবে সকল গোল
ভব-জ্বালা যাবে রে জুড়ায়ে।
শান্তি তরুতলে ব'স পান কর প্রেমরস।
গাও নাম মিলে ভায়ে ভায়ে॥
রাধাশ্যাম নটবর মোহন মুরলীধর
মদন গোপাল অভিরাম।
নারায়ণ জনার্দ্দন হৃষিকেশ নিরঞ্জন,
গাও সবে গাও অবিরাম॥

তবে আর পাপী জীবের ভয় কি ? শ্রীভগবানের নামগুণগান যে করে, এবং শ্রীভগবানের মধুর লীলা যে ব্যক্তি অনুধ্যান করে তাহার আর ভয় কোথায়। তাই লেখকের কথার উপসংহারে বলি—

গোবিন্দের সব লীলা , ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিলা,
পূরাবারে ভকত বাসনা।
যে জন প্রেমেতে মাতি চিন্তে লীলা দিবারাতি
সেই করে কৃষ্ণ উপাসনা॥

আনন্দ উল্লাস তব কৃষ্ণলাগি হ'ক সব
কৃষ্ণে স্মরি করহ সংসার।
জীবন কৃষ্ণের তবে এই সত্য যে বা ধরে
সেই হেসে হয় ভব-পার॥

ভোগ্যবস্তু আছে যত বাছি সব মনোমত
কৃষ্ণপদে কর নিবেদন।
জুড়াতে এ ভব-জ্বালা মনে প্রাণে ভজ কালা
সে বিনা কে ঘুচাবে বেদন॥

"জয় রাধাকৃষ্ণ জয় • জয় কৃষ্ণ দয়াময়
রাধারাণী হও গো সদয়।"
এইবলি ইষ্টধনে ডাক সদা মনে মনে
দিবে কৃষ্ণ চরণ অভয়॥

তবে সত্যই আর ভয় কি ? একবার মনঃ প্রাণ ভরিয়া শ্যামসুন্দরকে ডাকিতে পারিলেই হইল। তাই লেখক কৃষ্ণকথায় গাহিয়াছেন—

আস্বাদিতে রাসরস যদি কর আশ
শুদ্ধ কর চিত্ত তবে কাট মায়াপাশ॥
পবিত্র হৃদয়াসনে বসাও গোবিন্দে।
ভকতি করিয়া পূজ চরণার বৃন্দে।
মলিন কামনা যদি থাকে কভু মনে।
পাবেনা কখন জেন শ্রীমধুসূদনে॥

সরল বিশুদ্ধ মন কৃষ্ণ ভালবাসে।
যেখানে সারল্য তথা ভকতি বিকাশে॥
* * * * *
পবিত্র প্রেমের টানে চাহ যদি হরি।
এখনি মিলিবে কৃষ্ণ কহ সত্য করি॥

অধিক আর কি বলিব ?

যে জাতির যেবা কেহ ত্যজিয়া স্বজন স্নেহ
হরি প্রেমে ঢালে প্রাণ-মন
শুনহ বচন আশু রাধাভাব হয় প্রাপ্ত
প্রেমে হয় শ্রীরাধার জন ॥
শ্রীহরি প্রেমেতে যার নেত্রে বহে অশ্রুধার
তা'কে জেন রাধিকা-স্বরূপ
পুলক মুরছা ভ্রান্তি রাধিকার প্রেমকান্তি
যেবা ধরে সেই নবভূপ ॥

(কৃষ্ণকথা ১ম ভাগ)

যদি বল পুরুষ-দেহাভিমানী জীব কিরূপে আপনাকে স্ত্রীভাবাপন্ন মনে করিবে, তবে বলি—

দেহ সাথে আত্মা যথা আছে বিরাজিত।
ভক্তমনে কৃষ্ণ তথা সদা অবস্থিত ॥
ভকত গোপিকা এবা তুল্য ভিন্ন নয়।
প্রেম-ধামে লিঙ্গ ভেদ কভু নাহি রয় ॥
লালসা ত্যজিয়ে যেই ভাসে প্রেমরসে
নব-নারী তুল্য তার পবিত্র মানসে ॥

(কৃষ্ণকথা ২য় ভাগ ॥)

বস্তুতঃ প্রবল লালসাই কেবল স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ভেদরেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। যাহার মন হইতে এই লালসা চলিয়া গিয়াছে, বিশ্ব সংসারে তাঁহার আর স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই, তিনি শুদ্ধচিত্তে ও দিব্যনেত্রে সর্ব্বত্রই প্রেমলীলা পরিদর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। করুণা নিধান লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যিনি এই লীলা দর্শনের অধিকারী তাঁহার কর্ণে শ্যামের বাঁশরী নিয়তই ধ্বনিত হয়। আহা! শ্যামসুন্দরের সুমধুর বাঁশরীর মোহন নিনাদ কি কখন এই জীবাধমের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে ?

— —

"মা"

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট লিখিত)

কবি বলিয়াছেন—

"ত্রাসে, ক্ষোভে, শোকে, দুঃখে,
আগে নাম উঠে মুখে,
কিবা একাক্ষরী মহামন্ত্র মানব তারণ।

আশ্চর্য্যের বিষয়, পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বভাষায় এবং সর্ব্বজাতির ভিতরেই এই "মা" কথাটী "ম" অক্ষর দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ১৩৩০ শ্রাবণ "প্রবাসীর" ৫২৬ পৃঃ হইতে নিম্নলিখিত তালিকাটি উদ্ধৃত করিলাম।

বাংলা—মা
সংস্কৃত—মাতা

ভারতবর্ষ এবং এসিয়ার কতক অংশে মা, মাতারি, মাতা

পারস্য—মাদর
গ্রীক—মেটার
লাটীন—মাতের
ইটালীয়—মাদর
স্পেন—মাদ্র
ফরাসী—মেয়ার
ইংরাজী—মাদার
হলাণ্ড—মোরেড
আইসল্যাণ্ড—মোথের
ওয়েলস্—ম্যাম
আইরিস্—মাথেয়ার
বুলগেরিয়া—মাটি
পোলাণ্ড—মাট্‌কা
লিথুয়ানিয়া—মোটি
সুইজারল্যাণ্ড—মোডর
জার্ম্মান্—মুটের

— ——

পুরীধাম স্বর্গদ্বারে শ্রীচৈতন্য-মণ্ডলী

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট লিখিত)

"বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি" উৎকল ও কলিঙ্গ দেশে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া একখানি সংস্কৃত পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহা উড়িয়া অক্ষরে লিখিত। গ্রন্থের নাম "গঙ্গাবংশানুচরিত"। গ্রন্থখানি দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। সংস্কৃত ভাষানিবদ্ধ গদ্য পদ্যাত্মক চম্পূ কাব্য। গ্রন্থকারের নাম শ্রীবাসুদেব রথ সোমযাজী। ইনি রাজগুরু ছিলেন। গ্রন্থখানি উৎকল-রাজ পুরুষোত্তমের শাসন সময়ে লিখিত হইয়াছিল।

গোদাবরী নদীতীর নিবাসী শ্রীমাগধেন্দ্র রায় বিদ্যার্ণব নামক জনৈক স্তুতি-পাঠক (ব্রহ্মভট্ট) তদীয় প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লীলাবতী দেবীকে লইয়া শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গমনাগমনের পথের বর্ণনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার কাব্যচ্ছলে নানা ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক সমাচার উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকায় ৯১ পৃঃ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

উক্ত গ্রন্থের একস্থানে শ্রীচৈতন্য দেবের ভক্তমণ্ডলীর নামোল্লেখ থাকায়— সেইটীই আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

লীলাবতী দেবী ও বিদ্যার্ণব পোতারোহণে পুরীধামের স্বর্গদ্বার নামক বেলা-ভূমিতে উপনীত হইয়া সমুদ্র তটের মহাশ্মশানে বিস্তর প্রস্তর চৈত্য দেখিতে পান। এবং ঐ সকল চৈত্যের অনতিদূরে শ্মশানভূমির সান্নিধ্যে 'শ্রীচৈতন্যমণ্ডলী" নামক "পরম ভাগবতগণের" আবাস দেখিয়া লীলাবতী দেবী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই সকল পরম ভাগবতগণ পুরী ছাড়িয়া শ্মশানবাসী কেন হইয়াছেন ?"

তদুত্তরে মাগধেন্দ্র বলিলেন—

"লোকানামভিযোগিনাং সুরপুরাদুচ্চৈঃ পদারোহণে
তৎকার্য্যোপায়বলম্বনায় কিমপি প্রায়ো ন সংপশ্যতা,
[illegible] দৈন্যাবশীকৃতেন বিধিনা স্বর্দ্বার মারোপি কিং
[illegible]চৈতন্য-মতানুসারি-সুজনা শ্রেণীতি নিঃশ্রেণিকা।"

অর্থাৎ মাধবেন্দ্র বলিতেছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের মতাবলম্বী সাধুমহাত্মগণই সেই পরম ধামে যাইবার একমাত্র সোপান।

উক্ত গ্রন্থে অন্য একস্থানে উৎকলরাজ অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক ১১১৯ শকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এবং প্রথম নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক কোনার্কের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। লিখিত আছে—

অঙ্কক্ষোণী—শশাঙ্কেন্দু সম্মিতে শক বৎসরে।
অনঙ্গভীম দেবেন প্রাসাদঃ শ্রীপতে কৃতঃ॥

প্রথমোক্ত শ্লোকটির সঠিক তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না, সহৃদয় ভক্তির পাঠকগণের মধ্যে কেহ সমীচিন তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা জানাইলে বাধিত হইব।

মধুপুর গুরুদরবারে সাতদিন

বহুজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি না থাকিলে সাধু দর্শন হয় না। জানি না কোন্ সুকৃতিবলে এবার এক মহাত্মার সঙ্গে সাতদিন বাস করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। বিগত ৺দুর্গাপূজার সময় কয়দিনের জন্য বাহিরে যাইব এইরূপ সঙ্কল্প মনে মনে করিয়াছিলাম। যেরূপ কাজের ঝঞ্চাট তাহাতে যাওয়া ঘটে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সঙ্কল্প কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই। হঠাৎ মধুপুর হইতে এক ধর্ম্মসভার নিমন্ত্রণ পাইলাম। রথ দেখা কলা বেচা দুইই হইবে ভাবিয়া নিমন্ত্রণেই যাওয়া স্থির করিলাম। ৺পূজার পর ত্রয়োদশীতে যাত্রা করিব এইরূপই স্থির হইল। পুনরায় সংবাদ আসিল একাদশীর দিন রওনা হওয়া চাই। আমার কোনও আপত্তি রহিল না। সেই ভাবেই কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিয়া সেখানে সংবাদ দেওয়া হইল।

এদিকে ষষ্ঠীর দিন জ্বর হইল, সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিন দিন জ্বর ছাড়িল না, দশমীর দিন সকালে জ্বর ছাড়িল কিন্তু পুনরায় বেলা ২টার সময় জ্বর আসিল। কাজেই এ অবস্থায় যাওয়া কোন মতেই হইতে পারে না ভাবিয়া যিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন স্থির ছিল সেই বন্ধুটীর নিকট সংবাদ দিলাম যে, আমার যাওয়া হইবে না। জানিনা মঙ্গলময়ের কি ইচ্ছা, দশমীর দিন রাত্র ১১টার মধ্যেই জ্বর ছাড়িয়া গেল। সমস্ত রাত্রি কেবল এক চিন্তা "যাইতে পারিলাম না কি হইবে।" একাদশীর দিন প্রাতে উঠিয়াই ভাবিলাম সেই বন্ধুর বাড়ী চলিয়া যাই; কারণ তিনি হয়ত আমার যাওয়া হইবে না শুনিয়া নিজের যাওয়াও স্থগিত রাখিয়াছেন।

কাজেই তাড়াতাড়ি কাপড় জামা লইয়া রওনা হইব এমন সময় দেখি সেই বন্ধুটী আসিয়া উপস্থিত। দুইজনে আনন্দমনে রওনা হইলাম। বন্ধুটীর বাড়ী হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে, নাম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। ইনি হাওড়া কোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল।

বন্ধুবরের আগ্রহে বেলা ৬টা পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীতেই থাকিলাম শেষে, ৫টার গাড়ীতে মধুপুর রওনা হইলাম। গাড়ীতে বসিবার স্থান ছিল না, তথাপি দু'চারজন রসিক বান্ধব জুটিয়া যাওয়ায় পথের ক্লেশ মোটেই অনুভব হইল না। তবে মধ্যে মধ্যে সুরেনবাবুর "কেমন? জ্বর হয় নাই ত? শরীর কেমন? ভাল আছেন ত?" ইত্যাদি প্রশ্নে যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। শেষে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে বলিলাম যে, আপনি ওরূপ তাগাদা করিয়া রসভঙ্গ করিবেন না। রাত্র সাড়ে দশটার সময় মধুপুরে নামিলাম পূর্ব্বের বন্দোবস্তমত ষ্টেশনে আলো লইয়া লোক ছিল, আমাদের গন্তব্যস্থান ষ্টেসনের অতি নিকট কাজেই অতি শীঘ্রই সেখানে পৌছিলাম।

সেখানে পৌছিয়া বুঝিলাম এটী একটী দেবমন্দির এবং উৎসবের জন্য বিস্তীর্ণ মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে। একটি লোককে প্রথমেই মন্দিরের দরোজায় দেখিলাম। কি জানি কেন বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার চরণে আপনা আপনিই মস্তক নত হইল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতেছি কিন্তু তিনি কিছুতেই দিলেন না, অধিকন্তু দুটী হাত ধরিয়া অধমকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। সেই মহাত্মার স্পর্শ পাইয়া আমার রোগ জীর্ণ দেহে যেন কি এক নব বলের সঞ্চার হইল। রাত্র অধিক হয় বলিয়া আমাদিগের বিশ্রাম জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তিনিও বিশ্রাম করিতে গেলেন।

রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হইল। প্রাতে কাঁশর ঘণ্টার শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। শুনিলাম, এই মঠের নিয়ম, যিনি সকলের পূর্ব্বে উঠিবেন তিনি ঐ ভাবে কাঁশর ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে জাগাইয়া দিবেন। যথারিতি প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে মঠের চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম। যত দেখি ততই যেন প্রাণে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি। সন্ধানে জানিলাম পূর্ব্ববঙ্গের কোনও ব্রাহ্মণ বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়া এই স্থানে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ১৩২৭ সালে চৈত্রসংক্রান্তিতে শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী নামে মাতা অন্নপূর্ণা ও শ্রীশ্রীযোগেশ্বর নামে বাবা বিশ্বনাথকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মঠের নাম দিয়াছেন শ্রীশ্রীগুরুদরবার।

ক্রমে ক্রমে মঠের সমস্ত ব্যাপারই শুনিলাম, যত শুনি ততই শুনিবার আগ্রহ

বৃদ্ধি পায়। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। সকল বিষয় প্রকাশ করা মঠাধ্যক্ষের ইচ্ছা নাই বলিয়া বিশেষ আগ্রহ থাকাসত্ত্বেও প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আজ হইতেই উৎসব আরম্ভ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও তিন দিন ১৩ই ১৪ই ও ১৫ই আশ্বিন যথারীতি উৎসব হইল। উৎসব উপলক্ষে শাস্ত্র পাঠ, ব্যাখ্যা, সঙ্গীত ও বক্তৃতা হইয়া থাকে এবং শেষের দিন অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী অন্নপূর্ণামাতার অন্নকুট যাত্রা হয়। এবারেও তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখিলাম না। এবার বক্তা ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী। ইনি ঢাকা পারুলিয়া গ্রামে শান্তিমঠ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকানদীর পার হরিসভা উপলক্ষে ইহার সহিত অল্প পরিচয়ের সুযোগ পাইয়াছিলাম। আহা! কি সৌম্যমূর্ত্তি আর কি সুন্দর কথাবার্ত্তা।

স্বামীজী তিন দিনই বক্তৃতা করিলেন। তিনদিন যথাক্রমে "সনাতন ধর্ম্ম" "ভক্তি" ও "কর্ম্মযোগ" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। স্বামীজীর গভীর চিন্তা-প্রসূত শাস্ত্রসঙ্গত অথচ সরল বক্তৃতায় সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। অন্নকুটের পরদিন কাঙ্গালী ভোজন হয়। এবার কাঙ্গালী ভোজনের ভার লইয়াছিলেন কলিকাতার স্বনামধন্য রাজা ৺দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, কুমার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়। এই উৎসব উপলক্ষে বহুলোক সমাগম হয়। দেখিয়া মনে হয় উৎসবের ফলে মধুপুরস্থ বহু ব্যক্তির প্রাণে ধর্ম্মভাব বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

এইবার মঠাধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী অন্নপূর্ণা মাতার বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু সেই অপরূপ রূপ লাবণ্যময়ী স্বর্ণকান্তি মায়ের মূর্ত্তিখানি মনে পড়িলে আর লেখনী চলে না, মনে হয় সব ছাড়িয়া মায়ের পানে চাহিয়া থাকি। আহা! হা! কি রূপ, কি গঠনমাধুরী আর কিবা তার বেশ বিন্যাস। যে দিকে চাই সেই দিকেই যেন কেমন এক মহা আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া পারি না। সামান্য শক্তিতে আমি আর কত বর্ণনা করিব। আমার মনে হয় সকলেই একবার গিয়া সেই ভুবন মোহিনী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া আসুন।

মঠের সংলগ্ন কয়েক বিঘা খালি জমি সম্প্রতি ক্রয় করা হইয়াছে। মঠস্থাপয়িতার একান্ত ইচ্ছা সেখানে পঞ্চোপাসকের পাঁচটি পৃথক পৃথক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যথারীতি সেবার বন্দোবস্ত করেন। এবং উহার সঙ্গেই একটি অনাথ আশ্রম ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি চতুষ্পাঠি স্থাপন করেন। যে ভাবে এই

সকল কার্য্যের নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে দেখিলাম, তাহা যদি সম্পন্ন হয় তবে প্রকৃতই একটী অপূর্ব্ব অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইল বলিতে হইবে। উদ্যোগকারী সেরূপ সম্পত্তিশালী নয় তথাপি তিনি যে ভাব হৃদয়ে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন তাহাতে আমাদের মনে হয় দেশবাসী সকলে একত্র হইয়া তাঁহার সাহায্য করুন। আর এক কথা, একার্য্যে তাঁহার নিজ স্বার্থ কিছুমাত্র নাই, এইটিই বিশেষ ভাবিবার বিষয়।

ইচ্ছা ছিল আরও কয়েকদিন মহাপুরুষের সঙ্গে থাকিয়া এই সকল সদনুষ্ঠানের আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইব কিন্তু সংসার কূপ নিমগ্ন জীব আমি। আমার অতটা সৌভাগ্য হইবে কি করিয়া, তাই পারিবারিক অসুস্থতার সংবাদে চলিয়া আসিয়া আবার সংসারকূপে ঢুকিতে হইল।

চলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু কয়েকটি জিনিষ যাহা সেখান হইতে লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা বড়ই দুর্লভ। সর্ব্বদার জন্য যিনি মঠের পরিচালন ভার লইয়া থাকেন, সেই সৌম্যমূর্ত্তি আকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ নাগ, যাঁহাকে প্রথম দিন দেখিয়াই দাদা না বলিয়া থাকিতে পারি নাই, তাঁহার খোলা প্রাণের খোলা ব্যবহার এবং একাই যেন একশত হইয়া সকল কার্য্যে যোগদান, বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। তারপর উৎসব উপলক্ষে সমাগত যে সকল ভক্তমণ্ডলী আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে যে কয়জন আমাদের পণ্ডিতকেও একেবারে কিনিয়া ফেলিয়াছেন সেই সকল ভক্তগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী, ইনি একজন মুন্সেফ, কিন্তু চালচলন কথাবার্ত্তায় কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম যে, ইনি একজন অতবড় পদস্থ ব্যক্তি। ইহার সরল ব্যবহার জীবনে ভুলিবার নয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ইহার পরিচয় তো প্রথমেই দিয়াছি। অতবড় একজন উকীল তিনি যেন কিছু জানেনই না। তারপর শ্রীযুক্ত সুচারুচন্দ্র ঘোষাল, ইনি যদিও ফটো তুলিয়া সকলকার চিত্র নিজ ক্যামেরাতে ধরিয়া রাখেন কিন্তু ইহার সরল মধুর ব্যবহারে বিনা ক্যামেরাতেই আমি উহার চিত্রটী হৃদয়ে ধরিয়া লইতে পারিয়াছি। জানি না অপরের মত কি, আমার কিন্তু সত্য সত্য তাই হইয়াছে। বাড়ীতে আসিয়াও সুচারুবাবুর সুচারু ব্যবহার ভুলিতে পারিতেছি না। তারপর ভবতারণ বাবু, অমর বাবু কার কথা রাখিয়া কার কথা বলিব।

জানি না কেন সকলে মিলিয়া আমার মত দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের হৃদয়টী লুঠ করিয়া লইলেন। আসিবার দিন সুরেশবাবুর (ইনি চিন্তাহরণবাবুর ভাগিনা) কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া মনে হইয়াছিল এই সব লোক ত এক একজনেই কত অঘটন

ঘটাইতে পারে 'তা যখন এই সব একত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন তখন আর ভাবনা কি ?

অধম আমি, বহুদিন যাবৎ নানাস্থানে যাতায়াত করিতেছি, বহু লোকের সঙ্গে মিশিবার সৌভাগ্যও পাইয়াছি কিন্তু এবার এই মধুপুর শ্রীশ্রীগুরুদরবারে আসিয়া সাতদিন যেভাবে দিবারাত্র আনন্দে কাটাইয়াছি জানিনা জীবনে আর সেরূপ শুভসংযোগ কখনও ঘটিবে কি না। মা যোগেশ্বরী মঠ প্রতিষ্ঠাত্রীর মনোবাসনা পূর্ণ করুন, আমার এইমাত্রই প্রার্থনা।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট লিখিত)

নবদ্বীপ। বড়ই সুন্দর প্রশ্ন হইয়াছে। এতক্ষণ যে আমার সহিতবাদানুবাদ হইতেছিল, তাহার শেষ মীমাংসার কথা উপস্থিত হইয়াছে। ভগবানকে ভোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য এই, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি বালক সদৃশ—বস্তুর ভালমন্দ বোধ নাই। কাজেই আমাদের বুদ্ধি অনুসারে বস্তুর বিচার না করিয়া যাহা কিছু উপস্থিত হয় প্রভুর করে সমর্পণ করিয়া দেই, তিনি উহার হেয় অংশগুলি বাদ দিয়া উপাদেয় অংশ আমাদিগকে প্রদান করেন। যেমন কোনও বালক একটি সুপক্ক বেল ফল প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত ভাবে পিতা বা মাতার নিকট লইয়া গেল। কৌশলী পিতামাতা উক্ত ফলের আবরণ মোচন করতঃ উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া বালককে খাইতে দিলেন। বালক অতি পরিতৃপ্তভাবে উক্ত ফল খাইয়া আনন্দিত ও পরিতুষ্ট হইল। যে বালক পিতামাতাকে না জানাইয়া নিজের স্বাধীনতা অনুসারে উক্ত ফল খাইতে গেল, সে হয়ত বেলের খোসা চিবাইয়া নীরস বোধে দূরে নিক্ষেপ করিল। তিনি অপ্রাকৃত নিত্য চিন্ময় সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার কৃপা প্রদত্ত বস্তু একবার মাত্র তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া তাহার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। তৎপর তিনি যেরূপ ভাবেই হউক সেই বস্তুর প্রাকৃতত্ব নষ্ট করিয়া অপ্রাকৃত গুণ সঞ্চার করতঃ আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। খাদ্যবস্তুর কথা ত দূরে, আমরা সময়ে সময়ে বিষ পর্য্যন্ত তাঁহার হাতে

দিয়া থাকি কিন্তু এমন করুণাময় তিনি যে, সেই বিষকে অমৃত করিয়া আবার তিনি আমাদিগের হস্তে উহা অর্পণ করেন।

প্রহ্লাদের পিতা তাঁহাকে বিষমাখা অন্ন খাইতে দিল। প্রহ্লাদ যেমন ভগবানকে অর্পণ করিল অমনি সেই বিষ অমৃতে পরিণত হইল। এইরূপ মীরা-বাইর প্রাণ বিনাস মানসে রাণাকুম্ভ অতিশয় তীব্র বিষধর কালসর্প শালগ্রাম নাম করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মীরা সরল অন্তঃকরণে পেটরা খুলিয়া দেখে অপূর্ব্ব শালগ্রাম শিলা। দেখ, মীরা কিন্তু জানেনই না যে, পেটরার কি বস্তু আছে। কেবল রাণা যে শালগ্রাম নাম করিয়াছিল, পরম দয়াল ভগবান সেই নাম প্রভাবেই পেটরা হইতে কাল সর্প দূর করতঃ নিজে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। হায় রে জীব, এমন দয়াল প্রভুও ভজিতে চাও না।

আনন্দ। আচ্ছা, তোমরা যখন যাহা কর, সকলই কি তাঁহাকে জানাইয়া কর?

নবদ্বীপ। করিবার চেষ্টা করি। আচ্ছা ভেবে দেখ, তুমি কোনও একটি কার্য্য অতি গোপনে সম্পাদন করিতে গিয়াছ, কিন্তু একজন তাহা দেখিতে পাইল, সেই সময় তোমার কি করা উচিত?

আনন্দ। কি আর করিব? যখন সে জানিতেই পারিল তখন তাঁহাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলাই উচিত।

নবদ্বীপ। তবে দেখ, ভগবান বিশ্বতশ্চক্ষু, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বনিয়ন্তা। তুমি যতই গোপনে কার্য্য করিতে যাও না কেন, তিনি তোমার নিকটে থাকিয়া হাসিতেছেন। তোমার জানিবার পূর্ব্বেই তিনি জানিয়াছেন। তুমি যাইবার পূর্ব্বেই তিনি গমন করিয়াছেন। তুমি না দেখিতেই তিনি দেখিয়াছেন। বল দেখি যিনি সমস্ত জানিলেন, তাঁহার নিকট গোপন করা মূর্খতা নয় কি?

আনন্দ। তিনি যে সমস্ত জানিলেন, আমি কি করিয়া বুঝিব?

নবদ্বীপ। এ কথা অপরের বুঝাইয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। আচ্ছা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি যখন কোনও অন্যায় কার্য্য বা মিথ্যা মোকর্দ্দমা করিতে যাও, তখন তোমার প্রাণের মধ্যে কোনও রূপ ভীতি বা সঙ্কোচ আসে না কি?

আনন্দ। সময় সময় আসে বটে; সে এক মিনিট আধ মিনিটের মধ্যে অমনি বিলীন হইয়া যায়।

নবদ্বীপ। এই যে আসা, ইহাই ভগবানের জানিবার পরিচয়। অর্থাৎ গোপনীয় কার্য্য যেমন কাহারও নিকট কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইলে মনের মধ্যে ভীতি

আসে, তেমনি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকিয়া অতি গোপনে গভীর রাত্রে গৃহাভ্যন্তরে পাপ কার্য্য করিতে গিয়া মনে ভীতির সঞ্চার হয় কেন? না সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্বচক্ষু ভগবানের গোচর হইয়াছে বলিয়া।

এইবার আনন্দবাবুর হৃদয়টা কি রকম হইয়া গেল। চক্ষুদুইটি আরক্তিম এবং ছল ছল। গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "দাদা? যে জন এইরূপভাবে অশেষ পাপের পাপী, প্রবঞ্চক, অসদাচারী, লম্পট তাহার কি কোন উপায় নাই? তাহার বোধহয় অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

নবদ্বীপ। ভাই, ভয় কি? পরম দয়াল অবতার। কলিযুগে যদি ঐরূপ বিচার করিয়া জীব উদ্ধার করিতে হইত তবে আর কলির জীবের গতি ছিল না। তাই দয়াল প্রভু কলিযুগের জন্য সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যে যতই কেন পাপ করিয়া থাকুক না, একবার হৃদয়ে অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া ব্যাকুল প্রাণে সরল ভাবে চরণে শরণ লইয়া কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, আবার যাহাতে সে পথে না যাইতে হয় তাহার জন্য প্রভুর চরণে জানাইলে তিনি কোলে তুলিয়া লইবেনই। ভগবান সব কার্য্য করিতে পারেন কেবল জীবকে ঘৃণা করিতে পারেন না। তিনি করুণাময়, যে যতই দুরাচারী হউক না কেন, তিনি আদর করিয়া কোলে নিবেনই।

এতক্ষণ আনন্দবাবু নীরবে নবদ্বীপ দাদার কথা শুনিতেছিলেন, আর চোখের জলে বুক ভাসাইতেছিলেন, এবার একেবারে অধৈর্য্যভাবে দাদার চরণতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মুখে কেবল এক বুলি "হায়! আমার কি হইবে? আমি যে অশেষ পাপের পাপী, আমাকে উদ্ধার করিবে কে? আমি যে জগাই মাধাই হইতেও দুরাচারী!"

এইরূপ আর্ত্তি দেখিয়া নবদ্বীপ দাদা আলিঙ্গনপূর্ব্বক নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিলে আনন্দবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "দাদা আমার উদ্ধারের কি উপায় হইবে? আপনি আমায় কৃপা করিয়া যখন চৈতন্য দিয়াছেন, তখন আবার যেন নরকে না পড়ি। আমাকে কিরূপ ভাবে চলিতে হইবে, কিরূপ কি করিতে হইবে আদেশ করুন।" তখন নবদ্বীপ দাদা বলিলেন, "দেখ, আমার যতদূর শক্তি আমি করিয়াছি, এখন আমার গুরুদেবের হাত। তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেইরূপই হইবে।"

ক্রমশঃ

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

প্রার্থনা

"অনন্তং তবমাহাত্ম্যং বিভূতিং চ দয়ানিধে।
লবমপ্যনুভূয়াস্মি বিমুগ্ধো ভবকর্ম্মসু॥"

হে দয়ানিধি ভগবন্! তোমার মহিমার সীমা নাই। তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী বিভূতির পরিচয় যে একবার পাইয়াছে, সে আর জীবনে কখনও কোন বিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারে না। সংসারে প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যেই তোমার অনন্ত মহিমা বিচিত্রভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীগুরু কৃপায় যখনই কিছুমাত্র অনুভবের সৌভাগ্য হয়, তখনই একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া যাই, আবার যখন দুর্দ্দৈববশে ভুলিয়া যাই, তখন অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাপ্রকার দুঃখ, নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকি।

সত্য কথা বলিতে কি, যখন প্রথম সংসারের বোঝা মাথার উপরে পড়িল —যখন সত্য সত্যই দেখিলাম, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলেই বোঝা বহিবার অসম্মতি জানাইয়া দূরে সরিয়া গেল, সেই দিন যথার্থই ভয়ে কাতর হইয়া হা-হুতাশ করিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, আজ হইতে প্রভু তোমাকে ছাড়িয়া এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। ভবিষ্যৎ ভাবিবার যতটুকু ক্ষমতা তখন ছিল তাহাতে তো কোন রূপেই কূল-কিনারা না দেখিয়া, হতাশ প্রাণে—কাতর ভাবে তোমাকে বলিয়াছিলাম, "কি করিলে দয়াময়"। যদিও তখন আমি বুঝিতে পারি নাই কিন্তু তুমি অন্তর্য্যামীরূপে সকলই জানিয়াছিলে। কোন্ সুকৃতিবলে জানি না সে ডাক—সে কাতর প্রার্থনা তোমার কাণে পৌঁছিয়াছিল। তাই এখন দেখিতেছি

আমার সকল কার্য্যের মধ্যেই তোমার অনন্তসত্তা বুঝাইয়া দিয়া আমাকে অভয় দানে কৃতার্থ করিতেছ। যখনই যে বাসনা হৃদয়ে জাগিতেছে, কিছুই তোমার কৃপায় অপূর্ণ থাকিতেছে না। যতই অগ্রসর হইতেছি, সংসারে বহু কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া যতই নিজেকে ব্যস্ত করিতেছি, ততই যেন তোমার সর্ব্বব্যাপিত্বের অনুভবরূপ পরমানন্দ লাভে ধন্য হইতেছি।

দয়াময়! আমার আর বলিবার কিছু নাই, কেবল এই প্রার্থনা, তুমি যে সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, তোমার কৃপা ভিন্ন যে কিছু মাত্র করিবার আমার শক্তি নাই এইটী যেন কখনও না ভুলিয়া যাই। তোমার কাছে চাহিবার আর আমার কিছু নাই, যাহা চাহিব তাহা আমার অভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তুমি যোগাইতেছ। এখন এই করিও, যেন অভিমান আসিয়া আমাকে তোমার ভাব হইতে বিচ্যুত করিয়া বিপথগামী না করে। যেমন ভাবে এখন তোমার উপর নির্ভর রাখিয়া চলিয়াছি, সেই ভাবেই যেন তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া আমার কর্ত্তৃত্ব ভুলিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিতে সমর্থ হই। দীনদয়াল দীনবন্ধু আজ তোমার শ্রীচরণ-প্রান্তে আমার এইমাত্র প্রার্থনা।

দীন শ্রী—

সফল স্বপ্ন

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিত)

(১)

শ্রীনিমাই যখন মাতৃগর্ভে, দ্বাদশ মাসেও ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় আত্মীয় স্বজন সকলেই তখন চিন্তিত। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন, কোষ্ঠী গণনায় তিনি যদিও কন্যার তখন সৌভাগ্য যোগ পাইয়াছিলেন, যদিও কোন আশঙ্কার কারণ পান নাই তবু একেবারে চিন্তার হাত এড়াইতে পারেন নাই। শিশু জাত হওয়া মাত্র তাঁহাকে জানাইতে বলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহ ছিল বেলপুকুর, জামাতালয় মায়াপুর হইতে বড় দূরে নহে।

শচীদেবীর এই গর্ভের সন্তানই নিমাই। নিমাই যে দিন জন্মগ্রহণ করেন,

সেদিন পূর্ণিমা ছিল, তাহাতে আবার জন্মকালে গ্রহণ হইয়াছিল। দান ধ্যান জপ তপের সময় তখন ; কিন্তু তাহা হইলেও সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আসিয়া নবজাত শিশুর জন্মলগ্নের ফল বিচার করিয়া দেখিলেন যে, এ শিশু সাধারণ নর-শিশু নহে।"

দৈবাৎ ঐ সময়ে আর একজন দৈবজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনিও শিশুর জন্মলগ্ন গণনায় তাহার দশাফল বলিয়াছিলেন, যথা—চৈতন্য ভাগবতে মিশ্র পুরন্দর প্রতি দৈবজ্ঞের উক্তি—

"ভাগবত ধর্ম্মময় ইহার শরীর।
দেব দ্বিজ গুরু পিতৃমাতৃভক্ত ধীর॥
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেই মতে শিশু করিবে সর্ব্বকর্ম্ম॥
ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান।
যার এ নন্দন তারে রহুক প্রণাম॥"

একথার বিশিষ্ট প্রমাণ কিছুদিনের মধ্যেই পিতামাতা পাইয়াছিলেন।

নিমাই যখন শিশু, তখন এমন সব কখন কখন ঘটিত যে, মাতাপিতা বিস্মিত হইতেন ; ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেন না। কখন কখন যেন কাঁহাদের স্তুতি গীতি গৃহাভ্যন্তরে শুনিতে পাইতেন, কখন বা শচীর চক্ষে অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি ছায়াচিত্রের মত প্রতিভাত হইত, কখন বা শিশুর শূন্যপদে নূপুরধ্বনি শুনিতেন। কিন্তু এসব মনে থাকিত না, ভুলিয়া যাইতেন পুত্রের কমনীয় মুখ দেখামাত্র। স্নেহে তখন বুক ভরিয়া উঠিত, জগত তাঁহারা আনন্দময় নিরীক্ষণ করিতেন আর বিহ্বলের মত সব ভুলিয়া যাইতেন। তবে সময়ে সময়ে শিশুর অপূর্ব্ব অলৌকিক ঘটনা মনে জাগিত বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহা ভুলিয়া যাইতেন।

নির্ব্বিকার প্রীতি, নির্ম্মল সলিলের মত স্বচ্ছ। প্রীতির স্রোত প্রকৃতই যথায় বহে, সে খাতের বালুকণা পর্য্যন্ত নেত্রপথে পতিত হয়। প্রীতিপাত্রের কোন কথা তখন লুক্কায়িত থাকে না।

কাজেই নিমাই যে লীলা পুরুষোত্তম, পাকে প্রকারে নানাভাবে তাহা মাতাপিতার গোচরীভূত হইত, যদিও তাঁহাদের তাহা আলোচনার অবসর ছিল না। এইটাই ভগবানের ভগবত্তার পরিচয় বলিয়া মনে হয়।

প্রেমিকের স্বচ্ছ চিত্ত-দর্পণে প্রীতিভাজনের প্রতিচ্ছবি সদা জাগ্রত থাকে।

প্রতিচ্ছবির সহিত তাহার ভূত ভবিষ্যতের কার্য্যের ছায়াপাতও সে স্বচ্ছদর্পণে প্রতিফলিত হয়।

এ জগতে প্রত্যেকের জীবন ব্যাপিয়া যাহা ঘটিবে, তাহা আকস্মিক নহে,— প্রকৃত পক্ষে আকস্মিক বলিয়া কিছু নাই ; ভবিষ্যৎ ঘটনাও পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং যেজন নির্ব্বিকার প্রীতির পাত্র, তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়াচিত্রও প্রেমিকের স্বচ্ছ চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হওয়া বিচিত্র নহে।

সফল স্বপ্নের কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। বায়ু পিত্ত কফের বিকার জনিত স্বপ্নই অমূলক। পূর্ব্বচিন্তিত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ জনিত যে সকল চিত্র স্বপ্নে দেখা যায়, অনুসন্ধানে তাহারও মূল পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কতকগুলি স্বপ্ন আছে যাহা কোনরূপ চিন্তারই ফল নহে, যাহা কখনও ভাবিবার কারণ উপস্থিত হয় না, সুষুপ্তি অবস্থায় স্থিরচিত্তে দৃষ্ট ঐ সকল স্বপ্নই প্রায় সত্যে পরিণত হইতে দেখা যায়। ঈদৃশ সফল স্বপ্নের উদাহরণ অনেক আছে। শ্রীচৈতন্ত ভাগবত হইতে এইরূপ একটি সফল স্বপ্নের উদাহরণ দিতেছি।

শ্রীনিমাইএর পিতা মিশ্র পুরন্দর একদা এইরূপ একটা স্বপ্ন দেখেন। তিনি যে স্বপ্ন দেখেন, তাহা পত্নী শচীদেবী ও প্রতিবেশী বন্ধু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর তনয় বৃন্দাবন দাস তাহার কথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন।

একদিন শয্যাত্যাগ করিয়াই জগন্নাথ মিশ্র বলিয়া উঠিলেন,—

"গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাই।"

নিমাই তখন বালক ; পতির মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া শচী তখন মিশ্রপুরন্দরকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"এ সকল বর কেন মাগ আচম্বিত ?"

উত্তরে মিশ্রপুরন্দর বলিলেন,—

* * * * "আজি মুই দেখিনু স্বপন।
নিমাই করিছে যেন শিখার মুণ্ডন ॥
অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে কৃষ্ণ বলি সর্ব্বদায় ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আদি যত ভক্তজন।
নিমাই বেড়িয়া সবে করেন কীর্ত্তন ॥

কখন নিমাই বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ তুলিয়া দেই সভার মাথায়॥"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবদ্বীপে নিমাইর অনেক লীলাচিত্র প্রকটিত হয়; তন্মধ্যে মহাপ্রকাশ একটি প্রধান চিত্র, একদিন নিমাই বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিয়া ভক্তদিগকে বরদান করেন, তাঁহাদের মাথায় (ভগবানাবেশে) চরণ দিয়া তাঁহাদের চির অভিলাষ পূর্ণ করেন। জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে এই প্রধান লীলাচিত্র প্রত্যক্ষ করেন।

জগন্নাথ যাহা দেখিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছিল, অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছিল, বৈষ্ণব গ্রন্থের পাঠক তাহা অবগত আছেন। এটি ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কিত সফল স্বপ্ন। আগামী বারে আমরা আর একটী সফল স্বপ্নের আলোচনা করিব।

মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি

(শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত)

ভগবানের হৃদয় "বজ্রের মত কঠিন, আবার কুসুমের মত সুকোমল।" যশোদার আদরের ধন, গোপীপ্রেমমত্ত কালাচাঁদ অবলীলাক্রমে ব্রজের স্নেহ-নিগড় ছিন্ন করিয়া দ্বারকাবাসী হইলেন, আবার নবদ্বীপ-সুধাকর স্বামিপুত্রহারা শচী-মাতার নয়নের তারা নিমাই স্নেহময়ী মাতার অসীম স্নেহ ও যুবতী ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার অকৃত্রিম প্রেম উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলবাসী হইলেন। ভগবৎ চরিত্রের ইহাই বিশিষ্টতা। যাহা হউক, নিমাই চরিত আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাল্যকাল হইতে নিমাইএর মাতৃভক্তির কিছুমাত্র অভাব ছিল না বরং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি সুপবিত্র মাতৃ-স্নেহ একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। নীলাচলে বাস করিয়াও তাঁহার হৃদয় ও মন সর্ব্বদাই নবদ্বীপে তাঁহার মাতৃ-মন্দিরেই ন্যস্ত ছিল। মাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তোষার্থ তিনি তাঁহার নিরপেক্ষ ভক্তদিগকে নিযুক্ত রাখিয়া মাতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বাল্য লীলায় তাঁহার বালকোচিত চাপল্যের মধ্য দিয়া মাতৃভক্তি স্ফুরিত হইত। শৈশবাবস্থায়

একদিন তাঁহার স্নেহময়ী মাতা তাঁহার হৃদয়ের ধন নিমাইকে খই সন্দেশ খাইতে দিয়া অন্যান্য গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্তা হইলেন, চঞ্চল নিমাই উক্ত খাদ্য দ্রব্যাদি উপেক্ষা করিয়া মাটী খাইতে আরম্ভ করিলেন। শচীমাতা নিমাইএর এরূপ আচরণ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন, তচ্ছ্রবণে নিমাই সরোষে বলিলেন—

"খৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটীর বিকার।
এহো মাটী সেহো মাটী কি ভেদ ইহার॥" (চৈঃ চঃ)

শচীমাতা বালক নিমাইএর এরূপ অদ্ভুত তত্ত্বজ্ঞান দেখিয়া অন্তরে বিস্মিতা হইলেন, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ মাতৃস্নেহ বশতঃ বলিলেন—

"মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটী খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়॥" (চৈঃ চৈঃ)

নিমাইও তখন আত্মগোপন করিয়া মাতৃভক্তির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন—

"এবে ত জানিনু আর মাটী না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তন দুগ্ধ পিব॥
এত বলি জননীর কোলে ত বসিয়া
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥" (চৈঃ—চঃ)

বাল্যকালে নিমাই বড়ই চঞ্চল ছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে পাড়া-প্রতিবেশীগণ সর্ব্বদাই অস্থির। কতকগুলি সঙ্গীর সাহায্যে তাঁহাদের গৃহ হইতে দ্রব্যাদিও অপহরণ করেন। তিনি স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া অন্যান্য বালকদিগকে প্রহার করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। একদিন কতকগুলি বালক শচীমাতার নিকট গিয়া নিমাইএর ব্যবহার নিবেদন করিলেন, শচীমাতা নিমাইকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন, নিমাই তাহাতে আরও অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া গৃহে যত মৃৎপাত্র ও ভাণ্ড ছিল সমস্ত চুরমার করিলেন।—

"তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজ দোষ॥
কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন॥ (চৈঃ—চঃ)

এ স্থলেও নিমাইএর বালকোচিত হৃদয়ের সুকোমলতা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

নিমাইএর অগ্রজ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, নিমাই

পিতামাতার সন্তোষ বিধানার্থ সবিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি প্রমাণ স্বরূপ দেখান হইল।

"ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল মাতা পিতার মন॥" (চৈঃ—চঃ)

অতঃপর পিতৃ-বিয়োগের পর নিমাই বালসুলভ চপলতা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া একনিষ্ঠ মাতৃ-সেবক হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মাতার শোকাপনোদন করিতে চেষ্টা করিতেন এবং মাতার মন যাহাতে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকে সে বিষয়ে কিছুমাত্র উদাসীন ছিলেন না।

নিমাই বঙ্গদেশে অবস্থান কালীন নবদ্বীপে তাঁহার—প্রিয়তমা ভার্য্যা লক্ষ্মী দেবীর পরোলকপ্রাপ্তি ঘটিলে সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভু অন্তরে সমস্ত জানিয়া মাতার দুঃখ বিমোচনার্থ সত্বর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

"অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্য্যামী।
দেশেতে আইলা প্রভু শচী দুঃখ জানি॥
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধন-জন।
তত্ত্ব কহি কৈলা শচীর দুঃখ বিমোচন॥ (চৈঃ—চঃ)

সকল বিষয়ে মাতাব সন্তোষ জন্মানই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ মাতৃ-সেবক মাতাকে অকূল দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করিয়া কেন সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অবশ্যই কারণ আছে এবং চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে তাহা নির্ণীতও হইয়াছে, ভক্ত পাঠকগণের জ্ঞাত জন্য তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

"যত অধ্যাপক আর তার শিষ্যগণ।
ধর্ম্মি কর্ম্মি তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে।
আমি লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥
নিস্তারিতে আইলাঙ আমি হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত॥
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।
তবে ইহা সভারে সে ভক্তিলভ্য হয়॥

ঘোর নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব আমি অবশ্য সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥
এ সব পাষণ্ডীব তবে হইব নিস্তার—
আর কোন উপায় নাঞি এই যুক্তি সার॥ (চৈঃ—চঃ)

পতিত-পাবনাবতার পবম দয়াল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীব উদ্ধার ও প্রেম ভক্তি প্রচারোদ্দেশ্যেই মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং নিন্দুক দুর্জ্জন প্রভৃতিকে বাদ দিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয় কেমন করিয়া? কি দয়ার অবতার! সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি যে মাতৃস্নেহ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি মাতৃ আজ্ঞাতেই নীলাচলবাসী হইয়াছিলেন। কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি একবার শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার মাতার সহিত মিলন কালে মাতৃ ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

"প্রভু ত কান্দিয়া কহে শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ জন্মি তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥
জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাতে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ মুঞি তাঁহাই রহিমু।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিমু॥" (চৈঃ—চঃ)

কি হৃদয়স্পর্শী মাতৃভক্তির মধুর দৃষ্টান্ত! এরূপ অমিয় বাণী শ্রবণে কোন্ গর্ভধারিণী গৌরব অনুভব না করেন? মাতাও তখন নিজ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পুত্রের উদ্দেশে বলিলেন—

"তেঁহো যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুঃখ॥" (চৈঃ—চঃ—)

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বাটীতে বাস করিবার প্রস্তাব তিনি করিলেন না। তিনি যুক্তি দিলেন মাতৃভক্ত সন্তান যেন নীলাচলেই বাস করেন। তখনকার দিনে নীলাচল ও নবদ্বীপে সর্ব্বদাই লোক যাতায়াত ছিল, তথায় থাকিলে তিনি সর্ব্বদাই পুত্রের সংবাদ পাইতেন, মহাপ্রভুর ভক্তগণও মধ্যে মধ্যে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেন এবং তাঁহাদের মুখেও পুত্রের কুশল বার্ত্তা পাইতেন। কখনও বা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে পুত্রও নবদ্বীপে আগমন করিতেন। মহাপ্রভু চিরজীবন মাতৃ আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার মাতৃ-ভক্তি দিন দিন গভীরতা লাভ করিয়াছিল। তিনি প্রথমবারে বৃন্দাবন যাত্রা কালীন নীলাচলবাসী ভক্তগণকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"গৌড়দেশ হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥" চৈঃ—চঃ

নীলাচলে বাস করিয়া তিনি সর্ব্বদাই মাতার নাম স্মরণ করিতেন এবং সূক্ষ্ম শরীরে মাতার নিকট গমনও করিতেন। এক বৎসর শ্রীবাস পণ্ডিত নীলাচল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে মহাপ্রভু নিজহস্তে মহাপ্রসাদ ও বস্ত্র তাঁহার হস্তে দিয়া মাতৃ উদ্দেশে কি বলিয়াছিলেন তাহার মধুরত্ব অনুভব করুন।

"এই বস্ত্র মাতাকে দিও এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ॥
তার সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ॥
তার প্রেমবশ আমি তার সেবাধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥
কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যেকালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হইল মন॥
নীলাচলে আছো মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে যাই তাঁর চরণ দেখিতে॥
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তি জানে তিঁহো তাহা সত্য নাহি মানে॥" চৈঃ—চঃ

কি অকপট মাতৃপ্রেম। নীলাচলে বাসকালীন তিনি যে কেবল বাক্যদ্বারা মাতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তিনি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তোষ বিধানার্থ স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ প্রভৃতি নিরপেক্ষ ভক্তগণকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া মাতার নিকটে বাস করিতে আজ্ঞা দিতেন। দামোদরকে মাতার নিকট পাঠাইবার কালীন মহাপ্রভু কি বলিয়াছিলেন শুনুন।

"মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখ কথা কহি সুখ দিহ তাঁরে॥
নিরন্তর নিজকথা তোমাকে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাতে॥" চৈঃ—চৈঃ

মহাপ্রভুর চরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় তিনি একাধারে মানবোচিত সমস্ত গুণের আধার ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরাঙ্গাবতারে হৃদয়ের উচ্চবৃত্তি-গুলি অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে।

ভক্ত পাঠকগণ। সেই মাতৃভক্ত, প্রেমভক্তি দাতা, পরম দয়াল, অবতার সার গোরার শ্রীচরণছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা দূরীভূত করুন।

শ্রীশ্রীনাম

(শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বক্সী লিখিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহাদস্যু রত্নাকরের নাম সকলেই জানেন, তিনি নামের গুণে দস্যু হইতে মহর্ষি বাল্মিকীতে পরিণত হইয়াছিলেন।

"কাজ কি জপে, কাজ কি তপে,
গুরুপদ সদা ভাবনা।
শ্রীগুরু স্মরণে, কি ভয় মরণে,
গুরুদত্ত মন্ত্রে যাবে যম যাতনা॥

সহিত সাধনা, সে ধনে সাধনা,
মহাদস্যু রত্নাকর দেখরে তার তুলনা।
উল্টা রাম নামে, বাল্মীকির পরিণামে
মরা মরা বুলি ব'লে গেল পাপ লাঞ্ছনা॥"

তাই বলি, নাম ভিন্ন জীবের তরিবার উপায় আর কি আছে! নাম ব্রহ্ম, নাম সারৎসার; নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই। কি সত্যযুগে, কি ত্রেতাযুগে, কি দ্বাপর যুগে, কি কলিযুগে চারিযুগেই নামের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, নাম ব্যতীত নামীকে ধরিবার উপায় নাই। জগতে যাহা কিছু সব নামময়, কোন কোন ঋষি বলেন, সত্যতে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে দান, আর কলিতে নাম; কিন্তু আমার মনে হয়, নামের মহিমা চারি যুগেই আছে। সৃষ্টির আদিতে মধু-কৈটভ জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তার সে নাম কি কখনও লয় হবে? ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ হরিনাম ক'রে পিতৃবাক্য অবহেলা করেছিল, কিন্তু সে প্রহ্লাদের নাম পৃথিবীতে কেহ কখনও বিস্মরণ হবে, না হয়েছে? পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ভক্তোত্তম ধ্রুবের নাম গান কি কেহ ভুলেছে? ভগবান ভোলানাথ যোগীশ্রেষ্ঠ নামের জন্য, দেবর্ষি নারদ, উদ্ধব ইহারা ভক্তশ্রেষ্ঠ নামের জন্য নামাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেব, শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর, সাধক কুলচূড়ামণি রামপ্রসাদ সেন, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বরণীয় পূজনীয় হ'য়েছেন কেবল নামের জন্য। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, সকলেই নামাশ্রয় করিতে চায়, কেউ কেউবা নিজ নাম রক্ষা করবার জন্য অতুল কীর্ত্তি রেখে যায়। যার পরিণাম জ্ঞান আছে সেই জানে নাম ভিন্ন গতি নাই। কোন কোন পুষ্করিণীর তীরে তাল বৃক্ষ থাকে, কিন্তু সেই তালবৃক্ষ ধ্বংস হইলেও তালপুকুর নামটা কখনও যায় না, যে পুষ্করিণীতে পদ্ম থাকে পদ্ম লয় হইলেও পদ্মপুকুর নাম কখনও যায় না। নামের উপর নির্ভর করেই সাধন, নামের উপর নির্ভর করেই ভজন। সাধন করিতে হইলেই গুরু যে নাম দিয়াছেন, সেই নাম অবলম্বন করে নামগান করিতে হয়। জগতে যা কিছু দেখুন, নাম ছাড়া কিছুই নাই। যিনি হরিনাম আশ্রয় করে নাম রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই নরোত্তম, আর যার নাম লোপ হয় সেই নরাধম। এখন হইতে অগ্রসর হইতে থাকুন অচিরে ভগবানের কৃপা পেয়ে পরম কৃতার্থ হবেন। নামপ্রেমে নিজেও মাতিবেন এবং জগৎকেও মাতাইবেন; এ সকলেরই মূল নাম, ইহা জানিয়া নামের আশ্রয় গ্রহণ করুন জীবন সার্থক হইবে।

ইহজগতে নামই নিত্য। এই নিত্যনাম যিনি নিত্য নিত্য জপ করিয়া থাকেন, তার চিত্তকে আর অনিত্য কাম, ক্রোধে বশীভূত করিতে পারে না। নামে যার মন মাতে, তিনি প্রাণের ভয় করেন না, যমের ভয় করেন না, শত্রুর ভয় করেন না। হায় হায়, আমার সেই নামে কবে মতি হবে? জলের উপর দিয়ে নৌকা যায়, নৌকা জলেই সংলগ্ন থাকে, কিন্তু নৌকাস্থিত আরোহিগণকে যেমন জল স্পর্শ করে না, এই মায়াময় সংসারে যিনি হরিনাম আশ্রয় করেন, তাঁহাকে কখনও মায়া স্পর্শ করিতে পারে না; অর্থাৎ তিনি সংসার মায়ায় আবদ্ধ হন না। বল্‌তে পারেন, নৌকার আরোহী নৌকা ডুবলে জলমগ্ন হইতে পারে কিন্তু সে সামান্য তরীর ডুববার ভয় আছে, হরিনাম-তরীর ডুববার ভয় নাই, সে তরীতে মানব কর্ণধার, আর এ তরীতে গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ণধার। যে তরীর এমন কর্ণধার, সে তরীকে আশ্রয় করিলে কি কেউ নিমগ্ন হয়? গুরুদত্ত নাম-তরীতে কর্ণধার গুরুরূপী কৃষ্ণ, হাল তাতে দীক্ষা, দাঁড় তাতে শিক্ষা, দাড়ী তাতে সাধন, বাতাস তাতে অনুরাগ। যিনি ভজন পাল তুলে দিয়ে নাম তরীতে উঠতে পারেন, তাঁহাকে আর মায়াজালে পড়ে হাবু ডুবু খেতে হয় না। তাই বলি নাম অবলম্বন করাই জীব মাত্রের অবশ্যই কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে ব্যবস্থিত যে পাঁচ প্রকার উপাসনা আছে, ঐ সমস্ত উপসনা কলির মনুষ্যের পক্ষে কঠিন, এজন্য কেবল "নাম" অবলম্বন প্রত্যেক উপাসনাই ব্যবস্থা দিয়াছেন। কলির দুরবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া শাস্ত্র কর্ত্তাগণ কেবল হরিনাম ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন! হিন্দু চিরদিন ধর্ম্মভীরু জাতি, হিন্দুর ভিত্তি ধর্ম্মের উপর, আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি, আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, বিচার, রীতি, নীতি, পদ্ধতি, সমস্তই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধুনাতন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আমাদের এ দুর্গতি, ভারত-বর্ষ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। মনুষ্যগণ দিন দিনই অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে—কি শোচনীয় পরিণাম, এ আধুনিক শিক্ষা মাহাত্ম্য ভিন্ন কিছুই নহে। আধুনিক অশিক্ষাই মনুষ্যদিগকে দিন দিন এমনতর বিপথে লইয়া যাইতেছে। এ পতন হইতে মনুষ্যের উদ্ধারের উপায় "নাম ধর্ম্ম" ভিন্ন আর কিছুতেই হওয়ার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র নামোচ্ছ্বাস ব্যতীত এ পঙ্কিলময় পাপরাশি বিধৌত হইবার আর কোন উপায়ই দেখি না। ধর্ম্ম বিপর্য্যয় ঘটাইয়া শাস্ত্র বিধির বিষম অবমাননা করা আমি শ্রেয়ঃ মনে করি না। এক্ষণে কেবল এই নির্ণয় করা উচিত যে, এই সময়ের মধ্যেও মনুষ্যের গতি-মুক্তির উপায় কিছু আছে কিনা, কিরূপে মানুষের মনে ধর্ম্ম বীজ পুনঃরোপন করা যায়, এই সমস্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একমাত্র

নাম ধর্ম্মের প্রচারে সকল বিশৃঙ্খলারই নিবারণ হইবে। ভারত-শৃঙ্খল রক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। মানুষ ধর্ম্ম কর্ম্মে মতিমান হয়, ইহা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। সর্ব্বকালেই এই দিকে যত্ন করা হইয়াছে, সৃষ্টির নিয়মই এই। সর্ব্বলোক হিতকর অনুষ্ঠানই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ।

বর্ত্তমান দৈন্যের কারণ বোধহয় সুধীজন-সমাজে কেহই অবদিত নহেন। বিকৃত শিক্ষা, দীক্ষা সর্ব্বোপরি ধর্ম্মলোপেই আজ ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। রোগ, শোক, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ কেন? ধর্ম্মবর্জ্জিত শিক্ষার জন্য নানারূপ পাপ, তাপ, অশান্তিতে ভারত ছারখার হইয়া যাইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ হিন্দুশাস্ত্র মানিয়া চলি না, হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করি না, বা হিন্দুশাস্ত্র বুঝি না এবং ধর্ম্ম রক্ষার সহজ প্রণালী জানি না। হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী' আচার ব্যবহার ব্যতীত কিছুতেই এসকল বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যাইবে না। ধর্ম্ম শিক্ষা একে একে সব লোপ পাইতেছে। আজ আমরা জাতি গঠন লইয়া ব্যস্ত কিন্তু জাতি গঠন হইবে কিসে? সমস্ত জাতি আজ অশিক্ষায় মূক ও অন্ধ; সর্ব্বাগ্রে জনসাধারণকে চক্ষুষ্মান ও মানুষ করিতে হইবে, বর্ত্তমান দুরবস্থার স্পষ্ট ধারণা জাগাইতে হইবে, নতুবা জাতি গঠন হইতে পারে না। জাতি গঠন করিতে হইলে ধর্ম্মের দাবস্থ হইতে হইবে। নাম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠানে জাতি গঠিত হইবে ও লক্ষ্যের সন্ধান মিলিবে। ধর্ম্মের পথই প্রকৃত পথ, একমাত্র ধর্ম্মই জাতিকে এক সূত্রে বন্ধন করে, অন্যথা অসম্ভব। শ্রীগৌরাঙ্গদেব মানবকে শান্তির পথ দেখাইয়াছেন। আহা এমন সুন্দর ও সহজ পথ আর নাই। আমরা দুর্ব্বল মূর্খ জীব—"নাম" জপ করিলেই জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করিবে।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

এই দ্বাত্রিংশদক্ষরময় ষোড়শ নামই কলির প্রকৃত পন্থা। "নামই" নিখিল জীবের একমাত্র গতি। নাম ভিন্ন জীবের দুঃখ দূর হইতে পারে না। হরিনামের অর্থ কি জানেন? যে নামে উদ্ধার হওয়া যায়—পাপহরণ হয়, তাহাই হরি নাম। যিনি যে নামে বিশ্বাসী, তাঁর তাই হরিনাম। নাম নামী অভেদ। নামের সঙ্গে নামীকে বুঝিতে চেষ্টা করা অতীব প্রয়োজনীয়। সমস্ত শাস্ত্র এক বাক্যে বলিয়াছেন—কলিতে নাম জপ একমাত্র উপায়।

"নামের" অমৃত ফল, নামে মোক্ষ—এ কথা মুক্ত কণ্ঠে সকলেই স্বীকার করিবেন। বেদ, পুরাণ উপপুরাণ, উপনিষদ সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই এ কথার ভূয়োভূয়ঃ

প্রত্যক্ষীভূত প্রমাণ প্রকটিত আছে। আমরা নাম মহিমা, প্রমাণ, উপদেশ বাণী মানি আর না মানি, কিন্তু শৈশব কাল হইতেই শ্রুত হইয়া আছি। হিন্দু ধর্ম্মের কি অপার মহিমা, কি অভাবনীয় আকর্ষণী শক্তি, ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রতত্ত্ব আমাদের ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় সতত পরিস্ফুট হইতে চেষ্টিত, কিন্তু কি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কালমাহাত্ম্য, ক্ষুবণের ইচ্ছামাত্রই বিপর্য্যয় হয়। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, কোথায় আমরা দিনের দিন সাগ্রহে সাধুপথে অগ্রসর হইব, না বর্ত্তমান সমাজের দোষে বিপথেই চালিত হইতেছি। আজকাল আমরা এসকলতো মানিই না জানিও না, যাহা কিছু জানি তাও স্মরণ রাখি না। অধিক কি, পিতৃ-পুরুষগণ যে সকল তত্ত্ব জানাইয়া গিয়াছেন, যত্ন করিয়া শিখাইয় গিয়াছেন— আজকাল তাহাও আমাদের কাছে "উপকথা।"

একমাত্র নাম উপদেশ দিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু কাহার নাম ইহা বিশেষরূপে জানিতে হয়—দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে হয়। এক নামে অনেক বস্তু বুঝায়। হরি শব্দে চন্দ্র, সূর্য্য, সিংহ, অশ্ব, বানর এ সমস্ত বুঝায় এবং পাপহারী ভগবানকেও বুঝায়। এ জন্য নামের সঙ্গেই নামীকে সুন্দররূপে বুঝা আবশ্যক। বিশ্বাস সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—দৃঢ় বিশ্বাস করিলে আর কোন ভয় থাকে না। ভগবান আছেন বা এই জগতের একজন কর্ত্তা আছেন এই বিশ্বাস যাহার আছে, তাঁহাকে কেবল নাম উপদেশ দিলেই হয়। অন্য উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সকলেই মুখে বলেন—ভগবান আছেন, ইহা বিশ্বাস নহে। কারণ একটু বিপদ আপদ হইলেই ভগবানের প্রতি আর বিশ্বাস রাখিতে পারেন না—লোপ পাইয়া যায়। ইহাকে বিশ্বাস বলে না—এরূপে নামীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শিশু যেরূপ অন্য কিছুই জানে না, কেবল রোদন করে, শিশুর ন্যায় অন্তরের অবস্থা হইলেই এক নামেই নামীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাম যত অধিক করিবেন ততই শীঘ্র উপকার পাইবেন। এক হরিনামে যে ফল হয় তাহা আর কিছুতেই হয় না। তৃণের মত নীচ হয়ে বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হ'য়ে নিজ অভিমান ত্যাগ ক'রে 'নাম' করিলে নামের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ভাই সাবধান—নাম বলে পাপ করিতে নাই। যারা নাম বলে পাপ করে তাহাদিগকে ভয়ানক অপরাধী বলেছেন। নাম অপরাধের মত পাপ আর নাই। কেবল ভগবৎ নামই সমস্ত ক্রিয়ার মূল। কোন বস্তু দ্বারা কিছু হয় না।

"কি আছেরে নাম ভিন্ন।
দেখ পরিণামে, এই ধরাধামে, নাম ভিন্ন কিছু থাকে না চিহ্ন॥

কর্ণমূলে গুরু নামে দেন দীক্ষা, দ্বারে দ্বারে দুঃখী করে নামে ভিক্ষা,
নামেতেই শিক্ষা, নামেতেই পরীক্ষা
হরিনামে হয় ভব বন্ধন ছিন্ন ॥
বস্তু বসুমতী পশু কিম্বা পাখী,
নাম আছে ব'লেই নামে ডাকাডাকি,
নামে মতি রাখি, কালে দাও ফাঁকি,
এ ভব সাগর হবে উত্তীর্ণ ॥
ইষ্ট কৃষ্ণ নাম মুখে যারা বলে,
তারা কিবে যায় কালের কবলে,
ধর্ম্মদাস বলে, কৃষ্ণনাম—বলে,
ভবরোগে কেউ হবে না শীর্ণ ॥"

তাই বলি ভাই জয় গুরু বলে, নামসাগরে ঝাঁপ দাও, একটানে একপ্রাণে ভেসে যাও। নাম অকূলে কূল দিবেন। আহা! সেই পাষাণ গলান নাম গান কর, নাম পাথারে ঝাঁপ দিয়ে, অতুল প্রেমবস্তু লাভ কর। এই নাম সাগরে ভাসতে ভাসতে কোথায় যাবে জান ভাই? যেখানে মায়া নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, কুটিলতা নাই, যেখানে কেবল শান্তিময় ও প্রেমময়ের অসীম শান্তি ও প্রেম-মাধুর্য্য পরিপূর্ণ হয়ে জীবগণ প্রাণের জ্বালা ভুলে, প্রেমের খেলা খেলছে—সেইখানে যাবে। যাও ভাই একপ্রাণে নামসাগরে ভেসে যাও।

শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ করাই পরমসাধন। সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই এ কথার ভূয়োভূয়োঃ উল্লেখ আছে। সমস্ত দিন নাম করা যাঁহার অভ্যাস হয় তাঁহার কর্ম্ম আপনা হইতে ছুটিয়া যায়। নাম না করিয়া বসিয়া থাকিলে হয় পাপ চিন্তা, না হয় পরনিন্দা, কি বৃথা চিন্তা অথবা বিবাদে দিন কাটিবে। মাদক বস্তু দ্বারা ক্রিয়া করা নিষেধ। নামই শ্রেষ্ঠ মাদক। হরিনাম ইষ্টনাম করিতে করিতে যে নেশা হয়, তাহার কাছে ভাঙ্গ, গাঁজা, আফিং, সুরা ইত্যাদি যত প্রকার মাদক আছে, তাহা কিছুই নহে। নামের নেশা ছোটে না, সর্ব্বদা স্থায়ী। কলিকালে নাম করিতে পাপী তাপী আচণ্ডাল সকলেই সমান অধিকারী—নাম ভিন্ন কলিকালে জীবের অন্য গতি নাই—নাই—নাই। নামের বলেই ভগবানকে লাভ করা যায়। নামেতেই সব হয়। এত নামের মহিমা কিন্তু দয়াল! আমার এমনি কর্ম্মফল যে, নামে রুচি হইল না। আমরা নানাকার্য্যে সময় দিতে পারি কিন্তু যাহাতে মন প্রাণ শীতল হইবে, পাপ তাপ দূর হইবে সেই নাম গানের সময় করিতে

পবি না। প্রভু! তোমার নিকট এই প্রার্থনা, যেন নামে শ্রদ্ধা, রুচি, বিশ্বাস রাখিয়া দিবা নিশি নাম জপ করিতে পারি—এই কৃপা কর।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, "শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর তাহা হইলেই সব হইবে।" শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। প্রকৃতিব মধ্যে যা আছে, তা বলপূর্ব্বক কেহই নিবারণ কবিতে পাবে না। কত ইন্দ্র চন্দ্র এমন কি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পরাস্ত হয়েছেন। কেবল ভগবানের শরণাপন্ন হ'য়ে নাম কবিলেই সহজে প্রবৃত্তি দমন হয়। বাহ্যিক উপায় কিছু নয়, নাম করিতে করিতে আপনিই সমস্ত চ'লে যা'বে। প্রকৃত সাধন শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা। একমাত্র নাম জপ দ্বারা আত্মার সমস্ত পাপ সংশয় নষ্ট হইবে। ভগবানকে লাভ করিতে "নাম" অপেক্ষা সহজ উপায় আব নাই। সর্ব্বদা বিচার করিয়া চলিতে হইবে। যাহাতে অভিমান হয় এমন কিছুই কবিবেন না, অভিমান বড় ভয়ানক। যতরকম অপবাধ আছে তার পাব আছে, কিন্তু অভিমানেব পাব নাই।

দৈনন্দিন ব্যাপাবে নাম কালীন নিম্নলিখিত বিষয়গুলিব উপব দৃষ্টি বাখিবেন। ১। সর্ব্বদা সৎচিন্তা কবিবেন। ২। অসৎ সংসর্গ যাহাতে না হয় তাহার সতত চেষ্টা করিবেন। ৩। কাহাবও সহিত তর্ক কবিবেন না বা বেশীকথা বলিবেন না। ৪। কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি কবিবেন না বা পবকে কোন প্রকাব শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিবেন না। ৫। নাম ভুলিবেন না। ৬। সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবেন। ৭। কায়, মন ও বাক্য দ্বাবা পবোপকাবের চেষ্টা করিবেন। ৮। কাহারও পাপের বিষয় মনে কবিবেন না—নিজেব দোষ সর্ব্বদা দেখিবেন। ইহাতে মনে দীনতা আসিবে ও শান্তি পাইবেন। ৯। অসৎ চিন্তা বিষবৎ ত্যজ্য। ১০। নাম কবিবাব সময় প্রাণের ব্যাকুলতাকে সঙ্গী কবিবেন। ১১। সর্ব্বজীবে দয়া ও স্নেহ করিবেন। ১২। স্বার্থই মৃত্যু, সত্যই জীবন। ১৩। যাহা আপনাব পীড়া দেয়, তাহা অন্যের প্রতি ব্যবহাব কবিবেন না। নির্জ্জন বাস ভাল বাসিবেন। ১৫। মহত্বেব প্রধান লক্ষণ অকপটতা, মুখে বাহিরে এক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে বার বার প্রণাম করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহাবেব পূর্ব্বে আসুন পাঠক, আমরা মিলিত কণ্ঠে প্রাণ ভবিয়া আর একবাব বলি :—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হরে।
হরে রাম হরে রাম বাম রাম হরে হরে ॥"

এই নাম ধ্বনিতে ত্রিতাপ তাপিত জগজ্জনের হৃদয়ে শান্তিবাবি বর্ষিত হউক।

সম্প্রদায়ে স্বেচ্ছাচার

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণসাংখ্যতীর্থ লিখিত]

বৈষ্ণব সম্প্রদায় আজকালকার নয়। ইহা শাশ্বত সম্প্রদায়। এই যে আমাদের মধ্বসম্প্রদায়টী, ইহা লোক-পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

এই সম্প্রদায়ের পরম অবলম্বন—বেদ। পারমার্থিক সত্যবস্তুই এ সম্প্রদায়ের উপাস্য। সত্যের অপলাপ অসম্ভব, তাই এ সম্প্রদায় কখনও অস্তিত্বহীন হয়নি।

এই সম্প্রদায়ের ভিত্তি বেদ, তদনুগত শাস্ত্র ও বেদান্ত দর্শন। সূক্ষ্মদর্শী বহু মনীষী এই সম্প্রদায়ে প্রকটিত হ'য়ে সাধনরাজ্যে সাফল্য ও বৈষ্ণবীয়তত্ত্ব রাজ্যে প্রাধান্য দেখায়ে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন ক'রে চ'লে গেছেন। তাঁদের স্বাবলম্বন নূতন কিছু হয়নি। তাঁরা পুরাতন বেদ, বেদানুগত শাস্ত্র ও বেদান্ত দর্শন সম্বল ক'রে সাধনপথে ও তত্ত্বপথে এগিয়ে গেছেন। তাঁরা শাস্ত্র অবলম্বনেই লোকাতীত বস্তু করতলগত ক'রেছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় লোকমতের উপর নির্ভর কর্ত্তে জানত না। শাস্ত্রোক্ত কার্য্যেই তৎপর ছিল। তাই আগে নিজ ক্ষুদ্র নীচমনের অনুরূপ শাস্ত্রবিরোধিতত্ত্ব সম্প্রদায়ে উঠ্‌ত না,—কারণ, তাঁরা শাস্ত্রই মুখ্য প্রমাণ জান্‌তেন।

সেদিনকার কথা, যখন অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তবৃন্দ সহ বৈষ্ণবীয় সাধনা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন, তখনকার কুসংস্কারবশতঃ জনমত তাঁদের উপর খড়্গহস্ত হ'ল। কিন্তু শাস্ত্রনিষ্ঠ তাঁদের কিছু করতে পারল কি? নীলাবলে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ধর্ম্মপ্রচার কর্ত্তে প্রয়াস করলেন, তখনো লোক যেন একটা কেমন বৈসাদৃশ্য দেখল, অমনি কুপ্রবৃত্তিবশে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে চাঞ্চল্য প্রকাশ করল। কিন্তু প্রভু তাঁর ধর্ম্মকে লোকের মনের মত না করে শাস্ত্রোক্তরূপেই প্রচার করলেন। জনকত লোক শাস্ত্রস্বীকার না করে নিজের দুষ্ট অভিসন্ধি প্রকাশ করতে গেলে নিজেরাই পরিত্যক্ত হবে। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় শাস্ত্র ছেড়ে জনমতের উপর কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শাস্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

এখন একটু কেমন বৈপরীত্য লক্ষ্য হচ্ছে। এই সনাতন সম্প্রদায়ের রঙ্গমঞ্চে কয়েকটী উদারনৈতিক নট ঢুকেছে, তারা অভিনব নাট্যের অভিনয়ে আসর জমায়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গূঢ়তত্ত্বটুকু নাশ করতে ব'সেছে। এগুলিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আসর হ'তে দূর করতে না পারলে সম্প্রদায়ের অব্যাহতি নাই।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও সামাজিক উন্নতিসাধন ক্ষেত্রে হাত পাকাইয়া ইহারা এইবার উপাসনাকাণ্ডে উদার নৈতিকতার মধুচক্র তৈরী সুরু করেছে। যে ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বৈদিকতা, শাস্ত্রীয়ত্ব, দার্শনিকতা মাখানো, শাস্ত্রের অবলম্বন ছেড়ে যে ধর্ম্ম পাদক্ষেপ কর্ত্তে জানে নি, তার ভিতর অত উদারনৈতিকতা ঢুকাতে গেলে আজকালকার বিস্কুত কিমাকারই ত তৈরী হবে।

ঠিক কথা বলতে গেলে শাস্ত্রমতের অপলাপকারীরা বৈষ্ণব নয়। তাঁরা অত্যুদ্ভট কোন একটা কলিদেবতার চেলাবিশেষ। কেবল সম্প্রদায় নাশ করবার ইচ্ছায় ভেল্কী দেখায়ে লোক ভুলায়ে বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিচ্ছে। শাস্ত্র নিজের অনাদরকারিগণকে "অবৈষ্ণব" "ভগবদ্দেষী" "পাষণ্ডী" বলে আখ্যা দিয়েছেন। যথা—

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্ত উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥
স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ন চ বেদোদিতং মহৎ।
বিনৈব ভগবৎপ্রীত্যা তে চ পাষণ্ডিনো মতা॥

আমরা সাধারণের নিকট বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যারা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিশেষত্ব বিলোপকারী, ঐ ব্যক্তিগুলির সর্ব্বথা সংসর্গ ত্যাগ না করলে বৈষ্ণবীয় সাধনে উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যাবে। বরঞ্চ দৈত্যপুরে প্রহ্লাদের মত রাক্ষসপুরে বিভীষণের মত একা একা থাকাও ভাল। অন্য সম্প্রদায়ী উচ্চহৃদয় মহাত্মাগণের সংসর্গেও উপকার আছে, কিন্তু শাস্ত্রমর্য্যাদাত্যাগকারী স্বেচ্ছাচারীদের সহিত মিলে শাস্ত্রবন্ধন ছিড়ে ফেলে দিতে যাওয়া—অপরাধের হাতে এগিয়ে যাওয়া মাত্র।

মনে রাখতে হবে, আকড়িয়ে ধরতে হবে—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ,—"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ" অর্থাৎ কার্য্য এবং অকার্য্য বোধ করতে হ'লে তাতে একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ।

"হাল ছেড়ে ভাসালে নৌকা ভাটাবে বই উজাবে না।" হয় তো ঘূর্ণীতে পড়ে মরতেও হবে। (পল্লীবাসী)

প্রশ্ন *

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর কর।]

১।—গৃহী বৈষ্ণবদিগের বিবাহক্রিয়া কি ভাবে ও কি প্রণালীতে সম্পন্ন হওয়া উচিত? আমাদের দেশ-প্রচলিত বিবাহ গৃহী বৈষ্ণবগণের পক্ষে শাস্ত্র সঙ্গত ব্যবস্থা কি না?

২।—গৃহী বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কি ভাবে ও কি প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হইবে? বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করণীয় কি না? মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবগণের পক্ষে করণীয় কি না?

৩।—মহাগুরু নিপাতে মালা তিলক রাখা এবং সন্ধ্যা বন্দনাদি করা যায় কিনা?

৪।—শ্রীশ্রীএকাদশী ব্রতদিনে আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও বৎসরান্তে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্য কি?

৫।—অন্য দেব দেবীর পূজা কি প্রণালীতে গৃহী বৈষ্ণবগণের করণীয়।

---

* ভক্তিতে মধ্যে মধ্যে ১।১টী প্রশ্ন বাহির হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রদায়ের যাঁহারা মাথা, যাঁহারা নানাভাবে সম্প্রদায়ের হিত সাধন করিতেছেন বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত তাঁহারা সে সকল প্রশ্নের কোনই সদুত্তর দেন না। জানিনা এ সকল বিষয়ে তাঁহারা এত উদাসীন কেন? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ত এখনও আচার্য্য শূন্য হন নাই। প্রভুপাদগণ পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা করিয়া যথেষ্ঠ লোকের চিত্ত সরস করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদেরই আশ্রিত সেবকগণ কোন প্রশ্ন করিলে, অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাঁহারা মোটেই সাড়া দেন না। অনেকে আছেন, মুখে মুখে অনেক কথা বলেন, অনেক উপদেশ প্রদান করেন কিন্তু কিছু লিখিত উত্তর দিতে বলিলে কোন মতেই তাঁহারা রাজি হন না। জানি না ইহা সম্প্রদায়ের উন্নতি কি অবনতির লক্ষণ। বহুদিন হইল "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক" পত্রিকায় "রাসলীলা" নামক প্রবন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, যাহার ফলে বহু বৈষ্ণবের মনে প্রকৃতই আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত উক্ত প্রবন্ধটীর কোনরূপ সমীচিন সমালোচনা হইল না, কেবল নানা পত্রিকায় প্রবন্ধটী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রস্তাবই হইয়া আসিতেছে। অনেক দিন পরে গত কার্ত্তিক মাস হইতে গৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা নবভাবে পুনরায় বাহির হইতেছেন, আশাকরি তাঁহারা এবারে একটু এ বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব আমরা কখনই সমর্থন করিতে রাজী নহ। পূর্ব্বাপর ঠিক সামঞ্জস্য রাখিয়া শাস্ত্র সঙ্গত সিদ্ধান্ত দ্বারা জিজ্ঞাস্য বিষয়ের আলোচনার জন্য আমরা সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের নিকট করযোড়ে নিবেদন জানাইতেছি। আশাকরি ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাঁহারা এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

ভক্তির বর্ত্তমান সংখ্যায় ও আমরা কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি, আশাকরি সম্প্রদায়ের উন্নতিকামিগণ এই বিষয় আলোচনা করিয়া বাধিত করিবেন। (ভঃ সঃ)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ

[শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট লিখিত]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আনন্দ। আপনাব গুরুদেব কোথায়? তিনি কি এই মহাপাপীকে দয়া করিবেন? এ মহাপাতকীর কি এমন শুভদিন হইবে?

নবদ্বীপ। ভাই। তিনি পবম দয়াল, তাঁহাকে একবার দর্শন করিলেই বুঝিতে পারিবে। তিনি সম্প্রতি শ্রীধাম পুরীতেই আছেন।

আনন্দ। তাঁহাকে কিরূপে এখানে আনিতে পারা যায়?

নবদ্বীপ। তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ, জানি না আসিবেন কি না, তবে তোমাব যদি প্রাণে যথার্থ ব্যাকুলতা থাকে—প্রাণে প্রাণে যদি আকর্ষণ করিতে পাব, তবে আসিলেও আসিতে পারেন।

আনন্দ। ভাই, আমার ব্যাকুলতাও নাই, আকর্ষণও নাই, আমার একমাত্র অবলম্বন তুমি। তোমার যাহা ইচ্ছা কর।

(ইহার পরে শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের কৃপায় আনন্দ বাবু পবম ভক্ত হন, শ্রীচরিত সুধাতে সে কাহিনী বিস্তৃত ভাবে আছে।)

এখানে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেব সেই বানীটি মনে পড়িতেছে,—

"মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাই তবু যান তার ঘর॥"

[খৃষ্টান পাদরা সাহেব ও নবদ্বীপ দাদা।]

পুরীধামে নরেন্দ্র সরোবরের নিকট চৌমাথা রাস্তার উপরে একদিন একটি বৃদ্ধ পাদরী সাহেব বক্তৃতা দিতে ছিলেন। বহুলোক জড় হইয়াছে। পাদরী সাহেব একখানি টুলের উপর দাঁড়াইয়া নানারূপ শ্রুতি মধুর কৌতূহল পূর্ণ বাক্য দ্বারা খৃষ্টান ধর্ম্মই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিশুর উপদেশ বাণীই যে মানব মাত্রেরই অবলম্বনীয়, যিশুই যে সকলের একমাত্র উপায় এই সকল কথা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে ছিলেন। এবং প্রত্যেক কথাতেই বাইবেলের প্রমাণ দেখাইতে ছিলেন। নিজমত স্থাপন করিবার সময়ে বক্তৃতার স্রোতে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বক্তার মুখে অনেক সময়ে প্রতারণা বাক্য বাহির হইতে দেখা যায়। পাদরী সাহেবেরও সেই

অবস্থা ঘটিল। একটী ভুল কথা 'যিশুর বাণী' বলিয়া পুনঃ পুনঃ লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন। স্বচ্ছন্দগতি নবদ্বীপ দাদা ঐ রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার কর্ণে ঐ কথাটী যায়—এবং দুঃখিত মনে পাদরী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া Wrong conclusion (ভুল সিদ্ধান্ত) এই শব্দটী উচ্চারণপূর্ব্বক পুনরায় আপন মনে গমন করিতে থাকেন।

ইংরাজি শব্দটী শুনিবামাত্র সাহেবের চমক ভাঙ্গিল। তখন পাদরী মহাশয় টুল হইতে নামিয়া একজন সঙ্গীকে বলিলেন, "ঐ লোকটীকে ডাকিয়া আনতো।"

নবদ্বীপ দাদাকে ডাকিয়া আনিলে, পাদরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলিতেছিলে ?"

নবদ্বীপদাদা। কৈ সাহেব আমি ত বিশেষ কিছু বলি নাই। তবে তুমি যা বলিয়া বুঝাইতেছিলে তাহাতে তোমার কথায় তোমারই ধর্ম্মে দোষ পড়ে। কিন্তু খ্রীষ্টের উদারতাপূর্ণ বাক্যে সংকীর্ণতা দোষ ঘটে তাই বলিয়াছিলাম।

পাদরী নবদ্বীপ দাদাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কোথায় থাক ?"

নবদ্বীপ। এই পুরীর মধ্যে ঝাজ্‌পিটা মঠ নামক একটী স্থান আছে, সেই খানে।

পাদরী। সে স্থানে আর কে আছে ?

নবদ্বীপ। সাহেব! তুমি যেমন একজন পাদরী, সে স্থানেও আমাদের পাদরী (গুরু) এবং তাঁহার অনুগত অনেক লোক আছেন।

পাদরী। তোমার পাদরীর সহিত আমি দেখা করিতে পারি ?

নবদ্বীপ। কাহারও সহিত দেখা করিতে তাঁহার আপত্তি নাই, তবে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় হইলে ভাল হয়।

পাদরী। কাল বেলা চারিটার সময় আমি তোমার পাদরীর সহিত দেখা করিব।

নবদ্বীপ দাদা আচ্ছা তাহাই হইবে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পরে পাদরী মহাশয় ঝাজ্‌পিটা মঠে গমন করিয়া ছিলেন। বাবাজী মহাশয় পাদরীকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রণাম ও আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। উভয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ বাদ প্রতিপাদ্য করেন। পরিশেষে সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হন। এবং সেই হইতে তিনি আর হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করিতেন না। "চরিত্রসুধা" ২য় ভাগ ৩৯৪ পৃঃ পাদরী সংবাদ নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

নবদ্বীপ দাদার বিদায়

শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয় এক্ষণে কলিকাতার উত্তরে বন হুগলী'র নিকটে রায় প্রসন্নকুমার বাহাদুরের বাগান বাটীতে স্বদলে অবস্থিতি করিতেছেন। রায় বাহাদুর মহাশয় বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা লইয়াছেন। নিত্য বাগানে নানাস্থান হইতে ভক্তগণের আগমন হইতেছে। কীর্ত্তনরঙ্গে আবাল বনিতা বৃদ্ধ সকলেই মোহিত, এই সময় একটি ঘটনা ঘটিল ,—

মহতের ক্রিয়া কলাপ বুঝা দুঃসাধ্য ! তাঁহারা এক কার্য্য করিতে পাঁচ সাত কার্য্য করিয়া থাকেন, সাত আট দিন নবদ্বীপ দাদা বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া কলুটোলা ২৬নং শোভারাম বসাক লেনে পুলীনবিহারী মল্লিক বা কুঞ্জলাল মল্লিকের বাটীতে আছেন। বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা শুনা কি কথা বার্ত্তা কিছুই নাই। মাঝে মাঝে যদি বা বাগান বাটীতে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আগমন করেন কিন্তু দুই ভাইয়ে দেখা শুনা হয় না। বাবাজী মহাশয়ও নবদ্বীপ দাদার কথা জিজ্ঞাসা করেন না। ইহাঁদের এইরূপ অভিমান প্রায় মাঝে মাঝে হইয়া থাকে। ইহাতে যত বিপদ সঙ্গীগণের, সঙ্গীগণ উভয়কেই প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। উঁহারা যদিও নবদ্বীপ দাদার গুরু ভাই হন, তথাপি অনেক সময় উঁহারই উপদেশানুসারে চলিয়া থাকেন, নবদ্বীপ দাদার উপর তাঁহাদের আন্তরিক এতই টান যে, বরং বাবাজী মহাশয়ের কোনও কথা তাঁহারা অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু নবদ্বীপ দাদা যাহা করিতে বলিবেন, তাহা প্রাণপণে আচরণ করিবেন। এজন্য সঙ্গীগণ নবদ্বীপ দাদাকে না পাইয়া সর্ব্বদা দুঃখিত। যেদিন বাগান বাড়ীতে নবদ্বীপ দাদা আসেন সেদিন সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া নানারূপ প্রাণের দুঃখ জানাইতে থাকেন এবং বলেন,—"দাদা! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন ?" নবদ্বীপ দাদা হাসিতে হাসিতে বলেন, "হ্যারে আমি তোদের ছাড়ি নাই বা ছাড়িতে পারিবও না। তবে তোদের গুরুদেব এজন্মের মত আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

বাবাজী মহারাজ এবং নবদ্বীপ দাদার মধ্যে যখন অভিমানের অভিনয় হইত, তখন পরস্পরে এইরূপ ভাষার ব্যবহার চলিত। অর্থাৎ বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপ দাদাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—"কি রকম বাবাজী মহারাজ! কেমন আছেন ? সাধন ভজন বেশ চলিতেছে তো ? নবদ্বীপ দাদা বলিতেন— "আজ্ঞে আপনার কৃপায় এক প্রকার চলিতেছে, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার পাদপদ্মে মতি থাকে। ইত্যাদি।"

কিন্তু সম্প্রতি এই অভিমানের কারণ যে কি, তাহা কেহই অনুসন্ধান করিতে পারিতেছে না। তবে মোটামুটি যতটা অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় ইহার মূল সূত্র শ্রীগুরুতত্ত্ব লইয়া।

নবদ্বীপ দাদা বলেন, "নিতাই গৌরাঙ্গ তনু শ্রীগুরুদেব। গুরুতত্ত্ব সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। গুরুপূজা হইলেই সকলের পূজা হইল। গুরুদেবের সন্তোষে সকলের সন্তোষ।"

"কৃষ্ণে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

গুরুসেবা করিলেই সকলের সেবা করা হইল। গুরুর নাম জপ করিলেই সকল নাম জপ করা হইল ইত্যাদি। দাদার শ্রীগুরু নিষ্ঠা এমনিই॥

বাবাজী মহাশয় বলেন, "যদিও তত্বতঃ গুরুতত্ত্বে এবং ভগবত্তত্ত্বে অভেদ এ কথা সুসত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ বিভিন্ন না রাখিলে উচ্ছৃঙ্খলতা হইয়া থাকে। প্রকাশমান বস্তু মাত্রেই দৃষ্টাংশে এবং তত্ত্বাংশে ভেদাভেদ প্রকাশ স্বীকার না করিলে ধর্ম্মবিপ্লব বা শাস্ত্রের আলাপ করা হয়।

গুরুতত্ত্ব প্রচারের তত্ত্ব নহে। গুরুতত্ত্ব নিজ নিজ ভাবানুসারে অন্তরে। ভগবৎ তত্ত্ব বরং সহজে অনুভবগম্য হইয়া থাকে, কিন্তু গুরুতত্ত্বে বিশ্বাস হওয়া সহজ নহে। গুরুতত্ত্ব অতীব কঠিন তত্ত্ব। তাই জীব যাহাতে সহজে গুরুতত্ত্ব অনুভব করিতে পারে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ সেই উপদেশ করিয়াছেন, যথা—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

"গুরুরূপা সখীর বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে, চামরের বাতাস করিব" ইত্যাদি। গুরুকে ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়কারী ভাবে রাখিয়া সহজে উপাসনা চলিতে পারে, সাক্ষাৎ বুদ্ধিতে তত সহজে হইতে পারে না। অন্তরের ভাব বা বিশ্বাস না জন্মিলে দেখাদেখি বা অনুরোধে আচরণ করিতে গিয়া সেই পথকে কলঙ্কিত করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। আজকাল অনেক স্থানে দেখা যায়, শব্দগত উপাসনা অর্থাৎ কতকগুলি বড় বড় কথা মুখস্থ করিয়া সেই ভাবে চলিতে পারুক আর নাই পারুক সেই পথের পথিক বলিয়া অন্ততঃ লোকের নিকট পরিচয় দেওয়া চাই, সুতরাং পথভ্রষ্ট হইয়া যায়।

ইহাতে নবদ্বীপ দাদা বলিতেন—তবে কি।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাব মন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেব ময়ো গুরুঃ॥"
"গুরুর্ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।"
"ন গুরোরধিকং কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি

বাক্য সকলকে মিথ্যা বলিতে হইবে? গুরুকে ভগবৎ প্রাপ্তির সহায় বলিয়া তাঁহাকে যে ভক্তি বিশ্বাস করা তাহার নাম মারফতদারী ভক্তি। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অভীষ্ট বস্তু লাভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই গুরুভক্তি। ইহাকে ভক্তি না বলিলেও কোন দোষ হইতে পারে না।

গুরুতত্ত্ব এবং ভগবৎতত্ত্ব যে অভেদ, একথা আমি অস্বীকার করিতেছি না, বা যাহারা সেইভাবে উপাসনা করিতেছেন তাহাদিগকেও দোষ দিতেছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, অধিকারীভেদে আচরণ দরকার, কারণ মহাজনগণ বলিয়াছেন ;—

"অধিকারী নহে চায় ভাব আচরিতে।
অল্পকালে বিনাশ হয় হাসিতে খেলিতে॥"

কলির জীব কোমলশ্রদ্ধ এবং অবিশ্বাসী। আজ পর্য্যন্ত রাধাগোবিন্দ বা নিতাই গৌরকেই জগতের লোকে মানিতে চায় না। ইহার উপর যদি আবার নিজ নিজ গুরুকে অবতার খাড়া করা হয়, তবে জগতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করা হইবে না কি? এ সব প্রচার করা কখনই উচিত নহে।"

"মোট কথা নবদ্বীপদাদার ইচ্ছা, যেরূপ রাধাগোবিন্দ মিলিত বপুঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু, এবং বলরাম অনঙ্গ মঞ্জরী মিলিত বপুঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, সেইরূপ নিতাই গৌরাঙ্গ মিলিত বপু বাবাজী মহাশয় একথা সাধারণে প্রকাশ করা এবং সেই ভাবে আচরণ করা। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয় ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। উভয়ের বাহিক মনোমালিন্যের কারণই এই। এই লইয়াই উভয়ের বাদানুবাদ—এই লইয়াই উভয়ের মতভেদ।

একদিন শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয় উপরি উক্ত রায় বাহাদুরের বাগান বাটীতে বসিয়া আছেন, কোন কথা বার্ত্তা নেই, হঠাৎ ঠিক বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গীগণ অনেক প্রকার অনুসন্ধানেও কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারায় অগত্যা বিশেষ জেদ করিয়া বাবাজী মহাশয়কে ঐরূপ বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ইনি বলিলেন,—"যে সমস্ত স্বতন্ত্রতার জন্য আমি সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও ভবেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিলাম, আবার সেইরূপ স্বতন্ত্রতা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাদের কথা মনে হইলেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে; তাহারা এক একজন মহাশক্তি ধারণ করিত। তাহাদের সহিত তুলনায় বর্ত্তমান সঙ্গীদিগকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় বোধ হয়।

ক্রমশঃ

২৪শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা } ভক্তি { মাঘ মাস ১৩৩২

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

প্রার্থনা

হে দীনশরণ, এ দীনে স্মরণ,
করহে করুণা করিয়া।
আর কতকাল, কাটাইব কাল
ধূলা খেলা বসে মাতিয়া ॥

লীলাময়! কত রকম খেলাই যে দিবানিশি খেলিতেছ, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি কোন্ ছার, বুঝিবা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও অনন্তকাল ধরিয়া তোমার লীলাখেলার অন্ত করিতে পারে না। প্রাণে আশা করি না, হয় ত প্রার্থনাও করি না তথাপি তুমি তোমার প্রিয় ভক্তবৃন্দের দ্বারা কত রকম ভাবে অলক্ষিতে যে কত যত্ন আদর পাঠাইতেছ, তাহার সীমা নাই। এক একবার নিজের যোগ্যতার বিষয় এবং তোমার প্রেরিত যত্ন আদর, মান সম্ভ্রমের বিষয় তুলনা করিতে যাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে, কি ভাবে কি হইল। যত ভাবি, ততই আত্মহারা হইয়া শুধু তোমারই জয় দিতে ইচ্ছা হয়। জানি না, আমার এই ভাব চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে কি না ;

দয়াময়! ভুলাইয়া দিয়া আর অশান্ত হৃদয়কে শান্তিলাভে বঞ্চিত করিও না। আমি বেশ বুঝিতেছি, যতক্ষণ তোমার ভালবাসায় প্রাণ বিভোর থাকিবে, ততক্ষণ ভোগ ঐশ্বর্য্যাদির দ্বারা যতই ভুলাইতে চেষ্টা করিবে কিছুতেই ভুলিব না, বরং প্রাণে প্রাণে এই বিশ্বাসই সুদৃঢ় হইবে যে, এই মান-সম্ভ্রম, এই খ্যাতি-প্রতিপত্তি ইহার কিছুই এই রক্ত মাংসের দেহের নয়, এ সমুদায়ই তোমার। কৃপাকরিয়া এই করিও, যেন যাহা পাই তাহাই অকপট প্রাণে তোমার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া তোমার আদেশে ভোগ করিতে পারি। যেন অভিমান আসিয়া, তোমার

ভাব ছাড়া না করে। কর্ত্তৃত্বাভিমান আসিয়া তোমার ভাবের বিমুগ্ধতা তোমার বিশ্বপ্রেমিকতা, তোমার অপার অসীম আত্মহারা আনন্দভাব যেন ভুলাইয়া না দেয়। সাধু গুরু মুখে শুনিয়াছি, অভিমানরূপ মহাব্যাধিতে অধ্যাত্মদেহ জীর্ণ শীর্ণ হয়, এবং এ রোগের ঔষধও নাকি তোমার করুণা। তাই কাতর প্রাণে প্রার্থনা তুমি আমাকে সর্ব্বদার জন্ম এই অভিমানরূপ মহাব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করিও।

বলিয়া রাখি, যদি আমাকে অভিমানের কোলে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাও, আমি কিন্তু তাহা থাকিতে দিব না, যত দিন না আমাকে অভিমানের কোল হইতে তুলিয়া তোমার চরণ প্রান্তে স্থান দিবে, ততদিন প্রাণের ব্যাকুলতা তোমাকেই জানাইব, প্রার্থনা করিয়া করিয়া তোমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিব। দিন থাকিতে বলিয়া রাখি, আমাকে তোমার করিয়া, তোমার ভাবে, তোমার প্রেমে, তোমার গুণগানে মাতাইয়া রাখ, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমার জয় গান করিব। জয় দয়াময় দীনবন্ধু। এবার এইটাই প্রার্থনা।

দীন শ্রী—

সাফল্য

(শ্রীযুক্ত নবীনচাঁদ দত্ত লিখিত)

মেঘ চলেছে উদাস প্রাণে ধরার পানে চেয়ে চেয়ে।
বজ্র বিঁধে বক্ষে তাহার অশ্রু বহে চক্ষু বেয়ে॥
যেথা হ'তে জন্ম তাহার, পারবে কি সে যেতে আবার
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ঠাঁই পেতে আজ যায় গো ধেয়ে।
বিফল নয়গো জীবন তাহার, না পায় যদি মা'র স্নেহ ধার,
কেঁদেই জনম সফল তাহার (সবে) জুড়াবে তার অশ্রু পেয়ে॥

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রদাস প্রসঙ্গ

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট লিখিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই পরম ভাগ্যবান সুরেন, ভবেন ও দেবেনের কথা প্রায়ই বাবাজী মহাশয়ের মুখে শুনা যাইত। উহাতে অনুমান হয়, এই মত ভেদ লইয়া বহুদিন হইতেই ইহাঁদের বাদানুবাদ চলিতেছিল। সম্প্রতি যেন নবদ্বীপ দাদার নিজ মত সংস্থাপনের ইচ্ছাটী একটু প্রবল হইয়া পড়িল। কাজেই দাদা ভাইয়ে কথাবার্ত্তা নাই। ইহাঁদের পরস্পরের এই ভাবটী সঙ্গীগণকে বড়ই ব্যথা দিতে লাগিল। সঙ্গীগণ একবার বাবাজী মহাশয়কে বলিতেছেন, "আমাদের দাদাকে ভাল করিয়া দিন।" আবার নবদ্বীপ দাদাকে বলিতেছেন,—"দাদা! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি বাবাজী মহাশয়ের সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করুন।" উত্তরে বাবাজী মহাশয় বলেন,—"আমি কি করিব? যে নবদ্বীপ আমার সুখে সুখী ছিল, সে আজ আত্মসুখে সুখী হইয়াছে, অর্থাৎ এখন তার ইচ্ছা যে, আমাকে একটা অবতার খাড়া করে, সুতরাং আমার সে নবদ্বীপ নাই।" আবার নবদ্বীপ দাদা বলেন,—"আমি কি করিব? যে দাদা আমাদের রসময় বিগ্রহ পরম করুণ, কোমল হৃদয়, বালকবৎ সর্ব্বদা আনন্দময় ছিল, সে আজ মহা গম্ভীর, মর্য্যাদা-বিধি-নিষ্ঠা পরায়ণ পুরুষ, পরম বৈষ্ণব হইয়াছে, কাজেই এখন আর আমার সে দাদা নাই। এখন সে গৌরহরি দাস মহান্তের চেলা যাদব দাস বাবাজী।"

এইরূপে কয়েকদিন যায়, একদিন রামদাস দাদা, পুলিন দাদা, নিত্য স্বরূপ দাদা,—ললিতাদাসী দিদি প্রভৃতি কয়েকজনে পরামর্শ করিলেন যে, বাবাজী মহাশয়কে বিশেষ জেদ করিয়া ধরিলে বোধ হয় অবশ্যই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। তখন রামদাস দাদা বলিলেন;—"দেখ আমি মুখে কিছুই বলিতে পারিব না, তবে যদি আমাকে বলিতে হয়, আমি গানের দ্বারা বলিতে পারি।" সকলেরই সেই যুক্তি স্থির হইল। বেলা অনুমান সাতটার সময় ইহাঁরা কয়েকজন মাত্র বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসিয়া ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ সকলেই নীরব নিস্তব্ধ। এই সময় প্রেমময় রাম দাদা কাতর কণ্ঠে—আর্ত্তস্বরে গান ধরিলেন;—

'নবা' কি তোর কেউ নয়রে 'চরণ'।
একদিন নব অনুরাগে, বাড়ালে সোহাগে,
এখন কেন ভিন্ বাস হে এমন ॥"
(ঠিক যেন পরের মতন)
(তোমার ভাব কিছু বুঝ্‌তে নারি)
(আমরা যে আর সইতে নারি)
(মরি মরি প্রাণে মরি) ইত্যাদি—

চোকের জলে সকলের বুক ভাসিয়া যাইতেছে। এক একবার রামদাদার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। হঠাৎ একেবারে অধৈর্য্য ভাবে রাম দাদা বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এতক্ষণে বাবাজী মহাশয়ের হৃদয় দ্রবিল—চোখে জল আসিল, গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন "আচ্ছা আমাকে কি করিতে হইবে বল।"

পুলীন দাদা।—আপনি আদেশ করিলে আমরা নবদ্বীপ দাদাকে লইয়া আসি।

বাবাজী মহাশয়।—সে কি এ স্থানে আছে?

পুলীন দাদা।—আজ্ঞে না, তিনি আমাদের বাটীতে আছেন।

বাবাজী মহাশয়।—সেতো অনেক দূর।

পুলীন দাদা।—আজ্ঞে, আদেশ হইলে—আমি গাড়ী করিয়া এখনিই তাহাকে লইয়া আসিব।

বাবাজী মহাশয়।—কর, যাহা তোমাদের ইচ্ছা, আমার কোনই আপত্তি নাই।

তখন পুলীন দাদা এবং নিত্য স্বরূপ দাদা অতি দ্রুতগতি একখানি গাড়ী করিয়া—নবদ্বীপ দাদাকে আনিতে গেলেন।

নবদ্বীপ দাদা প্রথমে আসিতে আপত্তি করিলেন; পরে ইহারা বিশেষ জেদ করিলে বলিলেন,—"চল, যাইব বটে, কিন্তু বিপরীত ফল হইবে।" এই বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গীগণের মনে কতই আশার সঞ্চার হইতেছে। বহুদিন পরে আজ তাহাদের দুটি প্রাণ একত্র হইবে, কতই না আনন্দ হইবে ইত্যাদি সঙ্কল্প বিকল্প হইতেছে। এই সময় পুলীন দাদা ও তাহার দাদা কুঞ্জলাল মল্লিক এবং নিত্যস্বরূপ দাদা, নবদ্বীপ দাদাকে সঙ্গে করিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই নবদ্বীপ দাদা প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও প্রতি প্রণাম করিলেন। প্রেমের স্বাভাবিক স্বভাবই বক্র। উভয়েই নীরব।

উপস্থিত সকলে একবার নবদ্বীপ দাদার মুখ পানে তাকাইতেছেন, আর একবার বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইতেছেন। কিন্তু কেহই কিছু বলিতে সাহস করিতেছেন না; সকলেই নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় একটু উদাস ভাবে বলিলেন,—"আমার নিকটে তোমার কিছু বলিবার আছে কি?"

নবদ্বীপ দাদা।—আপনি সম্প্রতি যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই ভাবের মূর্ত্তির সঙ্গে আমার কোনও কথা ব্যবহার নাই। আমি যে রসময় বিগ্রহের নিকটে বিক্রিত হইয়াছি, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ। যখন আপনাতে তিনি অবস্থান করিবেন, তখন আমার যাহা বলিবার হয় তাহা বলিব।

বাবাজী মহাশয়।—আমিতো জানি না আমি এখন কিরূপে আছি। মোট কথা সম্প্রতি আমার সহিত তোমার কোন কথা বার্ত্তার প্রয়োজন আছে কি?

নবদ্বীপ দাদা—কিছুই নয়, তবে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি যাঁহার চরণে মাথা বিক্রয় করিয়াছি, তাঁহাতে রতি মতি থাকে।

তখন বাবাজী মহাশয় রামদাস দাদাকে, পুলীন দাদাকে, নিত্যস্বরূপ দাদা প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া—বলিলেন;—"কেমন, তোমরা আর আমাকে কি করিতে বল?"

সকলেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে অবস্থান করিতেছেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপ দাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমি আর কি বলিব? যখন আমার এই দেহের সহিত তোমার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, তখন আর আমার সহিত এ দেহে তোমার দেখা শুনা হইবে না।

তোমার যে স্থানে থাকিয়া যাহা করিতে ভাল লাগে, তাহাই করিতে পার।" নবদ্বীপ দাদা "যে আজ্ঞে" বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক সে স্থান হইতে নীচের তলায় গিয়া বসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গীগণ অনেকেই গিয়া নবদ্বীপ দাদার কাছে বসিলেন। তাঁহার কিন্তু সমান অবস্থা, কোনই বিষাদ নাই। সঙ্গীগণের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ আনন্দময় ব্যবহার করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় নীচে আসিতেছেন জানিতে পারিয়া নবদ্বীপ দাদা বলিলেন;— "দাদা বলিয়াছেন এ জন্মে আর আমার সহিত দেখা হইবে না, অতএব এস্থানে আর অধিক সময় থাকা উচিৎ নয়, কারণ যদি অসাবধানতা বশতঃ চোকে পড়িয়া যায়, তবে তাঁহার কথা মিথ্যা হইবে, সুতরাং আমি চলিলাম।" এই কথা বলিতে বলিতেই সে স্থান হইতে দ্রুতগতি চলিয়া গেলেন।

ইহার পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন।—দুইমাস পরে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু কি অপূর্ব্ব শক্তি! শয়নে স্বপনে এক মাত্র 'দাদা' ছাড়া অন্য বুলি ছিল না। এক একদিন নিজের শুশ্রূষাকারিদিগকে বলিতেন;— "তোরা তাড়াতাড়ি মিশ্রির সরবত করিয়া দে, ঐ যে দাদা আমাকে দেখিতে আসিতেছে। বড়ই গরম। কষ্ট হইবে।" বলিয়া মিশ্রির সরবত খাওয়াইতেন। এমন কি কোন কোন দিন এক একজনকে প্রত্যক্ষ্য পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন। এইরূপে কয়েকদিন থাকিয়া জগতে শ্রীগুরুদেবের প্রতি বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ভাবের আদর্শ দেখাইয়া রথ দ্বিতীয়ার দুই দিন পূর্ব্বে অমাবস্যার দিন সকলকে বলিলেন, "আমাকে ভ্রমর ঘাটের উপরে লইয়া চল, আমি যমুনা মাইকে দর্শন করিব।" সকলে তাহাই করিলেন। তখন তিনি করজোড়ে শ্রীযমুনাকে প্রণাম বন্দনা করিয়া নাম করিতে করিতে আমাদের প্রাকৃত চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে অবিচ্ছেদে তাঁহার অভিষ্ট বস্তু উপভোগ করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপ দাদার অলৌকিকী শক্তি ও অভাবনীয় কার্য্য কলাপ দর্শনে শ্রীবৃন্দাবনবাসী অনেক লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উহার বিরহ যেন তাঁহাদের অসহ্য হইয়া পড়িল। সকলেই হা হুতাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হায়রে আমরা এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ পাইয়াও নিজ ব্যবহার বা বুদ্ধির দোষে অতি অল্প দিনেই বঞ্চিত হইলাম। যতদিন পর্য্যন্ত ইনি বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন, ততদিন যেন বাবাজী মহাশয় সর্ব্বদার তরে এস্থানে উপস্থিত ছিলেন। আজ আমরা একজনের জন্য দুইজনের বিরহ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছি।"

যাহারা নবদ্বীপ দাদার সহিত অন্ততঃ দুই একদিনও সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠেই একথা স্বীকার করিবেন যে, নবদ্বীপ দাদাকে পাইবামাত্র সকল অভাব মিটিয়া যাইত। এমন কি বাবাজী মহাশয়ের বিরহে একজন হয়ত খুবই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া কেবল অনবরত কান্নাকাটী করিতেছেন, বাবাজী মহাশয়ের কোন গণকে দেখিলে তাঁহার বিরহজ্বালা আরও দ্বিগুণতর প্রবল হইতেছে; কিন্তু যেমন নবদ্বীপ দাদার দর্শন পাইলেন, অমনি তাঁহার সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আর তাঁহার হৃদয়ে কোনও দুঃখ নাই। হায় হায় এ হেন মহারত্ন আজ আমাদের প্রাকৃত চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত। ইহাপেক্ষা আর আমাদের দুর্দ্দৈবের কথা কি আছে?

যাও দাদা, আনন্দময় নিত্য ধামে যাও সেখানে তোমার প্রাণারাম রাধারমণকে

লইয়া মনোসাধে আনন্দ কব,—কিন্তু মনে রাখিও, আমাদেব বলিয়াছিলে "আবাব দেখা হইবে"—তোমাব কথা ত মিথ্যা হইবাব নয়—তাই বলি সেদিন আমাদের কবে হইবে।

(শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত)

সফলস্বপ্ন

(শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিত)

(২)

সফল স্বপ্নেব কথা অনেকেই জানেন। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা বহুকাল পবে সংঘটিত হইয়াছে, সচবাচব এইরূপই দেখা যায। আমবাও গতমাসে তাহার একটা উদাহবণ দিয়াছি। ঘটনা বহু পূর্ব্বে ঘটিযাছে, কিন্তু সে অতীত ঘটনা ঘুণাক্ষরেও অবগত নহে, এমন ব্যক্তিও কখন কখন স্বপ্নে তাহা প্রত্যক্ষ করার উদাহরণ বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায। প্রসিদ্ধ গোপাল ভট্ট গোস্বামীব স্বপ্ন দর্শন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহবণ।

গোপাল ভট্ট তখন মাত্র একাদশ বর্ষীয় বালক, মা বাপেব আদবের ধন, কিন্তু সেই বয়সেই তিনি পণ্ডিত-পূজিত।

ইঁহার গৃহে একদিন এক স্বর্ণ-নিন্দিত-কান্তি উদাসীন উপস্থিত হইলেন। গোপালেব পিতা অতি শ্রদ্ধা সহকাবে এই উদাসীনকে আপন গৃহে রাখিলেন। সকলেবই শ্রদ্ধা তৎপ্রতি পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বালকেব তাঁহার প্রতি প্রীতি ছিল অসাধাবণ। দর্শন মাত্রে গোপাল এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর চরণে আত্মসমর্পণ কবিয়াছিলেন। আত্মসমর্পণ উপযুক্ত আধারেই হইয়াছিল, এই সন্ন্যাসী অন্য কেহ নহেন—শ্রীগৌবাঙ্গ।

কুটিনাটি শূন্য বিকাব বিবর্জিত বিশুদ্ধ আত্মসমর্পণ প্রেমীকে প্রণয়াস্পদের সহিত একাত্ম করিয়া তুলে, আর তাহাতে প্রেমীকেব কোন কথাই প্রণয়াস্পদেব প্রেম প্রেক্ষণেব অনায়ত্ত থাকে না।

শ্রীগৌবাঙ্গ যে সামান্য সন্ন্যাসী নহেন, তাহা গোপাল বুঝিয়াছিলেন, ইনি কে তবে? শ্রীবিষ্ণুব সহস্রনাম স্তোত্রে "সন্ন্যাসকৃৎ" বলিয়া কি ইঁহারই কথা বলা হয় নাই? গোপাল মনে বুঝিলেন—হাঁ তিনিই। সে নির্ম্মল চিত্তে আরও

ফুটিয়া উঠিল, তখন গোপাল বুঝিলেন—ইনিই সর্ব্বমূলাধার। এই ভাবে বিভাবিত হইয়া গোপাল তন্ময় চিত্তে সতত সেবা করিতে লাগিলেন।

গোপাল সতত তাঁহার পাশে বসিয়া থাকিতেন। কত কি মনে হইত, আর আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিত। কিন্তু চাহিতে চাহিতে তাঁহার কখন বা ভাবান্তর ঘটিত, মনে হইত, যদি প্রভুর নাগর বেশ হইত তবে না জানি কত সুখই হইত সে মূর্ত্তি দেখিয়া; সে রূপসুধা নেত্রে পান করিয়া করিয়া আরো পান করিতে চাহিত। কিন্তু এ সন্ন্যাসী বেশ—এই ভিখারী বেশ কি এই জগতপতির যোগ্য? এ কি সাজে? না না সাজে না, নিশ্চিতই সাজে না।

গোপাল এইরূপ ভাবিতেন, ভাবিয়া অতৃপ্ত নেত্রে তাঁহাকে হেরিতেন, তখন সন্ন্যাস বেশ তাঁহার চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিত। একদিন গোপাল এইরূপ ভাবিতে-ছেন, ভাবিতে ভাবিতে বিবশ প্রায় হইলেন। যেন, তখন অকস্মাৎ নিদ্রা আসিয়া তাঁহার নয়ন আবরণ করিয়া দিল। তদবস্থায় গোপাল এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন, দেখিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ তথায় নহেন—বাঙ্গালা মুলুকে—নবদ্বীপে। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তখন দেখিলেন যে, তিনি বিচিত্র নাগরবেশে অনুচর বেষ্টিত হইয়া নগরের পথে ভ্রমিতেছেন। তখন তাঁহার অঙ্গ কান্তিতে দিক উদ্ভাসিত হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, দেখিলেন তিনি শ্রীবাস-গৃহে, শ্রীবাসগৃহে ভগবানকে বেষ্টন করিয়া ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন। সে নৃত্যের মাধুরীইবা কত। গোপালের তাহাতে লোভ হইল, তিনি যেমন নৃত্য করিতে যাইবেন, অমনি সে সুখ স্বপ্নের সহিত জাগ্রত হইলেন।

গোপালের আশা স্বপ্নেই পূর্ণ হইল—যে নাগর বেশ তিনি দেখেন নাই, স্বপ্নে তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলেন।

সফল স্বপ্নের ইহা আর একটী উদাহরণ। ক্রমে ক্রমে আমরা এই ভাবের আরও উদাহরণ পাঠকগণকে দিবার চেষ্টা করিব।

ভাগ্যবান চোর

(শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত।)

শচী-জগন্নাথের নয়নেরমণি নিমাই, কোটী কন্দর্পের লাবণ্য লইয়া নবদ্বীপে বাল্যরসে বিভোর। তাঁহার হৃদয় ভুলান, মন মাতান রূপ-সুধা নবদ্বীপবাসীরা

নয়ন ভরিয়া পান করিতেছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব যুগ্ম ভ্রূ, গৌরকান্তি, অরুণ অধর যাঁহারই দৃষ্টি পথে পতিত হয় তিনিই যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া ঐ সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত কাঁচাসোণাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্‌গ্রীব হন। নিমাই যখন পাদচালনা করেন তখন যেন মনে হয় তাঁহার সুকোমল পদকমল হইতে রক্তকণা ক্ষরিত হইতেছে। তাহার উপর শচীমাতা তাঁহার বড় সাধের নিমাইকে নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন। অসংখ্য তারকারাজি বেষ্টিত শারদীয় চন্দ্রিমার ন্যায় নিমাইএর নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র শোভা পাইতেছে। বালকোচিত চাঞ্চল্যে নিমাই নবদ্বীপ পল্লী মুখরিত করিয়াছেন। পাড়া প্রতিবেশী-গণের গৃহে তাঁহার দারুণ দৌরাত্ম্য। সুযোগ পাইলেই দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর নবনীত প্রভৃতি পরের গৃহ হইতে অপহরণ করিয়া আপনার ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসী ক্ষুধার প্রশমন করেন। একদিন নানালঙ্কার বিভূষিত নিমাইচাঁদ নবদ্বীপ নগরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দুই জন চোর বালকের অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার দর্শনে লুব্ধচিত্ত হইয়া শিশুকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া নিজগৃহাভিমুখ গমন করিল। পাছে নিমাই ক্রন্দন করেন তজ্জন্য তাঁহার সান্ত্বনার্থে সন্দেশাদি ক্রয় করিয়া শ্রীহস্তে দিয়াছে, নিমাইও সন্দেশ খাইতে খাইতে সহাস্যবদনে স্কন্ধদেশে আরূঢ় হইয়া চলিয়াছেন। বিপুলনগর নবদ্বীপ কে কাহাকে চিনে? সুতরাং চোর দুইজন সকলের সন্দেহ দৃষ্টি এড়াইয়া স্বচ্ছন্দে গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

এদিকে শচীমাতার গৃহে গভীর নিরানন্দ। তাঁহাদের হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি সোণারচাঁদের অদর্শন তাঁহাদিগকে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিবেশীর প্রতি গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানেও, যখন নিমাইচাঁদের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তাঁহাদের শোকাবেশ দ্বিগুণিত হইয়া দারুণ আর্ত্তনাদে উক্ত পল্লী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। প্রতিবেশীরাও তাঁহাদের গভীর দুঃখে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য আগমন করিয়াছেন। সকলেরই মুখে দারুণ নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তার রেখাপাত হইয়াছে। কলহাস্যমুখরিত সরস পল্লী আজ শ্মশানের গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া গভীর শোকের চিহ্ন সর্ব্বত্র প্রকটিত করিতেছে। লীলাময়ের লীলাই এক অদ্ভুত।

এদিকে চোর দুইজন মনে মনে অলঙ্কারের অংশ বণ্টন করিতে করিতে বৈষ্ণব মায়ায় বহুপথ অতিক্রম করিয়া স্বভবন জ্ঞানে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতেই আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নিমাইকে স্কন্ধদেশ হইতে নামাইয়া দিল। নিমাই সস্মিতবদনে

নাচিতে নাচিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জনকজননীর ক্রোড়ে ঝাপাইয়া পড়িলেন। শচী-জগন্নাথ ও প্রতিবেশীগণ তাঁহাদের হারাধনকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহাদের অসংখ্য মুখ চুম্বনে নিমাইএর সুকোমল গণ্ডদেশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল! বিষাদম্লান ভবন ক্ষণকালের মধ্যে আনন্দ কোলাহল ও হরিনাম ধ্বনিতে আনন্দ নিকেতন হইয়া উঠিল। চোর দুইজন এতক্ষণে তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সত্বর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিল।

চোরদ্বয় মহা ভাগ্যবান। অনন্ত যাঁহাকে অনন্ত শিরে ধারণ করিয়া সৌভাগ্য জ্ঞান করেন সেই সর্ব্বশক্তিমান অন্তর্য্যামী পরমদয়ালু বিপ্র শিশুরূপী ভগবানকে স্কন্ধে ধারণ করা কি কম সৌভাগ্যের কথা। ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাহাদের সৌভাগ্য দর্শনে গাহিয়াছেন—

"পরমার্থে দুই চোর মহা ভাগ্যবান।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"অহো বকী যং স্তন কালকূটং
জিঘাংসযাঽপায়য়দপ্য সাধ্বী
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥"

বকাসুর ভগিনী পুতনা যখন বধার্থ বিষাক্ত স্তন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইয়া যশোদামাতার অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন সামান্য অলঙ্কার লুব্ধ চোরদ্বয়েই বা কেন সুবলাদি সখানুরূপ গতিপ্রাপ্ত হইবে না? ব্রজের প্রাণধন কালাচাঁদও যে মহা চোর। তাঁহারও ত ননীচোরা, মনোচোরা ইত্যাদি খ্যাতি। এই "চোরের উপর বাটপাড়ি" লীলা সুধী ভক্তবৃন্দের বড়ই চিত্তাকর্ষক ও আনন্দ বর্দ্ধক হইবে বিবেচনায় নিজের সামর্থ্যমত যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া উক্ত চোরদ্বয়ের সৌভাগ্য প্রাপ্তির দুরাশা নিজ হৃদয়ে পোষণ করতঃ অদ্য এইস্থানেই লেখনীর বিরাম দিলাম।

ভক্ত-কথা

(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

ভক্তি, শুদ্ধা ও মিশ্রাভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা মিশ্রিতা হইলে উহার নাম মিশ্রা, এবং উহাদের প্রভাব বিরহিতা হইলেই তাহার নাম শুদ্ধা ভক্তি। ইন্দ্রিয়াদি রূপ ক্ষেত্রই উক্ত শুদ্ধা ভক্তির উৎপত্তিস্থান। ভগবদ্ বিষয়ে অনুকূলতাই ঐ ভক্তির মূল প্রাণ। লৌহ যেমন স্পর্শমণি স্পৃষ্ট হইয়া স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি প্রাকৃত জনও এই ভক্তিযুক্ত হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

সাধনাবস্থায় ভক্তির ক্লেশঘ্নী ও শুভদা নামক গুণদ্বয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ক্লেশ পাঁচ প্রকার,—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। যাবতীয় পাপ এই পাঁচটী ক্লেশেরই অন্তর্ভুক্ত। শুভ বলিতে বিষয় বিতৃষ্ণা, ভগবদ্বিষয়ক-তৃষ্ণা, কৃপা, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, সাম্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, অমানিত্ব এবং মানদত্ব প্রভৃতি সদ্গুণাবলীকেই বুঝাইয়া থাকে।

উল্লিখিত লক্ষণগুলির দ্বারা সাধক ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবদ্-বিষয়কতৃষ্ণার ফলে ভক্তিবিষয়ক শাস্ত্রাদিতে সাধক ভক্তের দৃঢ় প্রত্যয় বা শ্রদ্ধার প্রকাশ হইয়া থাকে। এই শ্রদ্ধার প্রভাবেই শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান সাধকের সাদর স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। এই সময়ে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া সাধক ভক্ত সদাচার ও ভজন্ ক্রিয়াদি বিষয়কে আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে নিঃসন্দেহ হইতে থাকেন।

ভজন ক্রিয়া দুই প্রকারের হইয়া থাকে, নিষ্ঠিতা ও অনিষ্ঠিতা। শ্রীগুরু-দেবে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় গ্রহণ না হইলে অর্থাৎ উহার মধ্যে কিছুমাত্রও নিজের স্বাধীনভাব থাকিলে বা বিশিষ্টতা রক্ষা করিলে তাহার পক্ষে নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া সম্ভবপর হয় না। অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়াই প্রায়শ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার আরম্ভে একটা নূতন উৎসাহযুক্ত উদ্যম থাকে। কিন্তু যেমন সদ্য পাঠাভ্যাস নিযুক্ত বালকের, অর্থাৎ যে সদ্য পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছে, বর্ণ পরিচয় মাত্র হইয়াছে, কিন্তু শব্দার্থবোধ ঘটে নাই তাহার যেমন অধীত পুস্তকের অর্থবোধ না হওয়ায় পাঠের উদ্যমে মাঝে মাঝে শিথিলতা উপস্থিত হইয়া থাকে,

তদ্রূপ অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া নিরত সাধকের ভজন ক্রিয়ারও কখন কখন শৈথিল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উক্ত ভজন ক্রিয়া নিরত ভক্তের সাধনাবস্থায় মনে নানাবিধ প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে। তিনি কখন মনে করেন আমি সপরিবারে ভগবৎ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া গৃহে থাকিয়াই সুখে কাল যাপন করিব, অথবা সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা আপনাকে কৃতার্থ করিব?' কখন ভাবেন, 'এ সংসারে মৃত্যুত তৃণাচ্ছাদিত অলক্ষ্য গর্ত্তের মত রহিয়াছেই, কখন তাহাতে পাদ সংযোগ ঘটিয়া উহার মধ্যে গিয়া পড়িব তাহার স্থিরতা নাই, অতএব এখনই সংসার ত্যাগ করা উচিত'। আবার কখন চিন্তা করেন, 'অতৃপ্তাবস্থায় সংসার ত্যাগ করিলে ত্যাগের পরও সংসারকেই চিন্তা করিতে হয়, সেরূপ অবস্থায় জীবনান্ত ঘটিলে শাস্ত্রানুসারে নরকগতিই হইয়া থাকে, অতএব আমার ত্যাগের কাল উপস্থিত হয় নাই, এখন সংসারের মধ্যেই ভগবৎ স্মরণাদি সহ জীবিকা নির্ব্বাহ করি, পরে বৈরাগ্যের উদয় হইলে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া অষ্ট প্রকার ভজন করা যাইবে।' কখন কখন 'ভক্তির বহুবিধ ভজনাঙ্গ সকলের কোন কোন অঙ্গ সাধন করিব,' প্রভৃতি প্রশ্নেরও উদয় ঘটিয়া থাকে। এই সকল সংশয়ের মীমাংসার জন্যও সাধকের নিকট শ্রীগুরুদেবের আবশ্যকতা ঘটিয়া থাকে।

তদনন্তর শ্রীগুরু প্রসাদে ক্রমে ক্রমে ওই জাতীয় সংশয়গুলির মীমাংসা হইতে হইতে ক্রমে ত্যাগেই নিশ্চয়তা জন্মে, এবং ত্যাগের চেষ্টায় সময়ে সময়ে জয় পরাজয়ও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বিষয় ত্যাগে পরাজয় ঘটিলেও সে বিষয় নিতান্ত অনাসক্তির সহিত ভোগ করা হয়। ভজন ক্রিয়ার এই অবস্থার নাম বিষয় সঙ্গরা। এই সময়ে নানাবিধ সাংসারিক বিঘ্নবশতঃ সাধক আপনার ভজন নিয়ম সম্যকভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না, এই অবস্থাকে নিয়মাক্ষমা ভজনক্রিয়া বলে।

যাহা হউক ভজননিরত সাধক ক্রমে অন্যান্য ভক্তের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। সেই অবস্থায় অন্য ভক্তের নিকট হইতে সেবা পূজা প্রতিষ্ঠাদি লাভ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ঐ সকল সেবা পূজা প্রতিষ্ঠাদি ভক্তের কাম্য না হইলেও কোন কোন সাধক ওই সকলের তরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়া যান, এবং তাহার ভজন ক্রিয়া অসম্পূর্ণ ই থাকিয়া যায়।

ভজননিষ্ঠ সাধক ভক্তের যাবতীয় অনর্থ ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি লাভ করিতে

থাকে। অনর্থ বলিতে ক্লেশ এবং অপরাধাদিই বুঝায়। ভক্তির ক্লেশঘ্নী গুণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাপ এবং পাপ প্রবৃত্তি ক্লেশপর্য্যায় ভুক্ত। অপরাধী সম্বন্ধে দুইটি বিভাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—সেবাপরাধ এবং নামাপরাধ। প্রধানতঃ সেবাকার্য্যে অনাচারই সেবাপরাধ। নামাপরাধের দশটি প্রকার আছে—বৈষ্ণব নিন্দা, বিষ্ণু ও শিবে পৃথকভাবে ঈশ্বরবুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবে মানববুদ্ধি, বেদপুরাণাদি শাস্ত্রনিন্দা, শ্রীহরিনামের অর্থ কল্পনা, এবং কুব্যাখ্যা, নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, নামের সহিত অন্য শুভকর্ম্মের তুলনা, অশ্রদ্ধজনে নামের উপদেশদান, এবং নামমাহাত্ম্যে অপ্রীতি। ভজনক্রিয়ার দ্বারা এবম্বিধ সকল অপরাধেরই নিবৃত্তি সাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং ভজননিরত সাধককেই নিরপরাধ বলা যায়। শ্রীভাগবদ্ধর্ম্মের অণুমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও আর তাহার ধ্বংশ নাই। নামাদি মন্ত্রসকল জপমাত্রেই সিদ্ধিদ হইয়া থাকে।

এই যে অনর্থ নিবৃত্তির কথা বলা হইল, ভজনক্রিয়ার দ্বারা একদেশবর্ত্তিতা সাধিত হয়, ওই ভক্তিনিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে উহা বহুদেশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। রতি জন্মিলে প্রায়িকী প্রেমলাভে পূর্ণা এবং শ্রীভগবচ্চরণলাভে আত্যন্তিকী আখ্যা পাইয়া থাকেন। অর্থাৎ ভজনের ফলে বহুদেশবর্ত্তি অনর্থনিবৃত্তি ঘটে এবং ভক্তিতে নিষ্ঠা জন্মে, নৈষ্ঠিক ভজনের ফলে বহুদেশবর্ত্তি অনর্থ নিবৃত্তি এবং রতিলাভ হয়, জাতরতি ভজনের ফলে অনর্থনিবৃত্তি প্রায় সম্পূর্ণ হয় এবং পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম প্রাপ্তি হয়, প্রেমময় ভজনে পূর্ণ অনর্থনিবৃত্তি সাধিত হইয়া শ্রীভগবচ্চরণ লাভ ঘটাইয়া থাকে এবং তখন অনর্থের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ আর কোনরূপ অনর্থ উৎপত্তির ভয় থাকে না।

ভজননিরত নৈষ্ঠিক ভক্তের কতকগুলি বিঘ্নের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে, যথা—লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ। কীর্ত্তন, স্মরণ ও শ্রবণের কালে ভক্তের যে নিদ্রার উদ্গম হইয়া থাকে উহার নাম লয়, ওই কালে ব্যবহারিক বিষয়ের সম্পর্কই বিক্ষেপ, লয় এবং বিক্ষেপ ব্যতীতও কীর্ত্তনাদিতে যে আর এক প্রকার অসামর্থ্য ঘটে তাহার নাম অপ্রতিপত্তি, ওই কালে ক্রোধ গর্ব্ব লোভাদির সংস্কারই কষায়, এবং বিষয়সুখের সহিত যে ভজনাভিনিবেশ অর্থাৎ ভজনকালে বিষয় রসাস্বাদের নামই রসাস্বাদ। এগুলিও ভক্তের ভজনবিঘ্ন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভক্তের ভজনের শেষ নাই। ভজনই ভক্তের জীবন, ভজন হইতে ক্রমে তাহার রুচি জন্মিবে, তখন সে নিরন্তর শ্রীভগবচ্চরণামৃত বারংবার আস্বাদনে এবং

ভগবৎসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত হইয়া সাধারণজগতের লোকদৃষ্টিতে অনভিজ্ঞ এবং উন্মনা বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া থাকেন, এবং রুচিরূপা নর্ত্তকীর সহিত ভক্তসমাজে নৃত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অননুভূত এক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। কালে যখন ভাবরূপ এবং প্রেমরূপ নয়নদ্বয় তাহাকে নাচাইবে, তখন না জানি এই আনন্দের আরও কতই না উৎকর্ষলাভ হইবে। এ সব জগতে সে অমৃতের তুলনাই নাই! যে ভাগ্যবানের ভাগ্যে আস্বাদ ঘটিয়াছে তিনিই জানেন।—এ অমৃত কিরূপ।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত।)

বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

হে বাঞ্ছাকল্পতরুরূপী শ্রীবৈষ্ণব। তোমার পদে আমার শত শত প্রণিপাত। তোমার কৃপার অবধি নাই। তুমি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তে পতিত ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পার।

আমার ইচ্ছা হইল বৈষ্ণব হইব। কিন্তু অভাগ্যবান্ আমি আমার সে বাসনা ফলবতী হইল না। কারণ—

"বৈষ্ণব হইব বলি মনে ছিল সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাধ॥"

এখন তৃণাদপি শ্লোকটি কি, যাহা আমার বাসনা ফলবতী হইতে বাধা দিল—তাহাই বলিতেছি। শ্লোকটি এই—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, প্রথমে তাহাই শুনুন—

"তৃণ হৈতে নীচ হইয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানি অন্যে দিবে মান॥

তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
তাড়ন ভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মরে তবু পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তাঁরে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহি অন্তে করয়ে রক্ষণ॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না বলিবে।
অযাচিত বৃত্তি সদা শাক ফল খাবে॥
সদা নাম লবে যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করে ভক্তি ধর্ম্ম পোষ॥
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥"

তাই বলিতেছিলাম আমার ত তাহা হইলে বৈষ্ণব হওয়া হইল না। হে অদোষ দরশী গৌর ভগবান! আমার দশা তাহা হইলে কি হইবে?

কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন, "সদা নাম লবে" এই নাম লওয়া সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ শুনুন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে হয় প্রেমধন॥"

এখন সেই নাম সংকীর্ত্তনে নিরপরাধী হইবার জন্যই তৃণাদপি শ্লোকানুযায়ী আচরণ করিতে হইবে।

দৈন্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে সর্ব্ব জীবে সম্মান দিয়া অভিমান শূন্য ভাবে আমাদিগকে সর্ব্বদা শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের নাম লইতে হইবে। কেননা—

কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান॥

হে পতিতের বন্ধু নিতাই চাঁদ, আমি দুর্ব্বাসনা নিগড়াবদ্ধ ও মায়ামুগ্ধ হইয়া কাম-কুম্ভীরে কবলিত হইয়াছি। সুতরাং আমি সর্ব্বোতোভাবে পতিত। কোথায়

আমার স্বরূপ তোমার নিত্যদাস হইব, না কোথায় আমি মায়া পিশাচীর হাতে পড়িয়া দুর্দ্দশার অতলতলে তলাইয়া যাইতেছি। হে দয়াল নিতাই আমি কায় মনোবাক্যে তোমার শরণাগত হইতেছি, প্রভু। তুমি না রক্ষা করিলে আর কাহার কাছে যাইব? আমাকে এ বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে কেশে ধরিয়া তুলিয়া লও। তুমি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পার প্রভু? যদি আমার বৈষ্ণব হইবার সাধ পূর্ণ না কর তাহা হইলে তোমার দয়াময় নামে যে কলঙ্ক হইবে প্রভু। দয়া করিয়া আমার সকল দুঃখের ঘুচাইয়া তোমার দাসানুদাস করিয়া দাও, আমি তোমার অভয় পাদপদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া সেই সুরে সুর মিলাইয়া তোমাকে প্রার্থনা জানাইতেছি—

অয়ি নন্দতনুজ। কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলি সদৃশ্যং বিচিন্তয়॥
"সংসার সাগর মাঝে পড়িয়া রয়েছি নাথ।
কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে।"

মুদ্রিত বৈষ্ণব-গ্রন্থের ভ্রম-নিরসন

(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ লিখিত।)

১। **কবি জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল**—জয়ানন্দের মুদ্রিত চৈতন্যমঙ্গলের ৮৩ পৃষ্ঠায় আমরা পাইয়াছিলাম—

"মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপাড়॥"

কিন্তু বর্ত্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালা অনুসন্ধান করিয়া আধুনিক দুই শত বৎসরের প্রাচীন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের একখানি পুঁথি প্রাপ্ত হইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে কুত্রাপি "গোবিন্দকর্ম্মকার" নাই। তাহাতে উক্ত পয়ারটি এইভাবে পরিদৃষ্ট হইল—

"মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য মুকুন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপাড়॥"
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি নং ২২৪১, পৃঃ ১৬)

বলা বাহুল্য এই মুকুন্দ কর্ম্মকারই মুদ্রিত পুস্তকে 'গোবিন্দকর্ম্মকার' হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন।

২। **শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত—**

মুদ্রিত চৈতন্য চরিতামৃতের বহু পুস্তকে মধ্যলীলা ১৮শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে —পাঠানরাজপুত্র বিজলীখান শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবেশ দর্শনে তাঁহার সঙ্গিগণ সম্বন্ধে ভাবিতেছেন—

"এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লৈয়া॥
তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিলা।

* * *

পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা সাধু দুইজন।
গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে তিনজন॥"

এখানে আমরা পশ্চিমা দুইজনের হিসাব পাই, কিন্তু গৌড়িয়া তিনজনের হিসাব মিল পাই না। ঐ সময়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিলেন মাত্র চারিজন। মথুরার সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ রাজপুত কৃষ্ণদাস এই দুইজন পশ্চিমা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আর বাঙ্গালী দুইজন, বলভ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার একটি ব্রাহ্মণ ভৃত্য। মোটে এই চারিজন কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে বারংবারই পঞ্চজন উক্ত হইয়া এক বিষম গোল জন্মাইয়া রাখিয়াছিল। কেহ কেহ এই পঞ্চম ব্যক্তির স্থলে অন্য স্থান হইতে টানিয়া আনিয়া কাহাকেও বসাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে এসিয়াটিক সোসাইটির একখানি অতি প্রাচীন পুঁথি হইতে যথার্থ পাঠ উদ্ধার হইল। এসিয়াটিক সোসাইটিতে যে পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই লিখিত রহিয়াছে—

"এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লৈয়া॥
তবে সেই পাঠান চারি জনেরে বান্ধিলা

* * *

পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা মথুরার দুইজন।
গৌড়িয়া ঠগ এই কাঁপে দুই জন॥"

(এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি নং ৬৫৮, পৃঃ ১০৫)

৩। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চৈতন্যভাগবত—

মুদ্রিত চৈতন্য ভাগবতের কোন কোন পুস্তকে আদি লীলায় আমরা পাই—"বোলেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম।" কোন কোন পুস্তকে 'শূদ্রাধম' স্থলে 'ক্ষুদ্রাধম' পাঠও দৃষ্ট হয়। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির অতি প্রাচীন পুঁথিতে আমরা প্রাপ্ত হইলাম—

"বোলেন ঈশ্বরপুরী আমি বিপ্রাধম।"

(এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি নং ৪১২, পৃঃ ৭৬)

এই 'বিপ্রাধম' পাঠ অধিকতর সঙ্গত ও স্বাভাবিক এবং ইহা হইতে চৈতন্যদেবের গুরু ঈশ্বরপুরীর জাতি নির্ণয় সম্বন্ধে কোন গোল থাকে না।

মহাপুরুষ দর্শন।

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, লিখিত)

ভক্ত সাধক এবং সুকণ্ঠ গায়ক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় অধুনা বৈষ্ণব জগতে সকলেরই নিকট সুপরিচিত। এই রামদাস বাবাজী মহাশয়ের এবং মাদৃশ দীনহীন অকৃতী ব্যক্তির গুরুদেব স্বধামগত শ্রীশ্রীমৎ চরণদাস বাবাজী মহাশয় কোথায় কিরূপে এই অধমকে কৃপা করিয়াছিলেন তাহাই আজ প্রায় চব্বিশ বৎসর পরে, এস্থলে বিবৃত করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। বাঙ্গালা ১৩০৮ সালে, ২৪শে ফাল্গুন শ্রীধাম নবদ্বীপের দুই ক্রোশাধিক পশ্চিমে অবস্থিত বিদ্যানগর নামক পল্লীতে আমি শ্রীশ্রীচরণদাস বাবাজী মহাশয়ের সাক্ষাৎকার ও কৃপা লাভ করি। পূজ্যপাদ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত অবশ্য মধু দাদা, গোবিন্দ দাদা, রামদাস দাদা, ললিতাদিদি, জটিয়া রামদাস প্রভৃতি বহু ভক্তই ছিলেন। আমি কিরূপে অকস্মাৎ বিদ্যানগরে উপস্থিত হইলাম তাহা বর্ণনা করিতেছি।

আমি প্রায় ৩৫ বৎসরকাল শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী আছি। ১৩০৮ সালের ফাল্গুন মাস শুক্রবার শিক্ষকতার কার্য্যের অবসর সময়ে বিদ্যালয়ের একটি নির্জ্জন কক্ষে আমি একখানি পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট আছি, এমন সময়ে বহু সুদুর্লভ বৈষ্ণব গ্রন্থের

প্রকাশক ও প্রচারক পূজ্যপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী-মহাশয় আসিয়া আমার নিকট উপবিষ্ট হইলেন। শৈশবকালে ইনি শান্তিপুরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত সুতরাগড় নামক পল্লীতে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। সুতরাগড় গ্রাম আমার জন্মস্থান; সুতরাং নিত্যস্বরূপ আমার বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাহার সহিত আমার সখ্য ছিল। নিত্যস্বরূপের পূর্ব্বাশ্রমের নাম তিনকড়ি। আমি তাঁহাকে তিনকড়ি বলিয়াই ডাকিতাম। যৌবন কালেই তিনকড়ি ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন বিদ্যালয়ে পাঠ করেন তখনই সহপাঠী বা অপর কোন ছাত্রের হস্তে নাটক নভেল কিম্বা কোন কুরুচিপূর্ণ পুস্তক দেখিলে তাহা কাড়িয়া লইতেন। একদিন দেখিলাম গ্রামস্থ বহু ব্যক্তির দ্বারদেশে খড়ি দিয়া লিখিয়াছেন "হরি সত্য, মায়া মিথ্যা"। এই ঘটনার কিছুদিবস পরেই তিনকড়ি পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যান এবং তথায় প্রকাশানন্দ স্বামী নামক কোন মহাপুরুষের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। বোধ হয় দীক্ষার পরই তাঁহার "নিত্যস্বরূপ" নাম হয়। দীক্ষার পর তিনকড়ি কয়েকবার সুতরাগড় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সহিত নিভৃতে আলাপ করিয়া তাঁহার মুখে জ্ঞানকাণ্ডের অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তখন তিনকড়ি একজন জ্ঞানী বা যোগধ্যান পরায়ণ ব্রহ্মচারী ছিলেন।

১৩০৮ সালের ফাল্গুন মাস শুক্রবারে যখন তিনি আমাদের বিদ্যালয়ে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তখন দেখিলাম তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি জ্ঞান কাণ্ডের কথা ত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ "জয় নিতাই" "জয় গৌর" ইত্যাদি পুণ্যময় নাম সকল উচ্চারণ করিতেছেন। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সস্নেহে ও অকপটচিত্তে বলিতে লাগিলেন—"কিছুদিবস পূর্ব্বে আমি এক মহাপুরুষের দর্শন ও কৃপালাভ করিয়াছি। এরূপ শক্তিশালী পুরুষ আমি কুত্রাপি দর্শন করি নাই। তিনি কৃপাবিতরণের সময় যাহাকে কৃপা করিবেন তাঁহাকে প্রায়ই পদাঘাত করেন। আমাকেও এরূপ পদাঘাত করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি একটী বিসূচিকা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন বলে রোগমুক্ত করিলেন।" আমি ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম —"তুমি এতাদৃশ মহাপুরুষকে কোথায় পাইলে?" তিনি উত্তর করিলেন—

"উড়িষ্যায়। কিন্তু তিনি সম্প্রতি নবদ্বীপে আসিয়াছেন। আমি অদ্য রাত্রিতেই শান্তিপুর কৃষ্ণনগর রেলে নবদ্বীপ চলিয়া যাইব।" আমি কহিলাম—"আমার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তি তাঁহার দর্শন পায় না?" তিনি উত্তর করিলেন, আমার সহিত আজই রাত্রিতে নবদ্বীপে চল। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব। সে দিবস ২৩শে ফাল্গুন। পরদিবস ২৪শে ফাল্গুন শনিবার শিবরাত্রি উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ হইল। অতএব সুযোগ বুঝিয়া আমিও শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। স্থির হইল যে সন্ধ্যার পর শান্তিপুর ষ্টেশনে তাঁহার সহিত আমার মিলন হইবে। আমি বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া ব্যস্তভাবে কিছু আহার করিলাম এবং সন্ধ্যার পরই শান্তিপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও শীত একেবারে যায় নাই। সুতরাং শীতবস্ত্রও লইতে হইয়াছিল। ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম নিত্যস্বরূপ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাঁহাকে যথাকালে প্রাপ্ত হইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। নানাবিধ আলাপ করিতে করিতে রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় ট্রেণে উঠিলাম। যথাসময়ে কৃষ্ণনগরে পৌঁছিয়া অশ্বযান যোগে রাত্রি প্রায় একটার সময় স্বরূপগঞ্জ ঘাটে উপস্থিত হইলাম। ভাগীরথী পার হইবার সময় নাবিকগণের মুখে শুনিলাম 'নবদ্বীপে কলেরা রোগে প্রত্যহ বহু লোকের মৃত্যু হইতেছে। আমার প্রাণটা ভয়ে চকিত হইয়া উঠিল। ভীতভাবে কহিলাম—"তিনকড়ি, তুমি না জানিয়া ঐ বিপদসঙ্কুল স্থানে আমাকে লইয়া যাইতেছ।" নিত্যস্বরূপ নির্ভয়ে উত্তর দিলেন—"কিসের ভয়? নিতাইয়ের কৃপায় কোন ভয় নাই। বিপদ আমাদের কাছেও ঘেঁসিতে পারিবে না।" তাঁহার প্রাণ-সঞ্চারিণী কথায় আমারও হৃদয় বলিষ্ঠ ও আশ্বস্ত হইল। এস্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক, শ্রীধাম নবদ্বীপ আমার অপরিচিত স্থান নহে। শ্রীধাম নবদ্বীপেই আমার শ্রীঅদ্বৈতবংশোদ্ভব কুলগুরুর বাস। এই স্থানেই আমি ইতঃপূর্ব্বে কৌলিকরীতি অনুসারে সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা প্রাপ্ত হই। কিছু দিন পরে মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেও আমি নবদ্বীপে একবার গমন করিয়াছিলাম। সুতরাং নবদ্বীপ সুপরিচিত হইলেও হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বশতঃই বিসূচিকারোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাবের কথা শ্রবণমাত্র আমার প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। যাহা হউক, নিত্যস্বরূপের ভগবদ্ বিশ্বাসপূর্ণ বাক্যে আমি বিশেষরূপ বল ও সাহস লাভ করিয়া উৎফুল্ল চিত্তে রাত্রি ১৷৷০টার পর শ্রীধাম নবদ্বীপে উপনীত হইলাম। নিত্যস্বরূপ বংশাদি রচিত একটী নবনির্ম্মিত সুবৃহৎ গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া "জয় নিতাই" বলিয়া

শব্দ করিলেন। অমনি দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। নিত্যস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবাজী মহাশয় কোথায়?" উত্তর হইল—"তাঁহারা পরিক্রমা হইতে অদ্যাপি ফিরেন নাই। সম্ভবতঃ নিকটেই আসিয়াছেন। আগামী কল্য ফিরিতে পারেন।" নিত্যস্বরূপ প্রশ্ন করিলেন—'কোন্ দিক দিয়া ফিরিতেছেন?" উত্তর হইল "সমুদ্রগড় হইতে বিদ্যানগরের দিকে আসিতেছেন"। আমি এতক্ষণ মহাপুরুষ দর্শন বিষয়ে এক প্রকার নিরাশ হইয়াছিলাম। বিদ্যানগরের দিকে আসিতেছেন শুনিয়া নিত্যস্বরূপ সোৎসাহে কহিলেন—"কোনও ভয় নাই। কাল প্রত্যূষেই আমরা ঐ পথে চলিয়া যাইব। বাবাজী মহাশয়ের সহিত নিশ্চয় দেখা হইবে।" রাত্রির অবশিষ্ট কয়েক ঘটা কোনরূপে অতিবাহিত করিয়া নিত্যস্বরূপ ও আমি অতি প্রত্যূষেই অদূরে ভাগীরথীর সৈকতভূমিতে সৌচাদিক্রিয়া সমাপন করিলাম। সৌচাদির পর দেখিলাম আমার কোমরে কাগজে মোড়া যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ছিল তাহা অন্ধকারে পড়িয়া গিয়াছে। সঙ্গে আর একটী পয়সাও নাই। এই কথা নিত্যস্বরূপকে কহিবামাত্র, তিনি কহিলেন—"ভয় নাই। নিতাই-চাঁদের কৃপায় কোন ক্ষতি হইবে না। আমি এখনই তোমার অর্থ খুজিয়া দিতেছি।" তখন একটু ঘোর ঘোর ছিল। নিত্যস্বরূপ অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ পদবিক্ষেপ করিয়াই হাসিতে হাসিতে আমার কাগজ মোড়া অর্থ আমাকে ফিরাইয়া দিলেন। মোড়কের মধ্যে ১৷৷০ টাকা কিম্বা ১।০ মাত্র ছিল। দেখিলাম ঠিক তাহাই রহিয়াছে। নিত্যস্বরূপের অলৌকিক বিশ্বাস দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতে লাগিলাম। যাহা হউক সেই প্রত্যূষেই আমরা বাবাজী মহাশয়ের দর্শন আশায় বিদ্যানগর অভিমুখে ধাবিত হইলাম। নিত্যস্বরূপ চিরদিনই সরলপ্রাণ ও বালক স্বভাব সম্পন্ন। আমি কখন তাঁহার গাম্ভীর্য্য দেখি নাই। নিত্য স্বরূপকে বহুদিবস দর্শন করি নাই। বোধ হয় এই পরিণত বয়সে অদ্যাপি তাঁহার গাম্ভীর্য্য নাই। নিত্যস্বরূপ বালকের ন্যায় নাচিতে নাচিতে এবং গান করিতে করিতে চলিলেন।—কখন গান করেন—

"বল, নিতাই গৌর রাধাশ্যাম, হরেকৃষ্ণ হরে রাম"

কখন বলেন—

"গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস সার।

* * * *

গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥"

এইরূপে আমরা নবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া পল্লীপথে ক্রমাগত পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে বেলা দশটা বাজিয়া উঠিল। রৌদ্রের প্রখরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। বেলা ১০॥০ ঘটিকা আন্দাজের সময় নামসঙ্কীর্ত্তনের অস্ফুট ধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। নিত্যস্বরূপের আনন্দ দেখে কে? নাচিতে নাচিতে বলিলেন—"আর ভয় কি? দলবল লইয়া বাবাজী মহাশয় আসিতেছেন।" ক্রমে সুগম্ভীর হরিনাম ধ্বনি আমরা সুস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইলাম। অনেক স্থলে নাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে এমন প্রাণের আকুলতার পরিচয় কখনও পাই নাই। সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বোধ হইল, যেন সেই ধ্বনি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতেছে। আমরা উৎকর্ণ হইয়া সোৎসুক চিত্তে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে বিদ্যানগরের যে দেব-মন্দিরে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন তথায় উপস্থিত হইলাম। একটু দূর হইতে দেখিলাম একটি মহান মহীরুহ তলে বাবাজী মহাশয় ৪০।৫০ জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে মহাসঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত। সুগম্ভীর ও সুমধুর সংকীর্ত্তন ধ্বনিতে দিগ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে—পশু পক্ষী, নরনারী, নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া সেই অমৃতস্রাবী নাম রস পান করিতেছে। পথশ্রান্তি ও রৌদ্রতাপে আমি অত্যন্ত ক্লিন্ন হইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় দর্শনান্তর, আমি তাড়াতাড়ি গায়ের জামা ও শীতবস্ত্র ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সংকীর্ত্তন ভূমিতে বাবাজী মহাশয়ের চরণপ্রান্তে পতিত হইলাম। বলা বাহুল্য আমি ইতঃপূর্ব্বে বাবাজী মহাশয়কে কখনও দর্শন করি নাই এবং তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধেও কোন বিবরণ শ্রবণ করি নাই। কিন্তু কি জানি কেন সংকীর্ত্তন দলের মধ্যে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। আমি মহাপুরুষের পদপ্রান্তে শয়ান হইবামাত্র, তিনি আমাকে সস্নেহে উত্তোলন করিয়া আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আমি নিরতিশয় রৌদ্রতাপতপ্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলাম। মহাপুরুষের সুশীতল বক্ষস্থলে আশ্রয় পাইয়া আমি যেন ভাগীরথীর অমৃতোপম পূতসলিলে অবগাহন করিয়া স্নিগ্ধ হইলাম। বস্তুতঃ সেই মহাপুরুষের সুবিশাল বক্ষস্থল যে কিরূপ সুখস্পর্শ ও শান্তিপ্রদ বোধ হইয়াছিল তাহা আমার ন্যায় যে তাপিত ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই জানেন। আমি মহাপুরুষের বরবপুস্পর্শে নিস্পন্দ ভাবে আছি, এমন সময়ে বাবাজী মহাশয় স্বেচ্ছায় নিজগুণে আমার কর্ণকুহরে

তারকব্রহ্ম নাম মন্ত্র প্রদান করিতে লাগিলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার পাদদেশে পতিত হইবামাত্র তিনি শ্রীচরণ দ্বারা আমাকে তিনবার আঘাত করিলেন। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া ভাবভরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে সংকীর্ত্তন শেষ হইল। আমরা ক্রমে ক্রমে একটি সরোবরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গমনপথে আমি বাবাজী মহাশয়ের দুর্ল্লভ সঙ্গ পাইবার আশায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলাম। তিনি সস্নেহে আমার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে কহিলেন—"দেখ বিশ্বেশ্বর আজ অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া গেল। আমি কখনও তোমাকে দেখি নাই; এবং তোমার সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই। কিন্তু তোমাকে দেখিবামাত্র কে যেন আমাকে তোমায় নিজস্ব করিয়া লইতে বলিল। সত্য কথা বলিতে কি, সাধনপ্রার্থী হইয়া যাঁহারা আমার সঙ্গে বহু দিবস হইতে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অদ্যাপি কেহ কেহ পূর্ণ মনোরথ হইতে পারেন নাই। তুমি কোথা হইতে কিরূপে অকস্মাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা লাভ করিলে, তাহা নিতাই প্রভুই জানেন।"

আমি মনে মনে নিজের দীনতা ও অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া এবং মহাপুরুষের অযাচিত কৃপার বিষয় চিন্তাপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতাভরে নিজেকে ধন্য ও সার্থক জন্ম মনে করিতে লাগিলাম। ইহার পর বাবাজী মহাশয় সরোবর সমীপে একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। আমি তাঁহার চরণ প্রান্তে আসীন হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ ও তাঁহার বাক্যসুধা পান করিয়া তৃপ্ত হইতে লাগিলাম। এই সময় একজন কৃষক এক বাজরা তরমুজ লইয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া ১৲ টাকা মূল্যে তাহার সমস্ত তরমুজ ক্রয় করিলেন। আমরা স্নানান্তে সেই তরমুজ খাইয়া জলযোগ করিলাম। ইতিমধ্যে বাবাজী মহাশয় আমার পারিবারিক ও বৈষয়িক কোন কোন বিষয় জানিয়া লইলেন এবং আমাকে সস্নেহে নিকটে বসাইয়া অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত হইল। আমরা সেই ভিক্ষালব্ধ পবিত্র অন্ন যৎকিঞ্চিৎ ব্যঞ্জন ও লবণ সহযোগে পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং পাত্রাবশেষ কিছুই রহিল না। পাত্রত্যাগ করিয়া উঠিতে যাইব, এমন সময় দেখি একটি বর্ষীয়ান বৈষ্ণব মহাশয় আমার পাত্রস্থিত কিঞ্চিৎ লবণ সাগ্রহে আস্বাদন করিতেছেন। আমি প্রথমতঃ বিস্মিত হইলাম। পরে বুঝিলাম নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ জ্ঞানে কখন কখন অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকেন। আমি বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া উক্ত সাধু বৈষ্ণবের আচরণ দর্শনে নিজেকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলাম। যাহা হউক আহারান্তে নাম মাত্র বিশ্রাম করিয়া বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সারাপথ সঙ্গে

সঙ্গে সেই প্রাণ মাতান নাম সংকীর্ত্তন ক্রমে সংকীর্ত্তন দল সুপ্রসিদ্ধ "ব্রহ্মাণী" তলায় উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় ভক্তিভরে দেবীর পীঠস্থানে প্রণত হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত সময়োচিত মনোহর পদাবলী গান করিতে লাগিলেন। কিছু-ক্ষণ পরে "মাধাই"এর ঘাটে উপস্থিত হইয়া বাবাজী মহাশয় সম্বোবচিত সুললিত পদাবলী সাহায্যে শ্রীশ্রীমৎ নিতাই প্রভুর অপার করুণার বিষয় স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার অপার্থিব কবিত্বশক্তি এবং অনর্গল নিঃসৃত কবিতাবলীর কথা চিন্তা করিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হইলাম। এইরূপে দুই এক স্থানে একটু একটু বিশ্রাম করিয়া বাবাজী মহাশয় সঙ্কীর্ত্তনের মহারোলের মধ্যে সন্ধ্যার পর সদলে নবদ্বীপের বাসায় উপনীত হইলেন। বাসায় আসিবার পথে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তনের মত্ততা ও ভক্তগণের ভাবোচ্ছ্বাস বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বাবাজী মহাশয়ের সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া নদীয়ার নরনারী সকলেই এক বাক্যে কহিতে লাগিলেন—"এমন মধুর কীর্ত্তন আমরা কখন শ্রবণ করি নাই।"

বাসায় আসিয়াও আমি বাবাজী মহাশয়ের মধুর সঙ্গ ত্যাগ করিলাম না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার পাদমূলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক রহস্য এবং আমার আত্মার কল্যাণপ্রদ অনেক তত্ত্ব শ্রবণ করিলাম। পরদিবস প্রত্যূষে স্নেহময় বাবাজী মহাশয়ের এবং আমার পরম হিতৈষী বন্ধু নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমি নৌকাযোগে শান্তিপুর অভিমুখে ধাবিত হইলাম।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধামে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়াও বাবাজী মহাশয়ের চরণে প্রণত হইবামাত্র তিনি আমাকে "ওরে আমার গোপালরে" বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং আমার ন্যায় বয়স্ক পুরুষকেও অতি স্নেহে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। আমি ও আমার সহযাত্রীদিগের জন্য তিনি স্বাধিকারভুক্ত একটি স্বতন্ত্র বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং সর্ব্বদাই আমাদের তত্ত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এক দিবস অপরাহ্নে তিনি আমাদের বাসায় শুভাগমন করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া আমাকে কতই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন এবং প্রসঙ্গতঃ নদীয়া জেলার উলা নিবাসী "গোকুলচন্দ্র" নামীয় একটি ব্রাহ্মণ যুবকের পুরীধামে লীলা সংবরণের কথা বর্ণনা করিতে করিতে কাঁদিয়া আকুল হইলেন! বলা বাহুল্য এই গোকুলচন্দ্র তাঁহার শিষ্য ছিলেন। এই ভাগ্যবান যুবকের দেহত্যাগের বিবরণ শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে ব্রহ্ম হরিদাসের মহানির্ব্বাণের কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। ফলতঃ মাদৃশ দীন হীন ও অকৃতী ব্যক্তিকে বাবাজী মহাশয় যেরূপ স্নেহ ও কৃপা করিয়াছিলেন তাহা আমি এজীবনে কদাপি বিস্মৃত হইব না। রথযাত্রা দর্শন করিয়া আমরা বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। এই বিদায়ই শেষ বিদায়। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই।

২৪শ বর্ষ, ৭ম, ৮ম সংখ্যা | ভক্তি | ফাল্গুন, চৈত্র মাস ১৩৩২

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

প্রার্থনা

ভোগাসক্ত ভক্তিহীন মায়ামুগ্ধ নিশিদিন
তাই সদা দুঃখ তাপ সহি দয়াময়।
সকল মঙ্গলালয় তুমি প্রভু দয়াময়
দয়া করি এ দীনে কর হে উপায়॥

দয়াময়। কি বলিয়া যে তোমায় দীনজন বৎসলতার, তোমার অসীম পতিত-পাবনী দয়ার জয় ঘোষণা করিব তাহা ভাবিয়া পাই না। আমি নিতান্ত অজ্ঞ, তোমার মহিমার কিছুমাত্রও বুঝিতে পারি না, তোমার তত্ত্ববিষয়ে কোনরূপ অনুধাবন করিবার চেষ্টাও করি না, তথাপি তোমার ভক্ত মুখে তোমার নিখিল কলুষ নাশন ভুবন মঙ্গল নাম গুণ-কীর্ত্তন ভাগ্যক্রমে যদি কখনও শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করে তাহাতেই আমি একেবারে বিহ্বল হই। কিন্তু তোমাতে ভাবভক্তিহীন বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান সংহারিণী অসৎভাবের একমাত্র জননী সন্তাপদায়িনী মায়ার কুহকে ভুলিয়া সে বিহ্বলতা, সে আনন্দ স্থায়ী হয় না আর তাহা হয় না বলিয়াই নানা রূপ রোগ শোক দুঃখ পরিতাপাদি আমায় কাতর করিতেছে। এই দুর্দ্দৈব একমাত্র তোমার কৃপায় দূর হইতে পারে, অন্য কোন উপায় নাই।

দয়াময়। দয়া করিয়া দীনের প্রতি একবার ফিরিয়া চাও। দিন দিন কোথায় তোমার ভাব লাভ করিয়া তোমাতে চিত্ত সংলগ্ন রাখিয়া সুখে দিন-যাপন করিব তাহা না হইয়া বাসনার তাড়নায় আমি একেবারে অতল তলে ডুবিয়া যাইতেছি। যতই কর্ম্ম করি কর্ম্মের বাসনা ততই বৃদ্ধি পায়, যতই

ভোগ করি ভোগবাসনা ততই দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, আর কেন দয়াময়! অনেকদিন ত ঘুরাইলে, অনেক ত করাইলে, এবার তোমার দিকে মনটাকে টানিয়া নিয়া যাওনা প্রভু। আমি একেবারে সব ছাড়িতে চাই না, আর চাইলেও তাহা পারিব না, কেবল এই কর যে, যদি কর্ম্ম করিতে হয় তোমার কর্ম্ম—যাহা সাধুগণ সৎকর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি দাও। চিন্তা যদি করিতেই হয় তবে ছাইভস্ম চিন্তা না করিয়া তোমার ঐ সুর-মুনি-বাঞ্ছিত রাতুলচরণ চিন্তা করিতে শক্তি দাও।

সংসার তুমিই দিয়াছ সত্য, কিন্তু তার মধ্যে তোমার সত্ত্বা উপলব্ধি করিবার শক্তিটুকু অমন করিয়া দিন দিন কাড়িয়া নিলে চলিবে কেন? এভাবে যদি আমাকে লইয়া চল তাহা হইলে তোমার নাম, তোমার এমন প্রিয় মনুষ্য দেহে থাকিয়া যে করিতে পারিব এমন আশা ত মোটেই হয় না। কৃপা করিয়া তোমার ভক্তজনসঙ্গ মিলাইয়া দাও, তোমার ভক্ত সঙ্গে তোমার ভাবের আলোচনায় সকল ভাবনা সকল মোহ দূর হইয়া যাউক আমি পরমানন্দে তোমার দীনদয়াল পতিতপাবন নামের জয়গান করিয়া জীবন জনম ধন্য করি। দাও প্রভু, প্রাণে বল দাও, হৃদয়ে তোমার চিন্তা করিবার শক্তি দাও, আমি প্রাণভরিয়া সাধ মিটাইয়া তোমার চিন্তা করি, আর মুখে তোমার নাম করিয়া কৃতার্থ হই। দীনহীন কাঙ্গালের আজ এইটাই প্রার্থনা।

মোহন রূপ

(গান)

(শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক লিখিত)

যে রূপ তোমার উঠ্‌ছে ফুটে
ভুবন মাঝে—
ও রূপ যেন প্রাণে আমার
সদাই বাজে।
ওই অপরূপ রূপের কূলে,
ডুবতে যে চাই সকল ভুলে,
পাই যেন ঠাঁই রাঙাপায়ে
জীবন সাঁঝে॥

দয়াল তোমার অসীম রূপে
ডুবল ভবা,—
নীল সাগরে তোমার আভা
পাগল করা;
দূর আকাশে চাঁদের হাসি,
সে যে তোমার রূপের রাশি,
ভাস্‌ছো তুমি আঁধার নাশি'
শোভন সাজে ॥

দস্যু-উদ্ধার

(শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিত)

প্রেমময় শ্রীগৌরহরি বনপথে শ্রীবৃন্দাবন গমন কালে তাঁহার ভাবে বনের পশু পর্য্যন্ত বিভাবিত হইয়া হরিনামে মাতিয়া উঠিয়াছিল, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে :—

"একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তাহাঁতে প্রভুর লাগিল চরণ ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ কহ ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥" ইত্যাদি

"ভজন নির্ণয়" নামক প্রাচীন একখানা গ্রন্থের রচয়িতার নাম বৃন্দাবন দাস; অনেকের মতে ইনি শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রণেতা হইতে অভিন্ন। যাহা হউক, এই গ্রন্থেও পূর্ব্বোক্ত কথা তুল্যরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যথা :—

"বনপথে ব্যাঘ্র হস্তি ভল্লুক গণ্ডার।
প্রভু দেখি হরি বলে হিংসা নাহি কার ॥"

পশুরা স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকে। যাঁহার ইঙ্গিতে বিশ্ব-প্রকৃতি চলিতেছে, স্বভাবের কিঙ্কর পশু পক্ষি তাঁহার ভাবে বিভাবিত হইবে ইহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে। যাহারা প্রকৃতিকে কিঙ্করী করিতে সচেষ্ট তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাহারা স্বভাবের বিধানের বিপরীত চলিতে চাহে, তাহারা এবং তদপেক্ষাও অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রকৃতি নরগণও ঐ ভাব-বন্যায় ডুবিয়া যাইবার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।

ভজন নির্ণয় গ্রন্থে এইরূপ একটি আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বনপথে চলিয়াছেন। কোন দিকে দৃকপাত নাই, শ্রীচরণই যেন চালক হইয়া স্বয়ং পথ দেখাইয়া ঠিক ঠিক পথে লইয়া যাইতেছে। একদিন একস্থানে জঙ্গলের ভিতরে আটজন "বাট্পাড" ধনলোভে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের দুরভিপ্রায় বুঝিয়া সঙ্গীয় বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভীত হইয়া প্রভুর কাছে গেলেন ও তাঁহাকে ডাকিয়া সচেতন করিয়া ব্যাপার বলিলেন :—

"বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভয় পাই মনে।
কহিতে লাগিল প্রভু প্রাণ গেল বনে॥"

বলভদ্রের ভয় দেখিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন ও "লৌহদণ্ডধারী" প্রধান দস্যুর সম্মুখে গিয়া বলিলেন—"তুমি ধনের প্রত্যাশী, কিন্তু আমাদের মরিয়া লাভ কি, তোমার দিব্য-দৃষ্টি আছে, চেয়ে দেখ, আমি সন্ন্যাসী মাত্র—কপর্দ্দক শূন্য ভিখারী।

দস্যুর দুর্ভাগ্যের শেষ হইয়া সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল বলিয়াই সে আজ প্রভুর গমন পথে হানা দিয়া ছিল সন্দেহ নাই। দয়াময় প্রভু যখন বলিলেন —"চেয়ে দেখ," যখন বলিলেন :—

"ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি কিবা আছে মোর।
কেন বা মারিবে ? আছে দিব্য দৃষ্টি তোর॥"

তখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল, যেমন চাহিল—স্তম্ভিত হইয়া গেল। কি দেখিল সে ? দেখিল যে, সেই বদন-সুধাকর হইতে সুধারাশি ক্ষরিত হইতেছে। পার্থিব ধনরত্ন ? ছি ছি ! তার প্রতি কার আর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ? সৌভাগ্যশালী দস্যু দর্শন করিল—

"কত ধনরত্ন নিন্দে সুন্দর বদন।
* * *
পদ্মপত্র যুগ্ম নিন্দে নেত্র কামধেনু।
তপ্ত স্বর্ণ জিনি বর্ণ দ্বিভুজ আজানু॥
কোটী কাম সুখ ধাম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
দণ্ড করে বস্ত্র পরে যেন দিবাকর॥"

এই দস্যুদলে গণৎকার একটি ছিল, সে প্রভুকে সন্ন্যাসী বেশে নিখিল ধনের আশ্রয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। দস্যু রূপে মুগ্ধ হইলেও গণৎকারের কথা ভুলে নাই, বলিল—তুমি সামান্য সন্ন্যাসী নহ, তুমি ভিক্ষুক যে নহ,

তাহা বুঝিতেছি। আমরা গণনা দ্বারা জ্ঞাত আছি যে, তোমার কাছে অমূল্য নিধি রহিয়াছে, আমাদিগকে তাহা দিতে হইবে।

দস্যুর কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "হাঁ, তাহাই দিতেছি।"

"এত বলি হরিনাম ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।

* * *

এই ধন আছে দিব অক্ষয় অব্যয়।
সর্ব্বধন হীরা বস্ত্র আদি সম নয়॥"

দস্যু ধনপ্রার্থী হইয়াছিল, প্রভু ধন দান করিলেন। দাতা শিরোমণি প্রার্থীকে বিমুখ করেন না। অকপটে প্রার্থী হইলে না দিবেন কেন? তখন—

"শ্রবণে উন্মত্ত হৈয়া আট লোক আসি,
চরণে প্রণতি করে হরিনামে ভাসি॥"

তাঁহারা পরম ধন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে—পার্থিব সামান্য ধনের জন্মে আর লালায়িত নহে, কাজেই—

"দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়ি সব বৈরাগ্য করিল।
সেই বনে তীর্থ জানি সাধনে বসিল॥"

প্রভুর ভাবি সন্ন্যাস-গ্রহণ সংবাদে প্রিয়জীর খেদ

(লোচন দাস)

প্রভু সন্ন্যাস করিবেন। নানামতে বুঝাইয়া জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভুর সেই সুমধুর ও আশ্বাসপূর্ণ বাণী আমাদের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছে—

"যেদিন দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণে আমা তুমি দেখিবারে পাবে॥"

শচীরাণী কিন্তু এই নিদারুণ বাক্যে প্রবোধ মানিলেন না। শরাহত কুররীর মত আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিকটে গিয়া দেখিলেন জননীর মুখে বাক্য নাই, দুই চক্ষু বহিয়া অঝোরে অশ্রু পতিত হইতেছে, দেবী লোকমুখে পূর্ব্বেই কানাঘুষা শুনিয়াছেন কিছুই আর জিজ্ঞাসা করিতে

পারিলেন না। জননীর দুঃখের কারণ ইঙ্গিতে বুঝিয়া তাঁহার মাথায় যেন বাজ পড়িল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ক্রমে দিন অবসান হইল। রাত্রে প্রভু গৃহে আসিয়া আহার সমাপনান্তে সুখশয্যায় শয়ন করিলেন। সেদিন প্রিয়াজী একটু ব্যস্ত হইয়াই শয়ন গৃহে আসিলেন। শেষে চরণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বসিয়া কাতরভাবে প্রাণনাথের মুখখানি দেখিলেন। প্রভু কপট নিদ্রায় মগ্ন আছেন। দেবী ধীরে ধীরে প্রাণনাথের চরণ দু'খানি সযত্নে বক্ষে লইয়া জড়াইয়া ধরিলেন। পাদ পদ্ম বক্ষে ধরিয়া দেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দুই চক্ষু বহিয়া ধারা পড়িতে লাগিল, ক্রমে চক্ষের জলে প্রভুর পা ভিজিয়া গেল। তপ্ত অশ্রুর পরশ পাইয়া প্রভুর কপট নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চেতন পাইয়া সযত্নে তিনি প্রিয়াকে উরুর উপর বসাইয়া ডান হাতে চিবুক ধরিয়া মধুর বচনে কহিলেন—"আমার প্রাণপ্রিয়া! তুমি কিজন্য কাঁদিতেছ?" প্রভুর এই মধুর বাণী দেবীর হৃদয় স্পর্শ করিল। তাঁহার হৃদয় যেন বিদরিয়া গেল কিছুই বলিতে পারিলেন না, অন্তরে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। দেহ যেন আর সম্বিত নাই। কেবল দুই চক্ষু বহিয়া ধারা পড়িতেছে। প্রভু কত ভাবে কত না মধুর বচনে দেবীকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিন্তু অতি শোকে তাঁহার হৃদয়দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিছুই উত্তর দিতে পারিতেছেন না। কেবল প্রভুর কোলে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতেছেন।

রঙ্গিয়া প্রভু সর্ব্ব প্রকার ছলা কলায় অভিজ্ঞ। প্রিয়াজীর চাঁদমুখখানি কোঁচার কাপড়ে মুছাইয়া দিয়া কতনা সোহাগে, কতনা যতনে তাহার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তখন প্রভুর ব্যগ্রতা দেখিয়া চন্দ্রমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—প্রাণনাথ, আমার মাথায় হাত দিয়া সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি নাকি সন্ন্যাস করিবে? লোকমুখে ত এইরূপই শুনিতেছি। ইহাতে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। আমি আর কি করিব, ইহা যদি সত্য হয় তবে আগুনে প্রবেশ করিব। এই যে আমার জীবন, রূপ, নবযৌবন, বেশ বিন্যাস সমস্তই ত তোমার জন্য, সেই তুমি যখন আমাকে ছাড়িয়া যাইবে তখন এ ছার জীবনে আর দরকার কি? হৃদয় যে আমার পুড়িয়া যাইতেছে। তোমার মত স্বামী পাইয়া নদীয়ার মধ্যে ভাগ্যবতী রমণী ছিলাম। আমার এই নবীন যৌবন, কত আশা করিয়াছিলাম আমাকে লইয়া আনন্দলাভ করিবে। হায়! হায়! সমস্তই বিপরীত হইল। আমার জীবনে ধিক!

আর এক কথা, তুমি না হয় একান্তই আমাকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিলে, কিন্তু কিরূপে পথে হাঁটিয়া যাইবে। শিরীশ কুসুমের মত সুকোমল তোমার পায়ের তলা, আমার হাত দিতেই ভয় লাগে, অমন সুকোমল রাঙা পায় অরণ্যকণ্টক বনে কিরূপে হাঁটিবে। আর—

"সুধাময় মুখ ইন্দু তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু,
অল্প আয়াস মাত্র দেখি।
বরিষা বাদল বেলা ক্ষণে বারি ক্ষণে ক্ষরা
সন্ন্যাস কারণ মহাদুঃখী॥
তোমার চরণ চিনি, আর কিছু নাহি জানি,
আমারে ফেলাহ কার ঠাই।"

তোমার কি ধর্ম্মভয় নাই, মা অতিবৃদ্ধা হইয়াছেন, শোকে তাপে আধমরা হইয়া আছেন তাঁহাকে তুমি কেমন করিয়া ছাড়িয়া যাইবে, মুরারিগুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, শ্রীবাস, হরিদাস, অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি তোমার ভক্তবৃন্দকেই বা কিরূপে ছাড়িয়া যাইবে। প্রভু তোমার প্রেমের সীমা নাই, জগতের লোক মাত্রেই তোমার অতীব প্রিয়, কেবল ভক্তদের সম্বন্ধেই তোমার বিপরীত চরিত্র দেখিতেছি। তুমি যদি দেশান্তরে যাও তাহা হইলে জগত ভরিয়া তোমার অপযশ হইবে এবং ভক্তগণও প্রাণে বাঁচিবে না। তারপর আমার সম্বন্ধে—

"কি কহিব মুঞি ছার মুঞি তোর সংসার
সন্ন্যাস করে মোর ডরে।
তোমার নিছনি লঞা মরো মুঞি বিষ খাঞা
সুখে নিবসহ নিজ ঘরে॥"

প্রভু, তুমি দেশান্তরে যাইও না। আমার আর কেহ নাই। তোমার মুখের দিকে চাহিয়া হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছে। বলিতে বলিতে নিদারুণ মর্ম্ম ব্যথায় দেবীর হৃদয় দ্বার রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি প্রভুর চরণ ধরিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তখন—

"শুনি বিষ্ণুপ্রিয়াবাণী তবে সেই গৌরমণি
হাসিয়া তুলিয়া নিল কোলে।
বসনে মুছিয়া মুখ, করে নানা কৌতুক,
মিছা দুঃখ না ভাবিও বোলে॥

আমি তোরে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিয়া
এ কথা বা কে কহিল তোকে ?
যে করি সে করি যবে, তোমারে কহিব তবে,
এখনে না মর মিছা শোকে ॥
ইহা বলি গৌরহরি অশেষ চুম্বন করি
নানারস কৌতুকে বিহরে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা, লীলা লাবণ্যের সীমা
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে ॥”

এইভাবে নানা প্রকার আনন্দ দিয়া অশেষ রঙ্গিয়া প্রভু আমাদের বালা বিষ্ণুপ্রিয়াকে তুষ্ট করিলেন। ক্রমে রজনী শেষ হইয়া আসিতেছে, দেবীর অন্তরের আগুনি ত নির্ব্বাপিত হয় নাই, তাই তিনি ধীরে ধীরে প্রভুর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

“প্রভু কর বুকে দিয়া পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
মিছা না কহিও মোর ডরে।
হেন অনুমান করি যত কহ—চাতুরী,
পলাইবে মোর অগোচরে ॥
তুমি নিজ বশ প্রভু পরবশ নহ কভু
যে করহ আপনার সুখে।
সন্ন্যাস করিবে তুমি কি বলিতে পারি আমি
নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে ॥

প্রিয়ার কাতর বাক্যে প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আমার প্রাণপ্রিয়া। তুমি শোন, তুমি কিছু মনে করিও না। আমি যাহা করিব সে তোমার হিতের জন্যই করিব। দেখ প্রিয়তমে, জগতে যত কিছু দেখ সমস্তই মিথ্যা, সত্যবস্তু একমাত্র সেই শ্রীভগবান। আর সেই শ্রীভগবানকে যাঁহারা ভজন করেন সেই শ্রীবৈষ্ণবগণও সত্য। ইহা ছাড়া আর সমস্তই মিথ্যা। এই যে মাতাপিতা স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি রূপে জীবের সম্বন্ধ দেখিতেছ এ সমস্তই মিথ্যা মায়া মাত্র। পরিণামে দেখ কেহই কাহারও নহে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই আমাদের সকলকার পতি। এই সার সত্য কথা কেহই বুঝিতে চাহিনা। সকলে—

“কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে
মায়াবন্ধে পাসরে আপনা।

অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজ প্রভু পাশরিয়া,
শেষে মরে নরক যন্ত্রণা ॥

তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা হইয়া আপনার নাম সার্থক কর। বৃথা শোক করিয়া কোন লাভ নাই। প্রভুর প্রসন্ন বাক্যে—

"দূরে গেল দুঃখ শোক আনন্দে ভরিল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত ॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ নিরখিয়া,
পতিবুদ্ধি নাহি ছাড়ে কভু।
পড়িয়া চরণতলে প্রণতি মিনতি করে,
এক নিবেদন শুন প্রভু ॥
মো অতি অধম ছার, জনমিল এ সংসার
তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি।
এ হেন সম্পদ মোর, দাসী হইয়া ছিনু তোর
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি ॥"

দেবী এই কথা বলিয়া উভরোলি হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু বিপদে পড়িলেন, প্রিয়ার আকুল ক্রন্দনে প্রভুর করুণ নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল। ভক্তবৎসল প্রভু, প্রিয়াকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং মধুর স্বরে বলিলেন—

"শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া তোমারে কহিল ইহা
যখনে যে তুমি মনে কর,
আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাঁই
সত্য সত্য কহিলাম দড় ॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা বাণী শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গণি
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি প্রভু।
নিজসুখে কর কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ,
প্রত্যুত্তর এই শুন প্রভু ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া হেটমুখী ছল ছল করে আঁখি
দেখি প্রভু সরস সম্ভাষে।
প্রভু আচরণ কথা, শুনিতে লাগয়ে ব্যথা,
গুণগায় এ লোচন দাসে ॥"

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

শ্রীরাসলীলা

(শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দেবশর্ম্মা লিখিত)

বেদ যাঁহার স্বরূপ সন্ধান করিতে যাইয়া "নেতি নেতি" বলিয়া প্রত্যাবৃত হন, সুধী, জ্ঞানী ও ভক্তবৃন্দ যাঁহার মহিমার সীমা না পাইয়া "যতোবাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বলিয়া নীরব ও মৌন ভাব অবলম্বন করেন, যিনি স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দঘন সেই অনন্ত পুরুষের অনন্ত তরঙ্গময় যে লীলাবিলাস তাহারই পরম নির্য্যাস এই "শ্রীরাসলীলা।"

আবহমান কাল হইতে আমাদের এই দেশে শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে দুই প্রকারের মত চলিয়া আসিতেছে। উভয় প্রকার মতই জগতের শ্রেষ্ঠ মনস্বীগণ কর্ত্তৃক অনুভূত এবং জনসমাজে প্রচারিত। এক প্রকার মত হইল—শ্রীভগবান নিরাকার, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ, এবং এই পরিদৃশ্যমান জগত মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

আর একপ্রকার মত হইল ব্রহ্ম সাকার, স্বগুণ, সবিশেষ, সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ। জীব ও জগৎ তাঁহার শক্তির প্রকাশ। এক্ষণে সমস্যা, অদ্বয় ব্রহ্মে শক্তি আছে কি না? একটু তত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। বেদান্ত বলেন— "ওঁ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" অর্থাৎ ব্রহ্ম হইলেন জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ। ইহার এই আনন্দ স্বরূপকে অবগত হইতে পারিলে তবে জীবের মৃত্যুভয় রহিত হয়। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মের আনন্দ বলিলে তাঁহার স্বরূপভূত গুণ বা কর্ম্ম ব্যতীত আর কি হইতে পারে? শ্রুতি বলেন—"পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী", অগ্নির দাহিকা—জলের শীতলতা—দুগ্ধের ধবলতা প্রভৃতি শক্তির ন্যায় শ্রীভগবানেও বিবিধ শক্তি আছে। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। "শক্তি শক্তিমতোরভেদাৎ" সুতরাং শক্তি স্বীকার করিলেও সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের অদ্বয়ত্ব সম্বন্ধে কোন বাধা ঘটে না। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই তাঁর শক্তির খেলা। শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মত্বই অসম্ভব; জগৎ কার্য্য দূরের কথা। অধিক কি "ব্রহ্ম" এই শব্দের মূলেই বৃহত্ত্ব ও ব্যাপকত্ব শক্তি পাওয়া যায় সুতরাং পাওয়া গেল যে, "ব্রহ্ম" স্বগুণ—স্বধর্ম্ম—সবিশেষ এবং সর্ব্ব-শক্তিমান। তবে অভেদ

মার্গের সাধকগণের নিকট তিনি স্বীয় স্বরূপভূতশক্তি সমূহকে অস্তমিত করিয়া নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপে অনুভূত হন। ইহাও কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিরই এক প্রভাব বিশেষ।

শক্তি অনন্ত হইলেও তাহার গুণ ও কার্য্যাদি দেখিয়া তিনটি পর্য্যায় বিভক্ত করা যায়। (ক) "চিৎশক্তি" অর্থাৎ সদা স্বরূপভাবাপন্না। (খ) "জীবশক্তি" অর্থাৎ কখনও স্বরূপ কখনও বহির্ম্মুখভাবাপন্না। (গ) "মায়াশক্তি" অর্থাৎ সদাই বহির্ম্মুখভাবাপন্না।

উক্ত ত্রিবিধ শক্তির সহিত অনন্ত কাল হইতেই শ্রীভগবানের এইরূপ লীলা খেলা চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে মায়ার সাহায্যে জীব শক্তির সহিত সংসারলীলা, আর যোগমায়ার সাহায্যে চিৎ শক্তির সহিত নিত্যলীলা। এই নিত্য লীলার মধ্যে আমাদের আলোচ্য শ্রীরাসলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ"

চিৎশক্তি ত্রিবিধ:—সন্ধিনী, সম্বিৎ আর হ্লাদিনী। যাহা আনন্দময় পুরুষকে নিখিল পরমানন্দ প্রদান করে, যাহার প্রসাদে ভগবদ্ভক্তগণ অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীভগবানকে অনুভব করিয়া হৃদয়ে দিব্য বিমল আনন্দ সম্ভোগ করেন, তাহাই শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া কথিত হয়।

"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥" (চৈঃ চঃ)

উক্ত হ্লাদিনী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী গোপীগণের সহিত শ্রীভগবানের যে প্রেম-বিলাসময়ী বিবংসা অর্থাৎ রমণ ইচ্ছা তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে 'রাস' নামে কীর্ত্তিত। ইহা প্রাকৃত নায়ক নায়িকার মদনোৎসব নহে, পরন্তু মদনমোহনের স্বরূপের খেলা। বালক যেমন দর্পণ মাঝে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া পরম আনন্দে তাহার সহিত নানারূপ ক্রীড়ার অভিনয় করিয়া থাকে, 'রাসলীলা'ও এক প্রকার তাই। তবে প্রভেদ এই যে, প্রতিবিম্বের সহিত বালকের খেলা ঘোর অজ্ঞানতা প্রসূত, জ্ঞান হইলে তাহার আর ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে না—কিন্তু অনন্ত জ্ঞানের আধার শ্রীভগবানের খেলা তাঁহার স্বরূপের, অনন্ত প্রেমসিন্ধুর উদ্বেলময়ী অবস্থা বিশেষ। ইহার নিবৃত্তি নাই, অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত এই লীলা-শিখরিণীর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিয়াছে; এ আনন্দ ক্রম-বিবর্দ্ধনশীল। তাই শ্রীভগবান নিত্য লীলাময়। "একো দেবো নিত্য লীলানুরক্তো।" এক কথায় লীলায় যদি সৌন্দর্য্য থাকে, শ্রীভগবানে যদি

মাধুর্য্য থাকে, প্রেমে যদি আত্মহারা আকুল আবেগ থাকে, আর নিখিল প্রেমের আস্পদ যদি সেই সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান হন—তবে তৎ সমুদয়ের সম্মিলন এই এক শ্রীরাসলীলায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রুতিতে পাওয়া যায়—শ্রীভগবান 'রসময়' 'মধুময়' এবং 'আনন্দময়'। "রসোবৈ সঃ" "আনন্দং ব্রহ্মেতি" ইত্যাদি বাক্যে বেদ তাঁহার স্বরূপে সকল প্রকার নিরানন্দ, দুঃখ ও অসদ্ভাব পরিহার করিয়া নিরতিশয় সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সত্য, আনন্দ প্রভৃতি নিখিল দিব্য গুণের পূর্ণাধার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপের আর একটী প্রধান গুণ—'প্রেম' বা 'ভালবাসা'। চিদানন্দময় হইতে শোক দুঃখময় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবতার কালে তাঁহার সেই অফুরন্ত ভালবাসা বেশ সুন্দররূপে অনুভূত হয়। তিনি তাঁহার স্বরূপগত অফুরন্ত এই রস, মধু ও আনন্দ অপরকে বিলাইতে সর্ব্বদা ব্যস্ত! এই নিমিত্ত প্রকট লীলায় দেখা যায় যে, আনন্দময় 'পুরুষ' শ্রীবৃন্দাবনে কদম্বতরুতলে দাঁড়াইয়া মোহন বংশীর মধুস্বরে সকলকে সেই চিন্ময় আনন্দরস আস্বাদনের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন।

বৃন্দাবন তাঁহার নিজ ধাম। "বৃন্দায়া" শ্রীরাধার "বনং" অর্থাৎ বিবিক্ত প্রদেশ। সুতরাং হ্লাদিনী শক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিত। আনন্দময় পুরুষের আনন্দ রূপিণী শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। তাই বৃন্দাবনের সকলই মধুর, সকলই আনন্দময়। শোক, দুঃখ, নিরানন্দ, উদ্বেগ সে রাজত্বে নাই—জন্ম, মৃত্যু, জরা, জ্বালা সে অমৃতময় ধামের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির ভীষণ বিক্ষেপে এখানের মত সেখানকার অধিবাসিগণকে নিরন্তর জর্জ্জরীভূত হইতে হয় না। কল্পনাতীত সে ধাম, মায়াতীত সে জীব। সেখানে মিলনে ব্যবধান নাই, প্রেমে স্বার্থসুখ নাই—ভোগে ইন্দ্রিয়-প্রীতি নাই। আনন্দই সেখানে ভোগ, আনন্দের হেতুতেই 'অখিল আনন্দ' সনে আনন্দময়ীগণের মহামিলন। এই আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার খেলা—আর এই খেলাই তাঁর আনন্দময় স্বভাবের বৈশিষ্ট। তার উপর তিনি সর্ব্বসুন্দর। জীবাত্মায় সৌন্দর্য্যের যতদূর কল্পনা করিতে পারে, রূপপিপাসু-চিত্ত রূপের যতখানি আস্বাদন পাইলে চিরতরে ধন্য হইতে পারে—শ্রীভগবান তদপেক্ষা অনন্ত গুণে সুন্দর। কাজেই এই রাসলীলায় সকলপ্রকার সৌন্দর্য্যের সমাবেশ। শরতের চাঁদ সুন্দর—নির্ম্মল গগনে পূর্ণিমা রজনী সুন্দর, মল্লিকা মালতী কুসুম সুরভিত শ্রীবৃন্দাবনধাম সুন্দর, নীল যমুনার উছলিত বারিরাশি বক্ষে ভাঙ্গা ভাঙ্গা চাঁদের জ্যোছনা সুন্দর,

সেই নিত্য বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মাঝে অনন্ত সুন্দরের মোহনবংশীর অস্ফুট কলধ্বনি আরও সুন্দর; আর সেই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া চিরসুন্দরের মধুর আলিঙ্গন-পিয়াসী নবীনা কিশোরীগণের উন্মাদিনী বেশে যমুনা তীরে সম্মিলন সর্ব্বাপেক্ষা অতি সুন্দর। সৌন্দর্য্যের সম্ভোগই "রাসলীলা।" রাসবিহারী স্বয়ং পরম পুরুষ। পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতির বাসনা পূর্ণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। এই যে বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে পরম সুন্দর ফুলটী তাহার সৌন্দর্য্যরাশীকে সর্ব্বাঙ্গিন পরিস্ফুট করিয়া বিকসিত হইয়াছে এ সৌন্দর্য্যের প্রকৃত ভোক্তা কে? আমরা কি তাহার প্রকৃত মাধুরী আস্বাদন করিতে পারি?—না, সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী ললাম ললনাগণের অস্ফুট যৌবনের প্রকৃত রস ভোগে সক্ষম হই? কখনই না। আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস আমাদের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সহিত এমন একটা দূষিত ভাবের সংমিশ্রণ আছে যে, সেই দূষিত ভাবের সহিত যে কোন সুন্দর দ্রব্যের সংঘটন ঘটিবে তাহাই কিছুকাল মধ্যে দূষিত ও মলিন হইয়া যাইবে। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই সমস্ত বস্তুর কোনটীরই প্রকৃত স্বামী আমরা নই। তবে কাহার জন্য এ বিশ্ব প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যকে কখনও অন্তরে, কখনও বহিস্ফুট করিয়া এমন ভাবে যুগ যুগান্তর প্রতিক্ষা করিয়া আসিতেছে? কাহাকে পাইলে সে চিরতরে পূর্ণ হইয়া যাইবে? তিনি 'পুরুষ'। 'পুরুষই' একমাত্র রসভোক্তা আনন্দময়—নিত্য মধুর। "ওঁ রসোবৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের মতে বৃন্দাবন বিহারী নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম পুরুষ। অর্থাৎ তাঁহাকে পাইলেই সকলকার সকল অভাব মিটিয়া যায়। তাঁহাকে না পাইলে জীবনের কোন অভাবই ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না। রাসলীলা হইতেই সেই অনন্ত প্রকৃতির অন্তরের অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রাণের অনন্ত ভাব সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে উৎসর্গ করাইয়া ধন্য হয়।

এ লীলার মাঝে আর একটী সুন্দর রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। প্রকৃতি যেমন পুরুষের অসমোর্দ্ধ রূপ, রস ও সৌন্দর্য্যে আত্মহারা, পুরুষও তেমনি প্রকৃতির নিমিত্ত পাগল। শক্তি ও শক্তিমান উভয়েই উভয়ের গুণে মুগ্ধ ও বিভোর।

শ্রীভগবান আত্মারাম—আপ্তকাম—সকল প্রকার কামনা বাসনার অতীত। সাম্রাজ্যলক্ষ্মী সকল প্রকার কামনা, বাসনা, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের সহিত তাঁহার চরণ যুগলকে প্রাপ্ত হইয়া চিরতরে ধন্য হইয়াছে। রূপে গুণে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে এমন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। তিনি নিজেতেই

নিজে পূর্ণ অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ। সুতরাং বাহিরের কোন কিছু তাঁহাকে উদ্বেল বা চঞ্চল করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে এরূপ ভাবে প্রেম-বিবশ হওয়া অন্ততঃ পরদারাবৎ প্রতীয়মানা গোপীগণের সহিত রাস-লীলা করা বড়ই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সাক্ষী, চেতা, নির্ব্বিকার প্রভৃতি যাঁর বিশেষণ, তিনি কেন এরূপ কার্য্য করিবেন ?

কথাটা আপাততঃ শুনিতে অতিশয় অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে এবম্বিধ সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ ঋষি পূর্ব্বেই বলিযাছেন যে, এই শ্রীরাসলীলা ইহা শ্রীভগবানের দিক হইতে দেখিলে এক প্রকার তাঁর নিজেরই সহিত নিজের খেলা। নিজের আনন্দে নিজে মগ্ন হওয়া। বালক যেমন দর্পণ মাঝে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তাহার সহিত নানাবিধ খেলা করিয়া থাকে, তদ্রূপ গোপীর বিশুদ্ধ অনুরাগময় চিত্তদর্পণে শ্রীভগবানের সেই লাবণ্যসার মাধুর্য্যময় মূর্ত্তিখানি প্রতিবিম্বিত হইলে সেই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য অতি শোভা প্রাপ্ত হয়। তিনি তখন আপনার সেই রূপ, লাবণ্য দর্শন করিয়া তাহাকে আস্বাদন করিতে ব্যাকুল হন।

"রূপদেখি আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।"

গোপী পক্ষেও ঠিক তাই। তাহা ছাড়া গোপীগণ যে তাঁহারই নিত্যসিদ্ধা স্বরূপ শক্তি। অঘটন ঘটনপটীয়সী যোগমায়ার আবরণে পরকীয়াবৎ প্রতীয়মান বই তো নয়, সুতরাং গোপীগণের সহিত তাঁহাকে যে রাসানন্দে মাতোয়ারা হইতে দেখা যায়, তাহা তাঁহার স্বরূপানন্দে বা আনন্দে বিভোর হওয়া ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ? অগ্নি যদি তাহার দাহিকা শক্তির সহিত আনন্দ করে, পুষ্প যদি তাহার অন্তরস্থ সুরভিকে বুকে জড়াইয়া আলিঙ্গন করে, চন্দ্র যদি হ্লাদিনীকে লইয়া সুখভোগ করে, তবে কি তাহাদিগকে নিন্দার পাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে ? অগ্নির সহিত দাহিকার যে সম্বন্ধ, পুষ্পের সহিত গন্ধের যে সম্বন্ধ, চন্দ্রের সহিত জনরঞ্জনকারী হ্লাদিনীর যে সম্বন্ধ শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার শক্তির সম্বন্ধ তদপেক্ষা আরও নিকট , বিশেষ গোপীগণের সম্বন্ধ আরও নিকট, একেবারে অভেদ বলিলেও হয়। সুতরাং তাঁহাকে গোপীজনবল্লভ, রাধারমণ বিশেষণে বিশিষ্ট করিলেও শ্রুত্যুক্ত আত্মারাম, আত্মকাম বিশেষণের কোন বাধা হয় না। মূল কথা তত্ত্বে তিনি এক। "একমেবা দ্বিতীয়ম্" লীলায় তিনি বহু "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" তত্ত্বে তিনি অদ্বয়, লীলায় তিনি অদ্বয় হইয়াও বহু রূপে

প্রকাশ। সুতরাং তত্ত্বে তিনি নির্ব্বিকার হইলেও লীলায় তিনি আনন্দের ভিখারী, প্রেমের অধীন, স্নেহের কাঙ্গাল। তত্ত্বে তিনি কাহারও দ্বেষ্যও নহেন, প্রিয়ও নহেন, কিন্তু লীলায় তিনি ভক্ত-বশ, ভক্তের সর্ব্বস্ব।

"জলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়।"

তত্ত্ব ও লীলা উভয়ের সাহায্যেই শ্রীভগবানকে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিৎ। শুধু তত্ত্ব ধরিলেও চলিবে না, শুধু লীলা বুঝিলেও হইবে না। কারণ শুধু তত্ত্বের দিক্ দিয়া শ্রীভগবানকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে, সাধকের চির পিপাসিত হৃদয় কখনও শান্তি পাইবে না। তৃষাতুর ব্যক্তি যেমন জল আশে মরুভূমির মাঝে ছুটিয়া গিয়া লাভ করে কেবল কতকটা উত্তপ্ত বাতাস, কতকগুলো দগ্ধ বালুকারাশি, শুধু তাত্ত্বিক জীবনও সেইরূপ জ্বালাময় হইয়া উঠে। আর যাহারা শুধু লীলাবাদী তত্ত্বের ধারও ধারেন না, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঐ সমান অবস্থা ঘটিয়া উঠে। তত্ত্ব শূন্য লীলা, একটা উপন্যাসের গল্প ব্যতীত আর কিছুই নহে। বুঝিতে হইবে তত্ত্ব ও লীলা উভয়ের সংমিশ্রণে। এক চক্ষুতে দর্শন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা-গীতি

(শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু লিখিত)

(আজি) ফাল্গুন সুবাসি, পুণ্য পৌর্ণমাসী
গৌর-পূর্ণশশী হইলা উদয়।
কলি কলুষিত, মায়া বিমোহিত
দীনহীন জীবের করিতে উপায়॥
গৌর গুণগান লীলানুশীলন
করিতে মিলিত ভকত সুজন,
অযাচিত কৃপাকারী ভগবান
পূরাণ সবার আশ,—
যাউক দূরে বিদ্যা বিত্ত কুলমান,
(হউক) অমানী মানদ সুদীন পরাণ
"গৌর হরি" ব'লে, ভাসুক নয়ন জলে
হেরুক চারিদিক শ্রীগৌরাঙ্গময়॥

(আজ) ভক্ত পদরজঃ ধরি মোরা শিরে
ধন্য হব, পাপ পাংশু যাবে দূরে
তরিব দুস্তর ভব পারাবারে
সজ্জন সঙ্গতি নায় ;—
(হবে) নামে রুচি, গৌর নিত্যানন্দে প্রীতি
যুগল উজ্জ্বল রস অনুভূতি
(হবে) কিশোরী কিশোর সেবা পরা মতি
ব্রজধামে শেষে পাইব আশ্রয় ॥
নাম মাত্র সাধন এই কলিকালে,
নামাশ্রয়ে পরম পুরুষার্থ মিলে
এস সাধিনাম মিলিয়া সকলে
ভাই ভাই এক ঠাঁই ,—
হ'যে একপ্রাণ দু'বাহু তুলিয়া
"হরিবোল" বলি গগন ভেদিয়া
স্থাবর জঙ্গম উঠুক নাচিয়া
বলি "জয় জয় হরি নামের জয়" ।

যীশুখৃষ্ট ও হরিদাস ।

(শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত)

অনেক বৈষ্ণব হয়ত যীশুখৃষ্টের নাম শুনিয়াই নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু ধীর ভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, ওরূপ বিদ্বেষ ভাব হৃদয়ে স্থান দেওয়া জীবমাত্রেরই—বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত অন্যায়। কারণ "পরধর্ম্ম নিন্দন" বৈষ্ণবদের একটী অপরাধ। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক পাদ্রীরা হিন্দু ধর্ম্মের নানারূপ কুৎসা করিয়া হাটে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্র তাঁহাদের স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়া গৌরব বোধ করেন এবং তাঁহাদের সমাজও ঐরূপ কার্য্যের যথেষ্ট উৎসাহ দেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম এত উদার যে, সেরূপ করা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই

খানেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশিষ্টতা, বৈষ্ণবধর্ম্ম কোনও দেশবিশেষের বা জাতি বিশেষের নহে, ইহা সার্ব্বজনীন। মহাত্মা শিশিরবাবুর লড্ গৌরাঙ্গ পঠিত হইয়া অনেক পাশ্চাত্য দেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও গৌরাঙ্গ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে; আধুনিক মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত আন্দোলনেও মহাপ্রভুর পূর্ণ প্রভাব দৃষ্ট হয়। আধুনিক আন্দোলনের মূল নীতি মহাপ্রভুর অহিংসা নীতিরই রূপান্তর মাত্র। হিন্দু মুসলমানের একতা, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রভৃতিও মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের নামান্তর। এই আন্দোলন এক্ষণে শুধু ভারতে নয় অন্যান্য মহাদেশেও তুমুল বিস্ময় ও আনন্দ আনয়ন করিয়াছে। এমন কি অনেক দেশে ইহা সাদরে গৃহীতও হইয়াছে। ইহার মূল কোথায় বুঝিলেন ত? অহিংসা নীতি সাত্ত্বিকগুণ বিশিষ্ট সুতরাং ইহার প্রয়োজনীয়তা যে জগতে সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে ইহাব আব বিচিত্রতা কি? যা'ক এ সব রাজনৈতিক আলোচনা আমার রুচি বিরুদ্ধ বিবেচনায় ত্যক্ত হইল, শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের মত এমন উদার সারগ্রাহী সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম জগতে আর দ্বিতীয় নাই। খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপ্রাণ যীশুখৃষ্টও সর্ব্বত্রই প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। যদিও তাঁহাব মতাবলম্বীদের মধ্যেই মারামারি কাটাকাটি বেশী দেখা যায় কিন্তু যীশুখৃষ্টের মূলনীতির মধ্যে হিংসা নাই। যে সব মহাত্মা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ভগবানের অংশ বা কলা। সুতরাং তাঁহাদের নীতি হিংসা প্রকৃতি সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। মহাত্মা যীশুখৃষ্ট যে সময়ে পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন তখন পাশ্চাত্য দেশীয় মানবের 'ধর্ম্ম' বলিয়া যে একটা জিনিস আছে, তাহার ধারণাই ছিল না। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দূর করিবার জন্যই তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি নানা রূপে উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। তিনি নানারূপ সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন তন্মধ্যে তাঁহার ক্ষমাগুণ জগতে শিক্ষনীয়। অত্যাচারীর প্রবল পীড়নে তিনি যখন ক্রশ বিদ্ধ হন তখন তিনি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন —"হে প্রভো! যে সব মূর্খ, অজ্ঞ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পাপীরা আমাকে উৎপীড়িত করিতেছে তাহাদিগকে তোমার প্রেম দাও।" এ চিত্র দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই আদর্শ। এই মহাপ্রাণ যীশুখৃষ্টের হৃদয়ের সহিত বৈষ্ণবকুল শিরোমণি হরিদাসের সাদৃশ্য দেখা যায়। যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিদাস হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত হরিনাম উচ্চারণ করেন এই কথা কাজি মুলুকের অধিপতি স্থানে নিবেদন করিলেন, মুলুকাধিপতি হরিদাসকে আহ্বান করিয়া মধুর বাক্যে

কোরাণোক্ত ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল, হরিনামামৃতের মধুর আস্বাদন যিনি পাইয়াছেন তিনি কি আর কাঞ্চন বিনিময়ে কাচ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন? যিনি কাল ভয় নিবারক নামসুধা অবিরত পান করিতেছেন তিনি কি সামান্ত মুলুকাধিপতির ভয়ে ভীত হন? অবশেষে মুলুকাধিপতি কাজিকে বিচারের ভার অর্পণ করিলে তিনি বলিলেন—যখন হরিদাস স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া কাফেরের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তখন তাহাকে বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া তাঁহার প্রাণ লওয়াই উপযুক্ত শাস্তি। রাজাজ্ঞায় পাইক সকল সত্বর হরিদাসকে ধৃত করি। নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতে করিতে বাইশ বাজার ভ্রমণ করাইলেন। নামানন্দে হরিদাস কিছুমাত্র দেহ দুঃখ অনুভব করেন নাই, পাপীগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দয় ভাবে প্রহৃত হইয়াও তিনি তাঁহাদের জন্তই হৃদয়ে গভীর দুঃখানুভব করিতে লাগিলেন।

"সবে যে সকল পাপিগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে॥
এসব জীবেরে কৃষ্ণ করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সভার অপরাধ॥" (চৈতন্ত ভাগবত)

কি অদ্ভুত হৃদয়ের উদারতা! ভক্ত পাঠকগণ! আপনারা একবার হৃদয়পটে ক্রশ বিদ্ধ যীশুখৃষ্টের পার্শ্বে প্রহার জর্জ্জরিত হরিদাস প্রভুর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সাদৃশ্য অনুভব করুন। হরিদাস প্রভুর অনন্ত গুণ কীর্ত্তন করিবার সাধ্য আমার নাই এবং তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ও নহে। মহাপ্রভু শ্রীমুখ নিঃসৃত একটী শ্লোকে জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥"

এই শ্লোকোক্ত উপদেশ হরিদাস প্রভু নিজে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া জগতে বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের একটী আদর্শ চিত্রের সহিত খৃষ্টধর্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশুখৃষ্টের সাদৃশ্য লোকসমক্ষে প্রকটিত করিয়া তাঁহার এবং তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব জগতে ঘোষণা করাই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কৃপাময় বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপা করুন।

—•—

"অদ্বিতীয়"

শ্যামল আমার ভুবন মাঝারে
হেরেছি নয়নে একা কি তোমারে ?
এত মাদকতা এত আকর্ষণ
কোথাও ত বোধ করিনি কখন ?
এ হেন মধুর চাঁদিনী নিশায়
প্রাণ ভরে উঠে তোমারই আশায় ।
বৃথা আশা ধরি' কেঁদে উঠে প্রাণ,
বিফলে কি নিশা হবে অবসান ?
হায়, কার অভিশাপে এ দশা আমার
এ হিয়ায় শুধু ঘোর হাহাকার ।
সকলেই সুখে ভাসিয়া বেড়ায়
সুখ নাই শুধু আমারই হিয়ায় ॥
নয়নের মণি শ্যামল আমার
মধু নিশা হায় হেরি অন্ধকার !
কত শোভা নাথ হেরেছি নয়নে
তোমা বিনা সবই জ্বালা দেয় প্রাণে ॥
সব শোভা বুঝি আপনি লইয়ে
দেখা দিলে হৃদি- শোভন হইয়ে ।
নয়ন রঞ্জন তোমার মতন
ত্রিভুবনে আর নাহি একজন ॥
তোমা বিনা কিছু চাহিনাক আর ।
আন্ সুখ হেরি সকলই অসার ॥

"স্নেহলতা"

———

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত)

(ভূমিকা)

প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ হইতে চলিল, প্রেমের দেবতা, আমাদের এই বঙ্গ-ভূমিতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই প্রেমের দেবতা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণ ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর এই জীবাধমের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউন। আজি আমি এক দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যাঁহাদের করুণা বর্ষণে, সুদূর অতীতে আমাদের এই বঙ্গভূমি—শুধু বঙ্গভূমি কেন, আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, মধুর মৃদঙ্গধ্বনি ও ভুবনমঙ্গল হরিনাম সংকীর্ত্তনে বঙ্গদেশ ও উৎকল ভূমি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল—সেই অভিন্ন ভ্রাতৃ-যুগল শ্রীশচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ও শ্রীপদ্মাবতী নন্দন নিতাইচাঁদের শরণাগত হইয়া এই গ্রন্থ রচনা রূপ কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম।

দয়াল নিতাইর অশেষ কৃপাপাত্র অশীতিপর বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে ভয়ে ভয়ে লিখিয়াছেন,—"গৌর নিতাইর লীলা অগাধ ও অনন্ত, যাহার যতটুকু শক্তি তিনি ততটুকু মাত্র আয়ত্ব করিতে পারেন। যেমন অনন্ত আকাশে ক্ষুদ্র পক্ষী কতটুকু উড়িতে পারে বা রাঙ্গাটুনি পাখী পিপাসার্ত্ত হইয়া সমুদ্রের জল কতটুকু পান করিতে পারে? আমিও তদ্রূপ এই লীলার এক কণা মাত্র স্পর্শ করিলাম।"

আমি এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রাচীন ও আধুনিক বহু ভক্ত গ্রন্থকারের সাহায্য গ্রহণ করিব। এবং—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ॥

গোলকগত শ্রীল শিশির বাবুর অমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থ হইতেই আমি সর্ব্ব প্রথম

এই সুমধুর শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা আস্বাদ করিতে পারিয়াছি। সেই স্মৃতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্ত আজ পরম আনন্দিত চিত্তে এই ক্ষুদ্র ও অধম গ্রন্থকার তাহার দুর্ব্বল লেখনী প্রসূত গ্রন্থের নাম শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত রাখিতেছে।

শ্রীচৈতন্তদেবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের জীবন কথা যুগপৎ ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত, তাঁহার জীবনের এই পবিত্র গ্রন্থি ছিন্ন হইবার নহে। সুতরাং স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্ত দেবের জীবন কথাও ইহার মধ্যে আলোচিত হইবে। আশা করি লিপি-কৌশলে না হউক অন্ততঃ বিষয় গৌরবে এই গ্রন্থ ভক্ত পাঠকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইবে।

"জয়রে জয়রে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর, জয় নিত্যানন্দ রায়।
জয় সীতানাথ জয় গৌর ভক্তগণ, সবে মোরে দেহ পদছায়॥"

প্রথম অধ্যায়।

(জন্ম ও বংশ বৃত্তান্ত।)

"রাঢ় দেশে, নাম একচক্রা গ্রাম,
হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী,
জনমিলা হলধর॥
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত,
পুত্র মহোৎসব করে।
ধরণী মণ্ডল, করে টলমল,
আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুর নাথ মনে হরষিত,
করি কিছু অনুমান॥
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা,
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন, হইল প্রসন্ন,
আনন্দ সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার,
কহে দীন কৃষ্ণদাসে॥"

১৩৯৫ শকের মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে, শ্রীনিত্যানন্দ দেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত মৌড়েশ্বর থানার অধীন এক চাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিত নামে এক ধর্ম্ম পরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তিনি বড়ই পতিব্রতা ছিলেন, ইঁহারাই নিত্যানন্দের জনক জননী।

লুপলাইনের মল্লারপুর ষ্টেশনে নামিয়া একচাকা গ্রামে যাওয়া যায়। এক সময়ে এই গ্রাম বড়ই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, এক্ষণে তাহার অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম বক্রেশ্বর। এখানে বক্রেশ্বর নামে এক শিব আছেন। পুরাকালে পাণ্ডবগণ কিছু দিন এই একচক্রা নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময় ভীম কর্তৃক এই স্থানে বক রাক্ষস বধ হয়। এই গ্রামেও একচক্রেশ্বর নামে এক শিব আছেন তাহার বিশেষ খ্যাতি আছে।

পূর্ব্বে এই গ্রামে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির বাসস্থান ছিল। কিম্বদন্তী এইরূপ, একদিন এই গ্রামের জনৈক জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই গ্রামে বলরামের অবতার হইবে। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার কথা যে সত্য হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার বংশ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার পিতামহ সুন্দরামল্ল ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ধনশালী ছিলেন এবং তাঁহার ক্রিয়া-কর্ম্মও পূর্ব্ব কালীন সাত্বিক ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ছিল, ইঁহারা রাঢ়ি শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের খ্যাতি ওঝা এবং গাঁই সুন্দরামল্ল বন্দ্যঘটি। তিনি ধন ও চরিত্র গৌরবে দেশে সমাজপতি-যোগ্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান্ বোধ হয় মানুষকে সর্ব্ব প্রকারে সুখী করেন না। তাঁহার এক নিদারুণ মনোকষ্ট ছিল যে, তাঁহার সন্তান হইয়া বাঁচিত না। এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই মনকষ্টে থাকিতেন।

একদিন রজনীযোগে বিপ্র স্বপ্নে দেখিলেন জনৈক দিব্যকান্তি মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন—"বৎস! মনোকষ্ট দূর কর, অচিরে তোমার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে এবং তোমার পৌত্র দ্বারা বংশ-গরিমা উজ্জ্বলীকৃত হইবে।" ব্রাহ্মণ আনন্দে সে রাত্রি আর ঘুমাইতে পারিলেন না। ক্রমশঃ তাঁহার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। পূর্ব্বে সব পুত্র গুলিই হইয়া মারা গিয়াছে, তাই ছেলেটাকে তিনি শিবঠাকুরের নিকট সমর্পণ করিয়া ছিলেন আর তাচ্ছিল্য করিয়া তাহার নাম হাড়াই রাখিলেন। হাড়াইএর ভাল নাম যে মুকুন্দ ছিল তাহা আমরা নিম্নোক্ত শ্লোকে জানিতে পারিয়াছি। যথা বৈষ্ণব বিধান, -

"তথা পদ্মাবতী শ্রীল মুকুন্দৌ দ্বিজসত্তমৌ।
নিত্যানন্দ স্বরূপস্য পিতরাবতুল শ্রিয়ৌ॥"

হাড়াই ক্রমশঃ বড় হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। পিতা সুন্দরামল্ল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের পদ্মাবতী নাম্নী স্বশ্রেণীর সম্রান্ত বংশীয় একটী সুশ্রী বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। যথাকালে পিতামাতার পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে তিনি মহা সমারোহে তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাঁহাদের অনেক যজমান ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবসা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও সচ্চরিত্রতার জন্য চতুর্দ্দিকে যশঃ সৌরভ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

হাড়াই পণ্ডিতের পত্নী, দেবী পদ্মাবতী দেব দ্বিজে ভক্তিমতী ও পতিব্রতা ছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত প্রীতির সহিত বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন।

"অনন্ত বৈষ্ণব বিষ্ণু-ভক্তি তত্ত্ব জ্ঞাতা।
পরম বৈষ্ণবী তাঁর পত্নী পতিব্রতা॥
সে দোঁহার চরিত কহিতে সাধ্য নয়।
জগতের মাতা পিতা হেন জ্ঞান হয়॥
প্রশংসে সকলে দেখি অতি শুদ্ধাচার।
অতি প্রীতি বিষ্ণু আরাধনায় দোঁহার॥"

এইরূপে অতীব সুখে দ্বিজ-দম্পতি কালক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু একটী দুঃখ অহর্নিশি তাঁহাদের মনের মধ্যে জাগিতেছে, তাঁহারা অপুত্রক। এ পর্য্যন্ত কোন সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে নাই।

একদিন রাত্রে পদ্মাবতী দেবী স্বপ্নে দেখিলেন, একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে "বৎসে! দুঃখ পরিত্যাগ কর। তোমাদের বহু পুণ্যফলে ভগবান্ পাপীদের পরিত্রাণের জন্য তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন।" পদ্মাবতী এই সুস্বপ্ন দেখিয়া বড়ই আনন্দিতা হইলেন।

কিছু দিন পরে পদ্মাবতী গর্ভবতী হইয়াছিলেন। এই গর্ভেই শ্রীনিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার জন্ম হইতে গ্রামের অমঙ্গল দূর হইয়া সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অদ্বৈত প্রকাশে আছে—

"তেরশত পঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে॥"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আহ্বানে ও হুঙ্কারে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

নরহরি বলিতেছেন, প্রভু নিত্যানন্দও সেইরূপ অদ্বৈতের আহ্বানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আসুন পাঠক আমরা নিম্নোক্ত পদে জন্মোৎসবের আনন্দের অংশ গ্রহণ করি,—

কামোদ।

"কিবা একচক্রা পুরে, হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে,
অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ॥ ধ্রু॥
অতি সুকোমল তনু, হেম নবনীত জনু,
শোভায় ভুবন বিমোহিত।
চন্দ্র মুখ নিরখিয়া, উল্লাস না ধরে হিয়া,
পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিত॥
শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে, গর্জ্জয়ে আনন্দ ভরে,
তিলেক হইতে নারে স্থির।
নাচে পহুঁ ঊর্দ্ধবাহে, কাঁখ তালি দিয়া কহে,
আনিলু আনিলু বলবীর॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ,
জয় জয় ধ্বনি অনিবার।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত, করে বাদ্য শত শত,
গায় গুণ সুখের পাথার॥
ওঝা মহা ভাগ্যবান, পুত্রের কল্যাণে দান,
করে যত লেখা নাই দিতে।
কত না যৌতুক লঞা, লোক সব আসে ধাঞা,
মহা ভীড় গৃহে প্রবেশিতে॥
ধন্য রাঢ় মহী আর, ধন্য সে নক্ষত্র বার,
ধন্য মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
নরহরি কহে ভাল, ধন্য ধন্য কলিকাল,
প্রকটে খণ্ডিল দুঃখ রাশি॥"

নিতাইচাঁদ ভূমিষ্ট হইলে বাড়ীতে ঘন ঘন উলুধ্বনি হইতে লাগিল। পুত্রমুখ দর্শন করিয়া ওঝা দম্পতীর আনন্দের আর সীমা নাই। ছেলে সূতিকাগৃহ আলো করিয়া বিরাজ করিতেছে, সকলে বলিল এমন ভুবন মোহন শিশু তাহারা

আর কখন দেখে নাই। গ্রামের নারীগণ অনিমিষ নয়নে সে রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। যথা—

"আগে জনমিয়া নিতাই চাঁদ।
পাতিলা আসিয়া করুণা ফাঁদ॥
নারীগণ সবে দেখিতে যায়।
সভারে করুণ নয়ানে চায়॥
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে।
রূপ হেরি তার নয়ন ঝুরে॥
দেখি সবে মনে বিচার করে।
এই কোন মহাপুরুষ বরে॥
দেখিতে দেখিতে বাড়য়ে সাধ।
ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ॥
মনে করি ইহায় হিয়ায় ধরি।
নয়ানে কাজর করিয়া পরি॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা।
এ হেন বালক দিলা বিধাতা॥
এত কহি কারু নয়ান দিয়া।
আনন্দের ধারা পড়ে বহিয়া॥
কারু স্তন বহি দুগ্ধ ঝরে।
কেহ যায় তারে করিতে কোরে॥
এ সব বিকার রমণীগণে।
শিবরাম আশা করয়ে মনে॥"

পিতামাতার পরম স্নেহে পূর্ণিমার শশীকলার ন্যায় নিত্যানন্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বালকের আকৃতি অতি সুন্দর, রং একেবারে কাঁচা সোণার ন্যায়, দেখিলে নয়ন আর ফিরাইতে পারা যায় না, সকলেই বলিত মনুষ্যের এত রূপ সম্ভবে না, বালক সকলেরই নয়নমণি হইয়াছিল। যে দেখিত একবার কোলে না লইয়া থাকিতে পারিত না। ক্রমশঃ জানুযোগে হাঁটিতে শিখিলেন। সে দৃশ্য বড়ই মনোরম, যে দেখিত শিশু নিতাইকে কোলে তুলিয়া লইত। ছেলেটিকে কোলে লইলে হৃদয়ে এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইত।

পিতা একদিন শুভদিন দেখিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন করাইলেন। তাহার পর নামকরণ সময়ে তাঁহার নাম রাখা হইল "কুবের"। কিন্তু "রাম" ও "নিত্যানন্দ" নামেই তিনি অধিকতর পরিচিত হইলেন।

নিতাই এখন হাঁটিতে পারেন। মা ছেলেকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া পরিস্কার করিয়া দিতেন, চুলগুলি আঁচড়াইয়া দিতেন, ছেলে কিন্তু ধূলা মাখিতে মজবুত। সর্ব্বদা ধূলা মাখিয়া অপরাপর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেন। মা দেখিতে পাইলে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইতেন। কাদা ধূলা মাখিয়া নিতাইর অঙ্গ কান্তি যেন বাড়িয়া যাইত। মা, ছেলেকে নাওয়াইবার সময় মাঝে মাঝে হরিদ্রা মাখাইয়া দিতেন। নিতাইর লাবণ্যর নিকট কিন্তু হরিদ্রা পরাজিত হইত।

"পুত্রের সৌন্দর্য্য লাগি হরিদ্রা মাখায়।
হরিদ্রা মলিন হয় সে অঙ্গ ছটায়॥"

মাতা সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া সযত্নে পুত্রকে স্নান করাইয়া "রক্ত প্রান্ত নীলপট্ট ধড়া পরাইয়া" ঘরে বসি খেলা করিতে বলেন। মায়ের কথায় ছেলে হাসিয়া উঠে, বলে মা ঘরে সঙ্গী কোথা পাব যে খেলাইব।

ক্রমশঃ নিতাই বড় হইতেছেন। তাঁহার অনেক খেলার সঙ্গী জুটিল। সে খেলাও এক বিচিত্র রকমের। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ যে সব লীলা করিয়াছিলেন নিতাই ক্রীড়াছলে সেই সমস্ত অভিনয় করিয়া দেখাইতেন। আর এই সমস্ত বিচিত্র ক্রীড়া দেখিয়া সাধু ব্যক্তিগণ অনুমান করিতেন এই বালকের দেহে শ্রীভগবানের শক্তি রহিয়াছে। এবং বালক—

"শিশু হইতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান।
জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের ধাম।"

যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয় সেই দিন নিতাই স্বীয় গ্রামে থাকিয়া এমন হুঙ্কার করিয়াছিলেন যে, সেই হুঙ্কার শুনিয়া যাবতীয় লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। সকলে অনুমান করিয়াছিলেন যে, গ্রামাধিষ্ঠিত দেবতা মৌড়েশ্বর দেবই এত গর্জ্জন করিয়াছেন। বালক নিতাই নিজকে গোপন রাখিয়া মহানন্দে শিশুগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এখন এই ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার পূর্ব্বাবতারের লীলাভিনয়ের কথাই আমরা বলিব।

একদিন নিতাই বালসঙ্গীগণকে লইয়া পুরাণ বর্ণিত দেবসভা করিলেন। বালকগণ কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, কেহ ইন্দ্র, কেহ বায়ু, কেহ বরুণ প্রভৃতি সাজিয়া সেই সভায় বসিয়াছেন। কেহ গান করিতেছে, কেহ মন্ত্র পাঠ করিতেছে, কেহ স্তব করিতেছে। এমন সময় একজন বালক "ধরণীর বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া সেই সভায় জানাইল "হে দেবগণ! আমি পৃথিবী, দৈত্যগণের উৎপীড়নে বহুকাল যাবৎ কষ্ট ভোগ করিতেছি এখন আর এই কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারিতেছিনা। আপনারা সকলে মিলিয়া আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।" এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ধরণীকে সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গমন করার ন্যায় বালকগণ নদীর তীরে গমন করিয়া নিতাইর শিখান মত উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিল। একটী বালক পূর্ব্ব হইতেই গাছের উপর লুকাইয়াছিল, সে তথা হইতে দৈব

বাণী করিল—"দেবগণ। ব্যস্ত হইও না আমি শীঘ্রই মথুরায় যাইয়া অবতীর্ণ হইব এবং দৈত্যভাব হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিব।"

একদিন রাত্রে সকলে মিলিয়া বসুদেব দেবকীর বিবাহ অভিনয় করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা। বালকদিগের মধ্যে কেহ কংস, কেহ দেবকী, কেহ বাসুদেব প্রভৃতি সাজিয়াছে। ভেরেণ্ডা গাছ দিয়া কংস কারাগার প্রস্তুত হইল। তথায় গভীর নিশিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসূত হইলে বন্দিগণ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তখন বসুদেব পুত্রকে কোলে লইয়া যমুনার অপর পারে গোকুল নগরে নন্দঘোষের বাড়ীতে রাখিয়া তথা হইতে মহামায়াকে লইয়া আসিলেন। এইরূপে কংসকে বঞ্চনা করা হইল।

ক্রমশঃ

প্রাচীন কীর্ত্তি

বহুদিন হইতে বহুবার আমরা বলিয়া আসিতেছি যে, নিত্যনূতন মতের সৃষ্টি না করিয়া যাহা প্রাচীন আচার্য্যগণের মতানুমোদিত, যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণ করিয়া গিয়াছেন কালের স্রোতে হয়ত অনেকস্থলে সে সকল অনুষ্ঠান লোপ পাইয়াছে, কোথাওবা নামমাত্র ক্রিয়া বজায় আছে। সেইগুলি যাহাতে রক্ষা হয় তাহার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অগ্রসর হউন, কিন্তু কি যে প্রভুর ইচ্ছা তাহা তিনিই জানেন সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই সকলেই নিজের নিজের মত প্রচারে ব্যস্ত। কাসিমবাজার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী বৈষ্ণব সমাজের অনেক কার্য্য করিবেন বলিয়া অনেক সময় আশা দিয়াছিলেন কিন্তু আশানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

আমরা সম্প্রতি আগড়পাড়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতি সম্মিলনী হইতে একখানি ছাপান পত্র পাইয়াছি উক্তপত্র পাঠকগণের অবগতির জন্য পত্রখানি নিম্নে অবিকল মুদ্রিত করিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন, পানিহাটী রাঘবভবন হইতে গদাধর অঙ্গনে গমনাগমন কালে এই আগড়পাড়া গ্রামের উপর দিয়াই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গিয়াছেন। আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যাহাতে প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট দিনে দলাদলি ভুলিয়া বৈষ্ণববৃন্দ মিলিত হইয়া প্রভুর স্মৃতি উৎসব সুসম্পন্ন হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। আমাদের প্রাপ্ত পত্রখানি এই—

আগড়পাড়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতি সম্মিলনী

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেইতো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥" (শ্রীচরিতামৃত)

চারিশত বর্ষ পূর্ব্বের জয়ানন্দের 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গল" গ্রন্থে আছে—

"গঙ্গার দুকুল গ্রাম দেখি রম্য স্থান।
যথা যথা নিত্যানন্দের হৈলা অধিষ্ঠান ॥"
"আগড়পাড়া, কুমারহট্ট চৌহাটা।"
"গ্রামে গ্রামে নগরে সেবক প্রতি ঘরে।
চৈতন্য আনন্দে নিত্যানন্দ নৃত্য করে ॥"

মূর্ত্তিমন্ত প্রেম শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কিত পবিত্র ভূমি আগড়পাড়া গ্রাম। এই গ্রামের বক্ষের উপর দিয়াই সেই "গৌর প্রেমের পাগল নিতাই"— আমাদের দ্বাদশ গোপাল ও অসংখ্য ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে নাচিতে নাচিতে "রাঘবভবন" হইতে "গদাধর অঙ্গনে গমনাগমন করিতেন। এবং পুরীধাম হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের আজ্ঞায় শ্রীনিতাইচাঁদ—"আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।" বলিতে বলিতে "গজেন্দ্র গমনে, সকরুণ দিঠে" এইস্থানের উপর দিয়াই আগমন করিয়াছিলেন।" (ইহাই যাতায়াতের একমাত্র পথ) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুও বরাহনগরে শ্রীভাগবত আচার্য্যের গৃহে গমন কালিন এই গ্রামের উপর দিয়াই বিজয় করিয়াছিলেন। অধিকন্তু প্রাচীনকালে এই গ্রামে শ্রীগৌরভক্তগণও বিরাজ করিতেন, নতুবা কাহাদের আকর্ষণে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু "আগড়পাড়ায়" "সেবকের ঘরে ঘরে—অধিষ্ঠান করিয়া" "নৃত্য করিতেন।"

দুঃখের বিষয়, সেই সমুদয় পুণ্য শ্লোক ভক্তগণের নাম, আজ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি—জানি না কবে কোন কীট দংষ্ট জীর্ণ পুঁথি আমাদের সেই ভুবন পাবন শ্রীগৌর ভক্তগণের আনন্দ বার্ত্তা প্রদান করিয়া আমাদের এই পল্লী জননীকে অধিকতম গৌরব শিখরে আরোহণ করাইবে।

এক্ষণে ভক্ত এবং শ্রীভগবানের পদরজঃপূত আমাদের এই আগড়পাড়া পল্লীতে

যাহাতে অতীতের সেই আনন্দ দায়ক স্মৃতি রক্ষিত হয়, তাহারই উদ্দেশ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা ও বার্ষিক উৎসবের ক্ষুদ্র আয়োজন। কিন্তু "সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ" শ্রীভগবানের শ্রীনাম শ্রবণ কীর্ত্তন ভিন্ন আর কিরূপে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষিত হইতে পারে ?

এজন্য অত্র সম্মিলনীর দীন সেবকগণের করজোড়ে বিনয় পূর্ব্বক সমুদয় ভক্তগণের নিকট, শ্রীসংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের নিকট, সুধী ও পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট একান্ত অনুরোধ, হে অদোষদরশী পরম করুণ সাধু মহাত্মাগণ! নিম্নোক্ত উৎসব দিবসে অত্র শ্রীসম্মিলনী গৃহে শুভাগমন পূর্ব্বক কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীনামমহিমা কীর্ত্তনে, আমাদের প্রাণে অতীতের সেই সুমধুর স্মৃতি জাগরুক করাইয়া আমাদের ধন্য করিবেন—আমাদের উদ্ধার করিবেন, ইহাই সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

আমরা বহির্ম্মুখ জীব, সাধু মহাত্মাগণের আবাহন প্রণালীও অবগত নহি, এজন্য নিজ গুণে আমাদের সকল ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি—

কার্য্য বিবরণ।

২৬ চৈত্র শুক্রবার অধিবাস

২৭ " শনিবার হরিবাসর

২৮ " রবিবার নগরকীর্ত্তন, বৈকালে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন

আগড়পাড়া, কামারহাটী পোঃ   বিনয়াবনত--ভক্তকিঙ্কর
(২৪ পরগণা।)   শ্রীরামধন দেবশর্ম্মা
তারিখ ২৩।১২।১৩৩২ সাল।   প্রভৃতি সেবকগণ।

চাপাল গোপাল উদ্ধার

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত)

নবদ্বীপ ভরিয়া রব উঠিয়াছে হরিবোল! হরিবোল! এই ভক্তির স্রোতে নবদ্বীপবাসী দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। জীবের নয়ন সমক্ষে এ যে এক অভিনব প্রেম সম্পদ। প্রভুর কৃপায় শোক তাপ দারিদ্র্যরূপ অনলে দগ্ধ কলির মলিন জীব

গোলকের সুধা ঝলকে ঝলকে যাহা প্রতি নিয়ত ঝরিতেছে তাহা আস্বাদ করিবার অধিকারী হইয়াছে। যাঁহারা প্রভুর ভক্ত তাঁহারা প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মানিয়াছেন, তাঁহাদের বদন ভরিয়া শান্তির সুবিমল স্নিগ্ধতা দেখা দিয়াছে। চিত্ত ক্ষেত্রে প্রতি নিয়ত প্রেমের পুলক স্পন্দন জাগিতেছে।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক, যাহারা প্রভুর ভক্ত হইবার সৌভাগ্য এখনও লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা প্রভুর দলকে বড়ই ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেছিল তাঁহাদের মধ্যে চাপাল গোপাল একজন। এখন এই চাপাল গোপালের কাহিনী শ্রবণ করুন।

চাপাল গোপাল বড়ই তেজীয়ান ব্রাহ্মণ। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি লইয়াই থাকিতেন। কীর্ত্তনাদিকে বড়ই ঘৃণা করিতেন, আবার শ্রীবাসের বাড়ী এই কীর্ত্তন হইত বলিয়া, তিনি শ্রীবাসকে বড়ই ঘৃণা করিতেন এবং তাঁহার উপর তাহার বিশেষ ক্রোধও ছিল।

একদিন শ্রীবাসের গৃহে রাত্রিকালে যখন কীর্ত্তন হইতেছিল, তখন চাপাল গোপাল তাহাকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহার বাটীর বাহিরে দরজার নিকটে তান্ত্রিকগণ যেরূপ পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ পূজার সজ্জা করিয়া রাখিলেন। তাহার সহিত এক ভাণ্ড মদ্যও রাখা হইল। কীর্ত্তনান্তে প্রাতে যখন দরজা খোলা হইল তখন সকলে এই কাণ্ড দেখিলেন। বুঝিলেন যে, উহা চাপাল গোপালের কার্য্য। পাড়ার লোককে ডাকাইয়া ইহা দেখান হইল। শ্রীবাস চাপাল গোপালকে কিছুই বলিলেন না, হাড়ী ডাকাইয়া সে স্থান পরিষ্কার করাইলেন।

ভক্তের অপমান ভগবান সহ্য করেন না। দুই দিবস পরে, চাপাল গোপালের কুষ্ঠ রোগ হইল। তিনি টোলে ছাত্রগণকে পড়াইতেছেন। ছাত্রগণ দেখিতেছেন তাঁহাদের অধ্যাপকের অঙ্গুলিগুলি ফুলিয়াছে। তাহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চাপাল দম্ভ করিয়া বলিলেন, তোমরা যাহা ভাবিতেছ, উহা তাহা নয়, আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ শিব পূজা করিয়া থাকি, আমার কেন ওরূপ কুৎসিৎ ব্যাধি হইবে ?"

কিন্তু ব্যাধি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তিনি স্ত্রী পুত্রকে বড়ই যন্ত্রণা দিতেন, তাহারা এখন আর তাহাকে যত্ন করিল না। বাহিরে একখানি চালা বান্ধিয়া, সেইখানে চাপালকে থাকিতে দিল। স্ত্রী নাসিকায় বস্ত্র বাঁধিয়া দূরে এক মুষ্টি অন্ন দিয়া পলাইতেন। চাপালের দুর্দ্দশার সীমা নাই। তিনি সেই অন্ন আহার করিয়া যষ্টি ভর করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন।

একদিন কোন দয়ালু লোকের পরামর্শে নিমাই যখন স্নান করিতে আসিতেছেন অমনি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত, শুনিয়াছি তুমি একজন বড় সাধু হইয়াছ, লোকের ব্যাধি ভাল করিতে পার। আমার ব্যাধিটী ভাল করিয়া দাও না। বিশেষতঃ আমি তোমার স্বগ্রামবাসী এবং তোমার সহিত গ্রাম্য সম্পর্কও আছে।"

চাপালের মনের কালিমা তখনও দূর হয় নাই। তাই তাহার বাক্যে কাতরতা ছিল না। যেন একটা অনুরোধ মাত্র। তাই প্রভু তখনই ভগবান ভাবে প্রকাশ পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তুমি ভক্তদ্রোহী, তোমার কুষ্ঠ হইয়াছে, এত সামান্য কথা, তোমাকে অনেক দুঃখ পাইতে হইবে। এই কথা বলিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন।

ক্রমে ব্যাধির যাতনায় কাতর হইয়া চাপাল দেশত্যাগ করিয়া বারাণসী ধামে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট ব্যাধির শান্তির নিমিত্ত হত্যা দিয়া পড়িলেন। স্বপ্নে বাবার প্রত্যাদেশ পাইলেন যে, নবদ্বীপে যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু, তিনি সেই গোলকের হরি। কাতরভাবে তাঁহার চরণ ধরিয়া পড়, তিনিই তোমার রোগ শান্তি করিয়া দিবেন। চাপাল বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

পাঁচ বৎসর পরে কুলিয়া গ্রামে প্রভুর দর্শন পাইলেন। প্রভুর সন্ন্যাস জীবন, জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য নীলাচল হইতে আসিতেছেন। প্রভুকে দেখিয়া সকাতরে তাঁহার চরণ ধরিয়া পড়িলেন। বলিলেন, অনাথের নাথ প্রভু, কৃপা কর, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

তখন দীনদয়ার্দ্র নাথ প্রভু আমাদের তাহার আর্ত্তি দেখিয়া বড়ই কৃপা করিলেন এবং বলিলেন, তুমি শ্রীবাসের নিকট অপরাধী তাঁহার পাদোদক পান কর, আরোগ্যলাভ করিবে।" চাপাল তাহাই করিয়া যুগপৎ দেহ রোগ ও ভবরোগ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর পরম ভক্ত হইয়াছিলেন।

চাপাল গোপাল কি ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্বরচিত এই গীতটি হইতে জানিতে পারা যায়—

পরম করুণ হে প্রভু, নিতাই গৌর তোমরা দু'ভাই।
(আমি) গিয়াছিনু কাশীপুরে, আমায় ক'য়ে দিলেন বিশ্বেশ্বরে-
পূর্ণব্রহ্ম শচীর ঘরে।
আমি পীড়ার জ্বালায় জ্বলে মরি।
আমায় উদ্ধার কর হে গৌরহরি॥

চয়ন

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট সংগৃহীত)

মহাভারতোক্ত 'নারায়ণীসেনা ও বৈষ্ণব উপনিবেশের আবিষ্কার।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়া কৌরবগণকে "নারায়ণী সেনা" নামক অদম্য একদল বৈষ্ণবী সেনা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন দেখা যায়। তাহার পর আর কোন ইতিহাসে "বৈষ্ণবী সেনার" কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। আমরা নাই খোঁজ রাখি, কিন্তু "বৈষ্ণবী সেনাদলের" অস্তিত্ব তৎপরেও বহুকাল পৃথিবীতে ছিল। এতদিন পরে তাহার একটা নিদর্শন বাহির হইয়াছে, আর সে নিদর্শন ভারতে কিম্বা ভারতের পশ্চিমাংশে নহে, ভারতের বাহিরে পূর্ব্বাঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।

কএক বৎসর পূর্ব্বে কর্ণেল জেরিণী তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ এক শিলালিপি শ্যামদেশে প্রাপ্ত হন। তিনি সেখানি ইংলণ্ডে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিকে উপহার দেন। গত ১৯১৩ খ্রীঃ অঃ এপ্রেল সংখ্যার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ডাক্তার হুল্জ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উহাতে জানা যায় প্রস্তর লিপিখানি ৮ম বা ৯ম শতাব্দীর বস্তু। লিপিখানি অংশত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে অংশটুকু পড়া যায় তাহা হইতে হুল্জ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারত হইতে একদল মনিগ্রামম্ (বণিক সঙ্ঘ) দূর শ্যামদেশে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া সেখানে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিলেন। এই উপনিবেশ তামিল সেনাদ্বারা সুরক্ষিত থাকিত। বিষ্ণু স্থাপনকারী বিজয়ী সেনাদল বৈষ্ণবী—সেনার সেনা—মুখদল (অগ্রবর্ত্তী সেনাদল) বিষ্ণুমন্দির আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেন।" উহারাই নারায়ণী সেনা। ডাক্তার হুলজ আরও বলেন যে—"এই তামিল বৈষ্ণব সেনা যে ব্রহ্মদেশে ও সুমাত্রায় উপনিবেশ করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ—"এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা" ৭ম ভাগ ১৯৭ পৃষ্ঠা এবং বটেভিয়ার প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত দ্রব্যের তালিকায় ১৮৮৭ খৃঃ অঃ ৪২ সংখ্যার ৩৮৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।"

(ভারতবর্ষ ১৩২০ আষাঢ়)

কল্পান্তর

(শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন লিখিত)

একই উপাখ্যান একাধিক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের বর্ণনায় কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের নানারূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে এবং নানারূপ উত্তর দেওয়াও হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের সুধীগণ যে সব উত্তর দিয়াছেন তাহা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। সে আলোচনায় এখন প্রয়োজন নাই। আমরা জানিতে চাই পৌরাণিকগণ কি বলেন? পৌরাণিকগণ বলেন, কল্পভেদ ইহার কারণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এমন কথা আছে, যাহা অন্য পুরাণে নাই এবং যাহার সহিত অন্যান্য পুরাণের সামঞ্জস্য করা খুবই কঠিন, অনেক স্থলে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কল্পান্তরের, একথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেই আছে। শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নারায়ণ ঋষি নারদকে বলিলেন—

"যত্রকল্পে তথা চেয়ং তত্র ত্বমুপবর্হণঃ।
পঞ্চাশৎ কামিনীনাঞ্চ পতির্গন্ধর্ব্ব পুঙ্গবঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের জন্মকথা ও বাল্যলীলা বলিতে বলিতে নারায়ণ ঋষি নারদকে বলিলেন, হে নারদ, তুমি সে কল্পে উপবর্হণ নামে পরিচিত গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলে, এবং তোমার পঞ্চাশটি পত্নী ছিল, এই সব কথা সেই কল্পের। তুমি তখন সেই রমণীগণকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে। তাহার পর তুমি ব্রহ্মার অভিশাপে দাসীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। এই দ্বিতীয় জন্মে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও সাধুসঙ্গের প্রভাবে শ্রীভগবানে তোমার ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মে। এখন, এই বর্ত্তমান কল্পে, তুমি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছ ও দেবর্ষিত্ব লাভ করিয়াছ। এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ব কল্পেরও পূর্ব্ব কল্পে যে শ্রীকৃষ্ণলীলা হইয়াছিল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বের কথাগুলি খুব দরকারী কথা। এত দরকারী যে এই কথাগুলি চাবির মত ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা করিতে না পারিলে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বৈশিষ্ট্য, আর শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীবৃন্দাবনলীলার বর্ণনার সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বর্ণনার

যে প্রভেদ তাহার হেতু বুঝিতে পারা যাইবে না। আজ যিনি দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মার মানসপুত্র ও ভক্তচূড়ামণি, আজ যিনি শুদ্ধা ভক্তির প্রবর্ত্তক, একদিন তিনি গন্ধর্ব্ব ছিলেন ও পঞ্চাশটি রমণী লইয়া কাম ক্রীড়া করিতেন। এই কথাটি মনে রাখিয়া সেই উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের মানসিক অবস্থা বেশ দৃঢ়রূপে চিন্তা করুন।

এইবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পাঠ করুন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কামভোগের চিত্র ও কামজ স্খলনের বর্ণনা খুবই বেশী। প্রচলিত ভাষায় আমরা যাহাকে "কাঁচারস" বলি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাহার বাড়াবাড়ি অনেক সময়েই আমাদের নিকট অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কি করা যাইবে? বিশ্বপ্রবাহ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে বিকশিত বা উন্নত হইতেছে। নিজ নিজ মর্য্যাদা পালনের দ্বারা ভূত সমূহের যে ক্রমিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, পুরাণে তাহাকে "স্থান" বলে। এই স্থান তত্ত্ব সত্য। বৎসরে বৎসরে যেমন পরিবর্ত্তন ও উৎকর্ষ হয় যুগে যুগেও তেমনি হয়। আবার মন্বন্তরে মন্বন্তরে এবং কল্পে কল্পেও তাহা হইয়া থাকে। একদিনের মধ্যেই চারিযুগ, আবার একজন মানুষের জীবনেও চারিযুগ। ব্রহ্মার জীবন ও ব্রহ্মাণ্ডের জীবনেও সেই একই ব্যাপার চলিতেছে। এই যে সাদৃশ্য, (Analogy) পুরাণ বুঝিতে হইলে ইহার তত্ত্ব জানা চাই। উপরেও যাহা নীচেও তাহাই। As above so below স্থূলেও যাহা সূক্ষ্মেও তাহাই, ভাণ্ডেও যাহা ব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাহাই। ইহার নাম সাদৃশ্যবিধি—The law of analogy and Correspondence পৌরাণিকের চিন্তাপ্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্তর্মুখী হইয়া এই বিধি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। কামের ধ্বংস নাই, বিশ্বসৃষ্টির মূলই কাম। কামই পরিচালক। এই কাম ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উৎকর্ষ লাভ করে। এই কাম মার্জ্জিত (Transmuted) হইয়া নব মূর্ত্তি ধারণ করে। এই কাম আমার ভিতর এখন যে স্তরে বা অবস্থায় রহিয়াছে, আমার অনুভূতি বা কল্পনা ঠিক সেইরূপ হইবে। শ্রীকৃষ্ণলীলা নিত্য, প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া থাকে। প্রপঞ্চের অবস্থাভেদে এই প্রাকট্যের বা প্রাকট্যের অনুভূতি ও আস্বাদনের ভেদ হইয়া থাকে। অন্তর্মুখী হইয়া উপবর্হণ গন্ধর্ব্বকে চিন্তা করুন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বর্ণনা বুঝিবেন। অন্তর্মুখী হইয়া তাঁহারই আর এক অবস্থা অর্থাৎ দেবর্ষির অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করুন, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা বুঝিবেন। দুই প্রকারের বর্ণনায় প্রভেদ কেন তাহা বুঝিবেন এবং ক্রমশঃ বুঝিবেন, এই প্রভেদ সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন না করিলে ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না।

কল্প কি ? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতেই আমরা তাহার উত্তর পাইব। প্রকৃতি খণ্ডের ৫৪ অধ্যায়ে এই সমুদয় কথা আছে। ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ চৌদ্দ মন্বন্তর বা এক হাজার চতুর্যুগের নাম ক্ষুদ্র কল্প, আর ব্রহ্মার রাত্রির নাম ক্ষুদ্র প্রলয়। Daily Exhibition and Inhibition in the life of Brahma. ইহা যদি বুঝিতে হয় তাহা হইলে আমাকে একটু তপস্যা করিতে হইবে। আমার দিন যায়, রাত্রি আসে। আবার দিন আসে রাত্রি আসে। দিন যখন যায়, দিনমণিও অস্তমিত হন, তখন কি আপনি সেই দিনকে ও দিনমণিকে কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হে দিবাভিমানী দেবতা, আমায় কোথায় রাখিয়া গেলে ? প্রভাতে উঠিয়া রাত্রির অভিমানী দেবতাকেও এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহাদের উত্তর পাওয়া যায়। ভারতের দ্বিজগণ উত্তর পাইতেন। সেই উত্তর পাইলে আমি আমার দৈনন্দিন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের তত্ত্ব বুঝিতে পারিব। নিজের দিবারাত্রি বুঝিলে তখন আর ব্রহ্মার দিবারাত্রি বুঝিতে বাকী থাকিবে না। ইহাই পৌরাণিক সাধনা।

ব্রহ্মণো বাসরে রাজন্ ক্ষুদ্রঃ কল্পঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য ব্রহ্মনিশায়াঞ্চ ক্ষুদ্রঃ প্রলয়ঃ উচ্যতে ॥

ব্রহ্মার এই রাত্রির নাম কালরাত্রি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই নাম পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় ঋষি সপ্তকল্পজীবি। এই কল্প, ক্ষুদ্রকল্প বা ব্রহ্মার একদিন। মার্কণ্ডেয় ঋষির এক এক বৎসর আমাদের এক এক মন্বন্তর। অনন্ত ব্রহ্ম চৈতন্য ধারণা করিবার পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় চৈতন্যের ধারণা করুন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপাসনার প্রারম্ভেই মার্কণ্ডেয় চৈতন্যের চিন্তা করার ব্যবস্থা শ্রীরূপগোস্বামী লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে দিয়াছেন। আর আমাদের প্রত্যেক শুভকর্ম্মের প্রারম্ভে ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়র পূজার বিধান। বেদে যাহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে তাহা ব্রহ্মার পঞ্চাশ বৎসরে হইয়া থাকে।

"এবং পঞ্চাশদাব্দে তু গতে চ ব্রহ্মণো নৃপ।
দৈনন্দিনস্তু প্রলয়ো বেদেষু পরিকীর্ত্তিতঃ ॥"

এই দৈনন্দিন প্রলয়কে মোহরাত্রি বলে। একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এই ব্রাহ্মী শতবর্ষের অবসানে ব্রহ্মার নিপাত হয়। ইহার নাম মহাকল্প। ব্রহ্মার নিপাতের পর যে প্রলয়ের অবস্থা তাহার নাম মহারাত্রি। এই মহাকল্প ও মহারাত্রি একত্র করিলে যে পরিমাণ সময় হয়,

তাহা প্রকৃতির এক নিমেষ। এই নিমেষ ধরিয়া শতবর্ষ গণনা করিলে যে সময় হয়; তাহার অবসানে প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে।

অনন্তের চিন্তা করিতে হইলে প্রথমেই অনন্তকাল ও অনন্ত দেশের চিন্তা করিতে হইবে। সুতরাং এই প্রকারে সময়ের হিসাব করা নিতান্তই স্বাভাবিক। ভারতের পৌরাণিকগণ এই প্রকারেই অনন্তকে অনন্তকালের সাহায্যে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অনন্তকালের বুকে কোন ঘটনাই নূতন হইতে পারে না। এখন যাহা ঘটিতেছে, তাহা যে আর কখন ঘটে নাই, এই প্রথম ঘটিল, ইহা হইতেই পারে না। প্রত্যেক ঘটনাই অসংখ্যবার ঘটিয়াছে। অনন্তকালের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত দেশ বা অসংখ্য ও অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তাও স্বাভাবিক। প্রত্যেক ঘটনাই অসংখ্যবার ঘটিয়াছে।

এই তিন প্রকারের অসংখ্য ও অগণ্য। কাল, দেশ ও ঘটনা। ঘটনার নামই নিমিত্ত বা পাত্র। তিনই অসংখ্য। মানবের পক্ষে কোন কোন অবস্থায় এই প্রকারের ভাবনা আসিতে পারে কিনা, এই প্রশ্ন পুরাণ পড়িবার সময় স্বভাবতঃই মনে হয়। এই প্রকারের ভাবনা সঙ্গত ও প্রয়োজন কিনা, এই প্রশ্ন তুলিয়া অনন্ত-প্রসারী মানব মনের অবাধ গতি সঙ্কুচিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। এই প্রকারের ভাবনা পৃথিবীতে অনেকেরই মনে জাগিয়াছিল। যাঁহাদের মনে খুব ভাল করিয়া জাগিয়াছিল এবং যাঁহারা নির্ভয়ে এই ভাবনার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতের পৌরাণিক ঋষি। বেদে আছে "যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ৎ"। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেন, নূতন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। অনন্তের বুকে নূতন কিছুই নাই। প্রত্যেকেরই অসংখ্য ও অগণ্য স্থান যাহাতে আছে, তিনিই অনন্ত। কাজেই পূর্ব্বে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারই অনুস্মৃতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন। Eternal Recurrence

এই অনন্তের চিন্তায় ও আলোচনায় কল্পনা ব্যতীত মানুষের অন্য কোন বৃত্তি আপাততঃ কার্য্যকরী নহে। একালের কোন পণ্ডিত লোক যিনি প্রত্যক্ষের এই প্রয়োজন বা ব্যবহারকেই একান্তভাবে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তিনি বলিবেন "এ যে নিছক কল্পনা"। বেশ কথা। ইহা কল্পনা। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? তিনি বলিবেন—"ইহা যখন কল্পনা, তখন মিথ্যা। মিথ্যার জাল বুনিয়া কি হইবে?" এইখানেই মতভেদ, দুর্জ্জয় মতভেদ। আমরা যেন সত্য পাইয়াছি সত্যকে সম্পূর্ণরূপে চিনিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিয়াছি। এই ধারণাই

আমাদের সর্ব্ববিধ সর্ব্বনাশের মূল। সত্যকে আমরা এখনও পাই নাই। যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া আমরা অহঙ্কার করিতেছি, তাহা ব্যবহারিক সত্য, পারমার্থিক সত্য নহে। সুতরাং "কল্পনা" মিথ্যা নহে। একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে এক প্রকারের কল্পনা মিথ্যা হইতে পারে। সীমা বাড়াইলেই আগেকার সত্য মিথ্যা হয়, আর আগেকার মিথ্যা সত্য হয়। ইহা বুঝা কঠিন নহে। অনন্তের বুকে সর্ব্ববিধ কল্পনারই স্থান আছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা কল্পনা, তাহাকে হঠাৎ মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সত্য করিয়া অনন্তের উপাসনা করিতে পারিবেন না। সীমার মধ্যে বাঁধা পড়িয়া যাইবেন।

মানবাত্মার অসীম দর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। এই প্রতিবিম্ব অগণ্য বৈচিত্রময়। মানুষ স্বরূপে নিত্য ও অনন্ত, কিন্তু সে এখন নিজকেই ভুলিয়া রহিয়াছে। চিত্ত, বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতি লইয়া মানুষ একটা গোলযোগে ভিতর রহিয়াছে। কিন্তু এই গোলযোগ বা অবিদ্যার দুঃস্বপ্নের মধ্যেও সেই অনন্তের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। কিন্তু দর্পণ বন্ধুর হইলে প্রতিবিম্ব যেমন বিকৃত হয়, সাধারণ মানবের চিত্ত দর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্বও সেইরূপ বিকৃত ও বিসদৃশ। অনন্তের প্রতিবিম্বপাতের দ্বারাই মানবের কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত হয়। সাধারণ মানুষের কল্পনা সিদ্ধ কল্পনা নহে, কারণ তাঁহার চিত্ত দর্পণে অনন্তের যে প্রতিবিম্ব পাত হয় তাহা নিখুঁত প্রতিবিম্ব নহে। এই কল্পনাশক্তি আমি যদি হারাইয়া বসি বা চেষ্টা করিয়া সঙ্কুচিত করি, তাহা হইলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইব ও আত্মঘাতী। এই কল্পনার অনুশীলনের জন্য সাধনা আবশ্যক। এই সাধনাই সর্ব্বোত্তম।

মানুষের বৈজ্ঞানিকী শক্তি বা বৃত্তি আছে। এই শক্তির অনুশীলন চলিতেছে। গণিত হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় ব্যবহারিক বিদ্যা (Exact science এই শক্তির অনুশীলনে সাহায্য করিতেছে। খুব ভাল কথা। এই শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হউক। কিন্তু এই শক্তি বা বৃত্তিছাড়া মানুষের কি আর কোন শক্তি বা বৃত্তি নাই? কে বলিল? আরও অনেক শক্তি বা বৃত্তি আছে।

মানুষ কবি হয়, মানুষ দার্শনিক হয়, মানুষ সাধু বা মহাপুরুষ হয়। একজন কবি, একজন দার্শনিক বা একজন মহাপুরুষ লক্ষ লক্ষ নরনারীকে যুগ যুগ ধরিয়া কল্যাণের পথে পরিচালনা করেন। তাঁহারা যে মানবজাতিকে উন্নীত করেন, মানবের কোন্ শক্তির দ্বারা? এখানে মূলতঃ কল্পনা শক্তিরই জাগরণ ও হৃদয়

বৃত্তির প্রসারণই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কল্পনা শক্তিকে অবজ্ঞা করিবেন না। কল্পনা শক্তির কার্য্যকে মিথ্যা বলিবার দুঃসাহস বা কুসংস্কার পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলে ভারতের ও প্রাচীন জগতের পৌরাণিক ঋষিগণের চিন্তা প্রণালী ও সাধন প্রণালীর মর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমে অনন্তের চিন্তা করুন। দেশ ও কালের মধ্যে এই অনন্তের লীলা দর্শন করুন। যাবতীয় ঘটনাই অগণ্য ও অসংখ্যবার ঘটিয়াছে, ইহা আপনা হইতেই হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠিবে। প্রত্যেক ঘটনারই চারিদিকে যেন লেখা রহিয়াছে 'আমি নূতন নহি, অসংখ্যবার আমি ঘটিয়াছি, এবং অগণ্যবার আমি ঘটিব।

কিন্তু, আমার যে একটি প্রয়োজনীয় কাজ রহিযাছে। ঘটনাটিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যতক্ষণ তাহা না পারিব, ততক্ষণ আমার নিস্তার নাই। যদিও অসংখ্যবার ঘটিয়াছে, কিন্তু ঘটনাটি একই ঘটনা। কাজেই ঘটনাটির যাহা প্রাণ, আত্মা বা তত্ত্ব, তাহা এক, কিন্তু প্রকাশগত পার্থক্য থাকিতে পারে। এই বহু বা বিচিত্রের মধ্যে একই রহিয়াছেন। তত্ত্ব কতপ্রকারে কল্পিত হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিলে আমরা কল্পভেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব। যদি কেহ বলেন—"ইহা কল্পনা, কেবল কল্পনা merei magination তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ বলেন, 'ইহা মিথ্যা' তাহা হইলে যথেষ্ট আপত্তি আছে। সত্য কি মিথ্যা কি, এই লইয়া আলোচনা চলিবে এবং পূর্ব্বে সে কথাগুলি বলা হইল, তাহাই আবার নূতন করিয়া বলা হইবে,—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির কল্পান্তর হইবে। কল্পনাভেদ কি, তাহা আর বুঝাইতে পারা যাইবে না, পূর্ব্বে যে চিন্তা ও অনুভব প্রণালী বলা হইল, তাহার অনুশীলন করিলে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা যাইবে।

———

বর্ষ-বিদায়

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ লিখিত)

অনন্ত, তুমি শান্ত হইয়াছিলে, তাই তোমায় আজ বিদায় দিতে আসিয়াছি। উপাধি উপহিত না হইলে তো জগৎ হইত না। সেই উপাধির আবরণ আজ তোমার উন্মোচিত হইল। মহাকালবক্ষে তুমি মুক্তি পাইলে। হে বর্ষাবচ্ছিন্ন

খণ্ডকাল ! তুমি আজ পুরাতন হইতে চলিয়াছ,—পুরাণশাসিত হিন্দু আজ তাই তোমায় প্রণিপাত করিতেছে।

দিনের পর দিন—পক্ষের পর পক্ষ—মাসের পর মাস তুমি ভারতের নিয়তি চক্রের আবর্ত্তন ঘটাইয়াছ। যে ফুল যে কাননে যেদিন যেমন ভাবে ফুটিবার ছিল—অদৃষ্ট হইয়া তুমি তাহা দেখিয়াছিলে,—সারা বৎসর ধরিয়া তাহা দেখাইয়া গেলে। ভারতবাসী নির্নিমেষ নেত্রে আজ তোমার গতিনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিতেছে। স্মৃতি সুখের কি দুঃখের জানি না, কিন্তু কখনও হাসিতেছি কখনও কাঁদিতেছি—আর এই হাসি কান্নার সহিত তোমাকে জড়াইয়া পদে পদে ভুল করিয়া বসিতেছি। তুমি কিন্তু সুখ দুঃখাতীত মুনির মত উদাসীন দৃষ্টিতে আপন কক্ষে বিশ্রাম লইতে ছুটিয়াছ। হে অকরুণ! ভারতবাসীর হাসি-কান্নার প্রতি সত্যই কি তুমি উদাসীন হইয়াই চলিয়া যাইতেছ। বল, বল সত্য করিয়া বল।

যদি তোমার চক্ষু থাকে, তবে একবার জীর্ণ মলিন পাণ্ডুর বদনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যাও—কত আশায় আকাঙ্ক্ষায় যাহারা একদিন তোমায় বরণ করিয়া লইয়াছিল, আজ তাহারা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। যাহারা ভাবিয়াছিল তোমার আগমনে তাহাদের শুষ্ক সরোবর ভরিয়া উঠিবে—মাঠে মাঠে ধান হাসিয়া উঠিবে তাহারা আজ কত প্রবঞ্চিত, কত ভগ্নপ্রাণ, কত নিরুদ্যম। হে যোগী, তুমি যাও কিন্তু যাইবার কালে, এই কোটী কোটী যোগভ্রষ্টকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও যেন তাহারা অনুযোগের দৃষ্টিতে তোমার পানে না চাহিয়া আপনাদের পানেই চাহিতে শিখে।

হে ভূত ভবিষ্যতের মধ্যবর্ত্তী অতিথি! আমরা তোমার সেবা করিতে পারি নাই। যাহা দেখিতে দেবতারা তোমায় পাঠাইয়াছিলেন, আমরা তোমায় তাহা দেখাইতে পারি নাই। গোমাতার স্বতঃপ্রসূত ক্ষীরধারায় তোমার অভিষেক করিতে পারি নাই। মাতৃপ্রেমের পেলব চন্দনে তোমার রাজটীকা পরাইতে পারি নাই। ভাষাহীন মূক জনমণ্ডলীর মঙ্গল কোলাহলে তোমার বিজয় শঙ্খ বাজাইতে পারি নাই। হে দেবতা, তাই বলিয়া তুমি অভিমানে আমাদিগকে তিরস্কার করিও না—আমাদিগকে শক্তিময় কর, আমাদিগকে প্রাণবান্ কর, আমাদিগকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে অনুপ্রাণিত কর। আমাদিগকে এমন নূতন চেতনা দিয়া যাও, যেন নববর্ষে তুমি যখন নূতন হইয়া আসিবে, তখন সেই নূতন দেব অতিথিকে আমরা যথাযোগ্য সমাদরে অভিনন্দিত করিতে পারি।

দেবতারা যাহা দেখিবার জন্ম আকুল হইয়া আছেন, আমরা যেন তাহাই তোমাকে দেখাইতে পারি।

পুরাতন চলিয়া যাইতেছে, ভারতবাসি! তাহার অভিজ্ঞতার পুণ্য আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ কর। সাধনার দুর্ব্বার পথে যেখানে যেখানে পদস্খলন হইয়াছে, সেখানে আজ তোমায় সতর্ক হইতে হইবে। কণ্টক-কঙ্করে যেখানে তোমার চরণ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, সেখানে আজ তোমায় সাবধান হইতে হইবে। যেখানে অন্ধকার, যেখানে বিভীষিকা, যেখানে মোহ, যেখানে মরীচিকা,—অস্তমান কাল সূর্য্যের ক্ষীণরশ্মিতে আজ তাহা ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লও। ভবিষ্যতের গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লও। বুঝিয়া লও—তোমায় সাহসী হইতে হইবে, তোমায় ধার্ম্মিক হইতে হইবে, তোমায় তপস্বী হইতে হইবে, বীর সন্ন্যাসী হইতে হইবে, কর্ম্মযোগী হইতে হইবে। মানিয়া লও—"নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।" অলমতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিগত দোল পূর্ণিমার পূর্ব্ব হইতে সম্পাদক-মহাশয় প্রায় দেড়মাস ধর্ম্মসভা উপলক্ষে প্রবাসে ছিলেন। তারপর কলিকাতায় আসিয়া ভক্তির কার্য্য আরম্ভ করিবার পরই কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হয়, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানার কার্য্যও বন্ধ হইয়া যায়, অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনমতে আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভক্তি প্রকাশ করিতে পারি নাই। যথাসময় পত্রিকা না পাইয়া বহু গ্রাহক আমাদিগকে পত্র লিখিয়া বিলম্বের কারণ জানিতে চাহিয়াছেন, সকলকে পৃথক ভাবে উত্তর দেওয়া নিতান্ত অসুবিধা বলিয়া আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, এই সকল দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্ম বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা যথাসময় পত্রিকা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। আশাকরি সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী আপনাপন সহৃদয়তা গুণে ক্ষমা করিবেন। এবং ২।১ জন নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

বৈশাখ মাসের পত্রিকা যাহাতে এই মাসের মধ্যেই বাহির হয় এবং ভবিষ্যতে যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিত ভাবে পত্রিকা প্রকাশ হয় তাহার জন্ম বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, এখন ফলাফল ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। অলমিতি॥

বিনীত
ভক্তি কার্য্যাধ্যক্ষ।

২৪শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

ভক্তি

বৈশাখ মাস
১৩৩৩

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

প্রার্থনা

অখিল ভুবনবন্ধো প্রেমসিন্ধো জনেঽস্মিন্
সকলকপটপূর্ণ জ্ঞানহীনে প্রপন্নে।
তব চরণ সরোজে দেহি দাস্যং প্রভোত্বং
পতিত তারণ নাম প্রাগ্বভাসীদ্ যতস্তে॥

ওহে প্রেমসিন্ধু। পতিত তারণ।
অখিল ভুবন গতি।
ও পদ কমলে কবে হবে স্থির
এ মোর কলুষ মতি॥
মুই জ্ঞানহীন কপটতা ময়
পড়েছি বিপদ ঘোরে।
চরণ সরোজে রাখ হে তোমার
দাস করি সদা মোরে॥
তব নাম শুনে কলুষ সাগরে
তার হে পতিত জনে।
তাই ও চরণে লইনু শরণ
দেহি দেহি দাস্য ধনে॥

শ্রীগৌর চরণ দ্বন্দ্বে যাচে যাচে পুনঃ পুনঃ
জীবনে মরণেবাপি তব রূপং বিচিন্তয়ে ॥

হে গৌরসুন্দর চরণে তোমার
এই মোর নিবেদন।
জীবনে মরণে তব রূপরাশি
করি যেন বিচিন্তন ॥ *

এস

(শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক লিখিত)

এস বিশ্বের আর্ত্তের তরে
নিঃস্বের আঙিনায়,
এস বরেণ্য ভুবন পূজ্য
এস ওগো শ্যামরায়।
সুপ্তি-মগনে লুপ্ত-চেতনে
সঞ্চার' জ্ঞানবারি,
অমৃত-গন্ধে মুগ্ধ কর গো
বিশ্বের নর-নারী।
রিক্ত চিত্ত ভকতি-বিত্তে
ভ'রে দাও প্রভু নিত্য,
সঞ্জিব করি শুষ্ক পরাণ
কর দেব সুধা-সিক্ত।

---

* শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীমৎ বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিরচিত শ্রীচৈতন্য শতকের নাম গৌরভক্ত মাত্রেই অবগত আছেন। এই শতকের বিবিধ ছন্দে বঙ্গানুবাদক ভক্তবর রামদয়াল ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ পরিচয়ও বোধ হয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। বর্ত্তমান মাসে আমরা তাঁহার কৃত দুইটী অনুবাদ মূল শ্লোক সহ প্রার্থনা রূপে উদ্ধৃত করিয়া ভক্তির পাঠকগণকে উপহার দিলাম। (ভঃ সঃ)

শ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত)

[২]

পরে কংস যখন শিশুরূপী মাহামায়াকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল তখন জনৈক বালক দূরে থাকিয়া দৈববাণী করিল—"তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।"

অপর একদিন তাহারা ব্রজলীলা অভিনয় করিল। একটী বালক কংস প্রেরিত পুতনা রাক্ষসী সাজিয়া নন্দালয়ে গিয়া শিশু শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া তাহার চাঁদমুখে বিষমাখা স্তন্য প্রদান করিল। অপরদিন শকট ভঞ্জন করা হইল। গাড়ী খানি হইল নল খাগড়ায় এবং তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া প্রতিবাসী গোপগণের গৃহে যাইয়া ননী মাখম প্রভৃতি চুরি করিয়া খাইত। গোপপত্নীগণ নিতাইর অকলঙ্ক মুখচন্দ্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাহারা তাহাকে কিছুই বলিত না।

এই সমস্ত বালকগণ সর্ব্বদা নিতাইর নিকট থাকিতে ভালবাসিত, ইহা কি সঙ্কর্ষণ দেবের আকর্ষণ! বালকগণের পিতারাও ইহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহারা বালকগণকে স্নেহভরে কোলে করিয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিতেন "এত কৃষ্ণলীলা বালকেরা কিরূপে শিখিল?" ধন্য—ধন্য বালকগণ তোমরাই ধন্য! ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস সত্য সত্যই বলিয়াছেন,—

"সে সব শিশুর পায় বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যার এমত বিহার॥"

আর কবি-কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া আমাদেরও যেন বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"হইল মনুষ্য জন্ম না হৈল সেকালে।"

নিতাইর সমস্ত ক্রীড়াই এইরূপ সুন্দর ছিল। লোক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত—

——বাপ ইহা কোথায় শিখিলা?
হাসি বলে প্রভু, মোর এ সকল লীলা॥ চৈঃ ভাঃ

স্বভাব সুন্দর নিত্যানন্দ সকলকারই নয়নমণি সদৃশ ছিল। এই দেবরূপী বালককে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সকলকার চিত্তই কি এক অদ্ভূত পূর্ব্ব আনন্দ রসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। যথা,—

প্রথম বয়সে প্রভু অতি সুকুমার।
কোল হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার॥
সর্ব্বলোক পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণু মায়া বশে॥

এইরূপে শিশুকাল হইতেই নিতাই চাঁদের শ্রীকৃষ্ণ প্রেম অতুলনীয় ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীনিত্যানন্দের উপনয়ন ও গৃহত্যাগের সূচনা।

জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
অপরাধ পাপ মোর, তাহার নাহিক ওর,
উদ্ধারহ নিজ করুণায়॥ ধ্রু
আমার অসত মতি, তোমার নামে নাহি রতি,
কহিতে না বাসি মুখে লাজ।
জনমে জনমে কত করিয়াছি আত্মঘাত,
অতত্র সে মোর এই কাজ॥
তুমিও করুণাসিন্ধু পাতকী জনার বন্ধু,
এবার করহ যদি ত্যাগ।
পতিত পাবন নাম, নির্ম্মল সে অনুপাম,
তাহাতে লাগয়ে বড় দাগ॥
পূবরে যবন আদি, কত কত অপরাধী
তরাইছ শুনিয়াছি কানে।
কৃষ্ণদাস অনুমানি, ঠেলিতে নারিবে তুমি,
যদি ঘৃণা না করহ মনে॥

নিতাই ক্রমশঃ বড় হইতেছেন। হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। নিতাই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, কাজেই প্রথমে তাঁহাকে

ব্যাকরণ পড়িতে দেওয়া হইল। নিতাইচাঁদের স্মরণ শক্তি অতীব প্রখর ছিল। সুতরাং অল্প সময়েই তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এবং এইরূপে তিনি অপরাপর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অল্পদিনেই পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। যথা,—

"অল্প দিবসেই কৈল বিদ্যা উপার্জ্জন।
ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষণ॥"

যথাকালে বড়ই সমারোহের সহিত নিতাইএর উপনয়ন হইল। একে নিতাইর রূপের অবধি নাই, তাহার উপর এই নবীন ব্রহ্মচারীর বেশ দেখিয়া লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল। নিতাই যখন দণ্ড হস্তে সন্ন্যাসী বেশে ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন, তখন সেই নবীন সন্ন্যাসীর নবীন সৌন্দর্য্যে দর্শকের আঁখি ঝরিতে লাগিল। সকলেই ভক্তি ভরে তাহাকে ভিক্ষা দিল।

নিতাইর স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রখর ছিল ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি অখণ্ড মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ক্রমশঃ বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নিতাই ক্রমশঃ পণ্ডিত সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার "ন্যায় চূড়ামণি" উপাধি লাভ হইয়াছিল।

"ন্যায় চূড়ামণি ইঁহার শাস্ত্রের আখ্যাতি।
নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দ পুরে স্থিতি॥" (অদ্বৈতপ্রকাশ)

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিতাই চাঁদের হরিনামে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছিল। কোন স্থানে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে শুনিতে পাইলে নিতাই প্রেমে বিভোর হইয়া তথায় দৌড়িয়া যাইতেন। তিনি যখন কীর্ত্তন করিতেন তখন লোকে মোহিত হইয়া সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিত। লোকে বুঝিত, এ বালক কালে একজন মহাপুরুষ হইবে।

১৪০৭ শকে দোল পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপ নগরীতে মহাপ্রভুর জন্ম হয়। প্রভু জীবের কণ্ঠে হরিনাম মহামন্ত্র আরোপিত করিতে আসিতেছেন। তাই সেই সময় চাঁদে গ্রহণ লাগিল। লক্ষ লক্ষ লোকে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল। আর এই শুভ মুহূর্ত্তে লক্ষ কণ্ঠের হরি হরি ধ্বনির সহিত আমাদের শচীনন্দন গৌরহরি শুভ জন্ম গ্রহণ করিলেন। শ্রীগৌরের জন্মদিন যেদিন, জগদ্বাসীর সেদিন কি শুভদিন! এ শুভদিনে নিতাই আনন্দাবেশে হুঙ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ইহা এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

"যেদিন জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে বসি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারেতে।
কত লোক বলিলেক হইল বজ্রপাতে॥
কত লোকে বলিলেক জানি সে কারণ।
মৌড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জ্জন॥

ছোট ভাই গৌরের জন্ম-সংবাদ সর্ব্বদর্শী নিতাই চাঁদের আমার অজ্ঞাত ছিল না। কারণ যুগে যুগে লীলা ছলে জীব উদ্ধার করাই যে তাঁহার কার্য্য। আসুন কৃপাময় পাঠক! এ অবতার-তত্ত্ব আমরা বরণীয় বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আস্বাদন করি—

"রাম অবতারে অনুজ আছিলা, লক্ষ্মণ বলিয়া নাম।
কৃষ্ণ অবতারে গোকুল নগরে, জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম॥
গৌর অবতারে, নদীয়া বিহরে, ধরি নিত্যানন্দ নাম।
দীনহীন যত, উদ্ধারিলা কত, বঞ্চিত দাস আত্মারাম॥"

এই সময় নিত্যানন্দের বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তাঁহাকে এই বয়সে যেন ষোড়শ বর্ষীয় যুবক বলিয়া অনুমিত হইত।

"নিতাইর বয়স হইল দ্বাদশ বৎসর।
ষোড়শ বর্ষের প্রায় দেখিতে সুন্দর॥" ভঃ রঃ

নিতাই যে সাধারণ বালক নহে ইহা সকলেই বুঝিয়াছে। এই অল্প বয়সেই তাঁহার সংসারে অনাসক্তি ও হরিনামে আসক্তি জন্মিয়াছে। পুত্রের ভাবান্তর পিতামাতার অজ্ঞাত রহিল না। তাঁহারা চিন্তিত হইলেন।

একদিন দেবী পদ্মাবতী স্বামীর নিকট পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। হাড়াই পণ্ডিত পত্নীর প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। প্রতিবাসী ও আত্মীয়-গণ এ বিবাহ প্রস্তাবে অতীব আনন্দিত হইলেন। কেহ কেহ কন্যা পর্য্যন্ত স্থির করিলেন। * পাঠক! এই অল্প বয়স্ক বালকের বিবাহসংবাদে আপনি আশ্চর্য্য হইবেন না। তৎকালীন এই ভাবের বিবাহ প্রথার বিশেষ প্রচলনই ছিল।

---

* একচক্রাবাসী যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
বিবাহ প্রসঙ্গে হর্ষ হৈলা সর্ব্বজন॥
কৈল কন্যা স্থির কোন কোন বিপ্রবরে।
মন কথা খায় কেহ স্নাই শাহি করে॥ (ভঃ রঃ)

ক্রমশঃ নিতাইর কর্ণে এ সংবাদ পৌছিল। জগতের মঙ্গলের জন্য যাঁহার জন্ম তিনি কি এই অল্প বয়সে পরিণয় শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সংসারে আবদ্ধ থাকিবেন? না তাহা হইতে পাবে না। নিতাই ভাবিতেছেন, কিরূপে এই পিতামাতার মমতা শৃঙ্খল ছেদন করিয়া সংসার বেষ্টনেব বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য জানান যাবে সে জানিতে পারে॥"

এই বাক্যের সত্যতা আমরা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে উপলব্ধি করিতে পারিব।

একদা নিতাইচাঁদ সহসা বলরাম ভাবে বিভোর হইয়া হুঙ্কার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পিতামাতা তাঁহাদের নয়ন পুতুলি সন্তানেব এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কত যে ব্যাকুল হইলেন তাহা আর কি বলিব। পুত্রের এইরূপ অবস্থার কারণ কি তাঁহারা কিছুই স্থির কবিতে পারিলেন না। গ্রামবাসী লোককে ডাকা হইল। প্রতিবাসীগণ আসিয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে নিতাই চাঁদের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে। সকলে মিলিয়া বডই সন্তর্পণে নিতাই চাঁদের শুশ্রূষা কবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে নিতাই তাঁহাব চৈতন্য ফিরিয়া পাইলেন। তখন জননী পদ্মাবতী সস্নেহে পুত্রকে তাহাব এই অপূর্ব্ব ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিতাই বলিলেন "মা, আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন কোন মহাপুরুষের সহিত তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছি। তাহার পর কি হইয়াছে জানি না।" ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাই বলিতেছিলাম শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা ব্যতীত নিত্যানন্দ মহিমা বুঝিবাব সাধ্য কাহাবও নাই। নিত্যানন্দ গৃহ ত্যাগ কবিবেন, ইহাই কি তাহাব পূর্ব্ব সূচনা?

ক্রমশঃ

শ্রীমূর্ত্তি

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত)

জ্ঞান ও ভক্তি উভয় প্রকার সাধনায় উপাস্যতত্ত্বের পার্থক্য থাকিলেও এক বিষয় একত্র দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানসাধনার চরমলক্ষ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সৃষ্টি ব্যাপারের

কোনও সম্বন্ধ সংশ্রব নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মতে মায়ার খেলা, মায়ারই সৃষ্টি। ইহা এক বিচিত্র ইন্দ্রজাল, সর্ব্বৈব মিথ্যা। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ শক্তিবর্গ তদ্ধর্ম্মাতিরিক্ত চিদেকরসস্বরূপা। সুতরাং জগৎসৃষ্টি ব্রহ্মার নহে। পারমার্থিকভাবে এই মায়া প্রহেলিকার কোন সত্তাও নাই। ইহাই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত। অপর পক্ষে বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেও এই কথাই বলিয়াছেন। অর্থাৎ কেবলানন্দের রসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুই করেন নাই। সৃষ্টিব্যাপারের সহিত তাঁহার কোনই সংশ্রব নাই। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইলেও জাগতিক ব্যাপার তাঁহার কার্য্য নহে। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রকটন কেবলই বিশুদ্ধ প্রেমিক ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ—সৃষ্টি স্থিতি সংহারার্থ নহে। এই উভয় পক্ষেই আমরা Transcendental philosophy বা অতীন্দ্রিয় জড়াতীত জগদাতীত এক অদ্বিতীয় মহা পূর্ণ পরমতত্ত্বের আভাস পাই। এই তত্ত্বের সহিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ (Cansal relation) বা জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধ (Cosmic relation) দেখিতে পাই না। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জগত মায়ার সৃষ্ট; কিন্তু উহা পারমার্থিকভাবে ইন্দ্রজালিকবৎ অলীক। শ্রীজীব গোস্বামির মতেও জগত মায়ারই সৃষ্ট। কিন্তু সে মায়া অজ্ঞানের নামান্তর নহে, অধ্যাসেরও হেতু নহে। উহা সাক্ষাৎ ভগবৎশক্তি। কিন্তু সে শক্তি অন্তরঙ্গা নহে,—বহিরঙ্গা। ইনি দেবীপুরাণান্তর্গত চণ্ডীর বিশ্বপ্রসবিণী মহাশক্তি। "সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।" "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।" এই বিষয়ে শাক্ত বৈষ্ণবের সিদ্ধান্তের কোনও ভেদ দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ ইনিই বা ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Herbert spencer এর Mysterious force তিনি বলিলেন There is a mysterious force from which this universe is evolved চণ্ডীতেও ইনি mysterious বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। যথা "ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপরা।" সুতরাং এখানে সৃষ্টিতত্ত্বের একরূপ সমসমাধানই দেখিতে পাওয়া যায়।

"ভগবৎসন্দর্ভে" শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী যে ভগবদ্ বিগ্রহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবয়বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিন্যস্ত করিয়াছেন তৎসমস্ত কেবলই ভগবদ্‌ভক্তগণের সেবা সুখ সম্ভোগার্থ, জগৎ সৃষ্টির জন্য নহে। জগৎসৃষ্টি বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা সাধিত হয়। শঙ্করের মতে এই মায়া অজ্ঞান, অবিদ্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন এবং পরমার্থ জ্ঞানের উদয়ে এই মায়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু শাক্ত ও

বৈষ্ণবের মতে এই মায়া ভগবৎশক্তি, ইনি নিত্যা সুতরাং জগতও নিত্য সত্য কিন্তু পরম সত্য নহে।

শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয় মায়াতীত শ্রীকৃষ্ণকে মায়া সহচারী কৃষ্ণ বলিয়া এক মহা ভ্রম করিয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের প্রেমভক্তির ভজনীয় শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহবান হইলেও জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার কোনও খেয়াল নাই, সে কার্য্য মায়াশক্তির দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। এই মায়া সাকারাও হইতে পারেন। নিরাকারাও হইতে পারেন। চণ্ডীতে তাঁহাকে জগন্মূর্ত্তি বলিয়াছেন। জগৎ সৃষ্টির কর্ত্তৃত্বতায় স্বাকার থাকা প্রয়োজন কি নিষ্প্রয়োজন শ্রীপাদ শ্রীজীব সে বিচার করেন নাই। লীলাবিহারী শ্রীভগবান ভক্তগণের উপাসনা সুবিধার্থে জগতে যখন স্বস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ প্রকটন করেন ভক্তগণ তখন তাঁহার শ্রীমুখ ও করচরণাদির সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন এবং সেইরূপ পরবর্ত্তী সময়ে ধ্যেয় ও অর্চ্চনীয় হইয়া ভক্তগণের উপাসনা চরিতার্থ করেন। এই ব্যাপার যে শ্রুতি সম্মত, শ্রুতিবাক্যানুমোদিত এবং সহস্র সহস্র পৌরাণিক বাক্যের মূল স্বরূপ উপজীব্য স্বরূপ, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী তৎ সম্প্রদায়ের জনগণকে তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে বিচারের আর কোনও অবকাশ নাই, প্রয়োজনও নাই। শ্রুতিবাক্য, স্মৃতি বাক্য, শ্রুতিস্মৃতি উভয়ে মিলিত বাক্য বিদ্বদনুভব এবং মুনি ঋষি সাধু সজ্জনের শাশ্বতানুষ্ঠানই যথেষ্ট প্রমাণ। শ্রীজীব যে অনুমান প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আগমানুগৃহীত বলিয়াই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শ্রুতি নিষ্পাদিত উক্তিকে দৃঢ়মূলা করার জন্য উক্ত অনুমান গৃহীত হয় নাই। কেননা বেদান্তী মাত্রেই শব্দ প্রমাণকে শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন। অনুমান যদি আগমানুগৃহীত হয়, বেদশাস্ত্রের অবিরোধী হয় তবে গৌণভাবে অনুমান প্রমাণও গৃহীত হইতে পারে।

অপর কথা এই যে, শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইলেও তাঁহার করচরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে বিভাগ আছে তাহা শাস্ত্র সম্মত এবং লোকদৃষ্টি সম্মত। সুতরাং উহা গৌণ নহে উহা মুখ্য। ক্ষীরের পুত্তলিকা তত্ত্বতঃ ক্ষীরের হইলেও উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার গৌণ নহে, মুখ্য বলিয়াই গণ্য হয়। আনন্দ ও বস্তু বিশেষ, অবশ্য জড়ীয় নহে। ঘনীভূত আনন্দই শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি। আর সেই শ্রীমূর্ত্তিই যে করচরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমন্বিত শ্রীপাদ শ্রীজীব শাস্ত্রবাক্যের অভিধা বৃত্তির দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধের অন্যান্য যুক্তি-তর্ক আমরা বিস্তৃতরূপে পরে আলোচনা করিব।

শাস্তার শাসন

(শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র লিখিত)

ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভগবানের অংশ, কলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবতারের আর্বির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে যেমন মধুরত্ব ও নূতনত্ব দৃষ্ট হয়, এমন আর কোন কালে, কোন দেশে, কোন অবতারে দৃষ্ট হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং স্বতন্ত্র। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার প্রত্যেক অংশে, প্রত্যেক ঘটনায় এবং প্রত্যেক কার্য্যে এই স্বাতন্ত্র্য এমন উজ্জ্বলতমরূপে দেদীপ্যমান যে, এমন আর কোন অবতারে দেখা যায় না। যখন যে দেশে যে অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই ভগবান্ জগদ্গুরুরূপে ও জগতস্থ লোক শিষ্যরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয় কুসুমের ন্যায় সুকো-মল হইলেও এবং তদীয় অন্তর ভক্ত বাৎসল্যে সহজে বিগলিত হইলেও, সময়ে সময়ে ভক্তের প্রতি এমন বজ্রাদপি কঠোর শাসন করিয়াছেন যে, জগৎ দেখিয়া ভীত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়াছে। তারপর আবার শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের ব্যবহার ও চরিত্র ঈদৃশ অদ্ভুত যে, সুযোগ পাইলে তাঁহাকেও তাহারা শাসন করিতে ক্রটী করেন নাই। তাই বলিতেছিলাম এমন মধুর, এমন সুন্দর, এমন নূতন কাণ্ড, শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ভিন্ন আর কুত্রাপি নাই, গুরুশিষ্যের শাসনের কাহিনী অনেক আছে, আমরা দুইটী মাত্র উপাখ্যান এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিব।

মহাদেবরূপী শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শাখা প্রশাখা অনেক। তন্মধ্যে কমলা-কান্ত বিশ্বাস নামে আচার্য্য প্রভুর একজন পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত ও কিঙ্কর ছিলেন। আচার্য্যের প্রতি বিশ্বাস মহাশয়ের প্রগাঢ় ও সবল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তিনি সর্ব্বদা আচার্য্য প্রভুর পরিবার মধ্যে বাস করাতে তদীয় পারিবারিক অবস্থার বিষয়ও সম্যক্ অবগত ছিলেন, প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে আচার্য্য প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে লইয়া নীলাচলে গমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দর্শন, কিছুদিন তদীয় সঙ্গে একত্র বাস এবং কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া পরম প্রীত হইতেন, এই সময়ে কমলাকান্ত বিশ্বাসও স্বীয় ইষ্টদেবতার সহিত নীলাচলে যাইয়া মহা প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে অপার প্রীতিলাভ করিতেন।

একবার রথযাত্রার সময় কমলাকান্ত আচার্য্যপ্রভুর সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন, তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া জানিতে পারিলেন, উৎকলাধিপ মহারাজা প্রতাপরুদ্র পরম ভক্ত, প্রভুর সন্তোষার্থে মহারাজা অজস্র অর্থব্যয় করিতেন, এবং কিসে প্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ সন্তুষ্ট থাকেন এই চিন্তায় স্বতঃ পরতঃ নিমগ্ন থাকিতেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া কমলাকান্তের একটী খেয়াল হইল, এবং এই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট একখানি পত্রী লিখিলেন।

"সেই পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোনরূপে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে॥"

নানাবিধ সৎকার্য্যে বিশেষতঃ সদাব্রতে আমাদের আচার্য্য প্রভু সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি সংসারী ছিলেন বটে, কিন্তু সংসার ধর্ম্মের ধার ধারিতেন না। তিনি ভাবিতেন, সংসার শ্রীভগবানের, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের ভাবনা, টাকাকড়িরচিন্তা যদি কাহাকেও করিতে হয় তবে তাহা শ্রীভগবানই করিবেন, একজন মহাজন কহিয়াছেন—

"সংসারে এসেছ, থাক সংসার অন্তরে।
রেখনা রেখনা, কিন্তু সংসারে অন্তরে॥"

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু আয় ব্যয় উভয়েরই একটী সীমা আছে। যখন ব্যয় আয়কে ছাপাইয়া উঠে তখন ঋণ উপস্থিত হয়, আচার্য্যপ্রভু সংসারের পোদ্দার গিরিতে অভিজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া তাঁহার প্রায় তিন শত মুদ্রা ঋণ হইয়াছিল, তাঁহার অনুগত ভৃত্য কমলাকান্তের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, প্রতাপরুদ্রের কাছে পত্র লিখিলেই এই অত্যল্প ঋণ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন, তাই পত্র লিখিয়াছিলেন। এ বিশ্বাস ভ্রান্ত নহে, কিন্তু তাহার ভ্রম এই হইয়াছিল যে, তিনি আচার্য্য প্রভুকে পত্রীমধ্যেও ঈশ্বররূপে স্থাপন করিয়াছিলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি হইলে তাঁহার আবার অর্থের অভাব কি? তাঁহার আবার ঋণ কি? ঋণমুক্তই বা কি? তাঁহার আরও একটী ভ্রম হইয়াছিল, তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনি যখন আচার্য্য প্রভুর অগোচরে পত্রী লিখিয়াছেন, তখন ব্যাপারটী গোপনে গোপনেই সম্পন্ন হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্তে বিশ্বাস মহাশয়ের পত্রীখানি আসিয়া পড়িল।

"পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হইল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদমুখ॥

আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর।"
কিন্তু ঈশ্বরের দৈন্যকরি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা।"

মহাপ্রভু ক্রোধের ভান করিয়া স্বীয় ভৃত্য গোবিন্দকে আদেশ করিলেন, "দেখ গোবিন্দ, অল্প বিশ্বাসী ছন্নমতি বাউল্যা বিশ্বাসকে আর এখানে আসিতে দিও না, আমি ঐ বেল্লিকের আর মুখদর্শন করিব না।"

মহাপ্রভুর কঠিন দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কমলাকান্ত অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তগণ অপরবিধ কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে পরাঙ্মুখ বা ভীত নহেন, কিন্তু তদীয় শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত হইলে, তাঁহাদের দুঃখের আর সীমা থাকে না, আচার্য্য প্রভুর অনুরোধে মহাপ্রভু কমলাকান্তের প্রতি কিছু দিন পরে প্রসন্ন হইয়া ছিলেন, কমলাকান্তের দণ্ড সম্বন্ধে নানা বিচার বিতর্ক উঠিতে পারে; কিন্তু তাহা এ প্রস্তাবের লক্ষ্য নহে, তবে এ স্থলে একথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মহাপ্রভু যখনই যে ভক্তকে দণ্ড প্রদান করিয়াছেন, সে দণ্ডের উদ্দেশ্য লোক শিক্ষা। এ স্থলেও যে সে উদ্দেশ্য বজায় রহিয়াছে তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে নিম্নোদ্ধৃত পয়ার কয়েকটীতেই প্রকাশ পাইবে।—

"প্রভু কহে বাউল্য, ঐছে কেন কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি সে আচর॥
প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণ স্মৃতি বিনা হয় নিস্ফল জীবন॥
লোকে লজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥
এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল।"

মহাধনী শতানন্দ খানের পুত্র ভগবানাচার্য্য বিষয় আশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীলাচলে আসিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পদে আশ্রয় লইয়াছেন, ইনি সুপণ্ডিত ও পরম বৈষ্ণব, ইনি গোপাবতার, শ্রীভগবানের জনৈক সখ্য ভক্ত। ইনি মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে স্বীয় বাসায় একাকী নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন

পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন, এইরূপে একদিন শ্রীল ভগবানাচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভুর ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, আচার্য্য পরম যত্নে প্রভুর জন্য স্বহস্তে নানাবিধ অমৃততুল্য ব্যঞ্জন পাক করিয়াছেন, কিন্তু গৃহে যে তণ্ডুল ছিল, তাহা পাঁচমিশাল, অপরিষ্কার ও মোটা। আচার্য্য ভাবিলেন, এইরূপ কদর্য্য তণ্ডুলের অন্ন কেমন করিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিব, তিনি জানিতেন, শিখী মাহাতীর ভগিনী পরম তপস্বিনী মাধবী দাসীর গৃহে শালি তণ্ডুল আছে, অতএব স্বীয় বন্ধু মহাপ্রভুর প্রধান কীর্ত্তনিয়া ছোট হরিদাসকে বলিলেন :—

"মোর নামে শিখীমাহিতীর ভগিনীর স্থানে গিয়া।
শুক্ল চালু এক মাণ আনহ মাগিয়া॥"

সরল হৃদয় হরিদাস তাহাই করিলেন। রন্ধন সমাপ্ত হইল, মহাপ্রভু ভোজনে বসিলেন, অন্তর্য্যামী সকলই জানিয়াছেন, কিন্তু জানিয়াও যেন জানেন না, এইভাবে ভগবান আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"উত্তম অন্ন। এ তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা?"

আচার্য্য কহে—"মাধবীর পাশ মাগিয়া আনিলা॥

প্রভু কহে— "কোন্ যাই মাগিয়া আনিলা?"

তখন আচার্য্যের মনে ভয় হইয়াছে। কিন্তু সত্য গোপন করিতে পারেন না, কাজেই হরিদাসের নাম করিলেন, মহাপ্রভু ভোজনান্তে বাসায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় ভৃত্য গোবিন্দকে কহিলেন,—

"আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥"

এই নিদারুণ দণ্ডবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হরিদাস স্নানাহার বন্ধ করিলেন, দিবা নিশি তাঁহার কেবল আর্ত্তনাদ সার হইল, প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রভু যদি মার্জ্জনা না করেন, তবে উপবাসে প্রাণ-ত্যাগ করিবেন। হরিদাস যে কেবল নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, সাধু চরিত্র ছিলেন, তাহা নহে, হরিদাস ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যেকের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, সুতরাং মহাপ্রভুর নিকরুণ দণ্ডাজ্ঞা ও হরিদাসের প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া সকলেই নিতান্ত চঞ্চল ও কাতর হইলেন, তখন স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কোন অপরাধ প্রভু কৈলা হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা, করে উপবাস॥"

মহাপ্রভু উত্তর করিলেন,—

"বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

এই উত্তর প্রদান করিয়া মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। মনের ভাব তাঁহাকে যেন কেহ অনুরোধ না করে। আরো একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি সকলে মহাপ্রভুকে বিনয় করিয়া কহিলেন,—

"অল্প অপরাধ, প্রভো করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হৈল, না করিবে অপরাধ॥"

অর্থাৎ—"হরিদাস মাধবী দেবীর নিকট হইতে কেবল তণ্ডুল বিনিময় করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহার সহিত অন্য কোন আলাপ সম্ভাষণ করেন নাই, সুতরাং হরিদাসের কোন অপরাধই হয় নাই, যদিই অপরাধ হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ অল্প। পক্ষান্তরে হরিদাস আজ কয়দিন অস্নাত ও উপবাসী আছেন, তাঁহার মনঃকষ্টের ত সীমাই নাই, ইহাই তাঁহার লঘু পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে করিয়া, তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন, এই আমাদিগের অনুরোধ। তিনি কখনও আর ঈদৃশ অপরাধ করিবেন না।"

উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—

"—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥
নিজ কার্য্যে যাও সবে ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ যদি কহ আমা না দেখিবে হেথা॥"

এই নিদারুণ উত্তর শুনিয়া কর্ণে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক পার্ষদগণ যায় যার কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে ভক্তগণ হরিদাসকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করার জন্য, শ্রীল পরমানন্দপুরী গোস্বামীকে মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইলেন, মহাপ্রভু পুরী গোসাঞীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দাসের নিকট কিছু কি বক্তব্য আছে?"

পুরী গোসাঞী কহিলেন, "শ্রীপাদ, হরিদাস তোমার নিতান্ত অনুগত ও নিষ্পাপ, তাহাকে ক্ষমা কর।" এই অনুরোধে মহাপ্রভু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—

'—শুনহ গোসাঞি।
সব বৈষ্ণব লইয়া তুমি রহ এই ঠাঞি।
মোরে আজ্ঞা দেহ মুঞি যাঙ আলাল নাথ।
একলে রহিব তাহা গোবিন্দ মাত্র সাথ॥"

সত্য সত্যই মহাপ্রভু পুরী গোস্বামীকে প্রণাম করিয়া গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আলালনাথ চলিলেন, পুরী গোসাঞি অবাক্।

"আস্তে ব্যস্তে পুরী গোসাঞি প্রভু স্থানে।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাই আনে॥
"তোমার যে ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর॥
লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥"

অতঃপর পুরী গোস্বাঞি স্বকার্য্যে গমন করিলেন, এবং স্বরূপাদি ভক্তগণ হরিদাসের নিকট যাইয়া কহিলেন,—

প্রভু হঠ করিয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
প্রভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর॥
তুমি হঠ কৈলে আর হঠ সে বাড়িবে।
স্নানাহার করিলে আপন ক্রোধ যাবে॥"

কিন্তু মহাপ্রভু হরিদাসকে মার্জ্জনা করিলেন না। হরিদাসের বর্জ্জনলীলা গূঢ় রহস্যময়। তাহার উদ্ভেদ করিবার এস্থান নহে, প্রবন্ধান্তরে তাহার বিচার করিতে ইচ্ছা রহিল, ইচ্ছার পূরণ ইচ্ছাময়ের হাত।

উপরে যে দুইটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল, ইহার উভয় স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ শাস্তা। প্রতিশাসনেরও দুইটী কাহিনী বর্ণনা করিতেছি।

একদিন নিশীথ সময়ে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহাপ্রভু ভাবাবেশে ভ্রমণ করিতেছেন, ভৃত্য গোবিন্দ অদূরে মহাপ্রভুর অনুসরণ করিতেছেন। সহসা মহাপ্রভু শুনিতে পাইলেন, অতিদূরে মধুর কণ্ঠে কে যেন বিদ্যাপতির একটী পদ গাহিতেছে। ক্রমে গ্রামে গ্রামে সেই কোকিল কাকলি বিনিন্দিত স্বর উঠিতেছে ও নামিতেছে, সঙ্গে

সঙ্গে যেন অজস্রধারায় চতুর্দ্দিকে সুধা বর্ষণ হইতেছে। তখন সেই সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু সেইদিকে ধাবিত হইলেন। ক্রমে গায়কের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তখন তিনি ব্রজভাবে এতই মোহিত যে, বাহ্যজ্ঞান মোটেই নাই, সুতরাং জানিতে পারেন নাই,সেই মধুর পদ যিনি গাহিতেছিলেন তিনি একজন যুবতী। প্রভুর ব্রত নষ্ট হয় দেখিয়া গোবিন্দ অতিশয় আশঙ্কিত হইলেন, তখন পিতা যেমন পুত্রকে শাসন করেন, গোবিন্দ তদ্রূপ মহাপ্রভুকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, "প্রভো, নিরস্ত হউন, সঙ্গীতকারিণী দেবদাসী, উহাকে আলিঙ্গন করিলে ধর্ম্মনষ্ট হইবে। গোবিন্দের স্বর মহাপ্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র তিনি অতি দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বহুদূর গমনের পর গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, তুমি আমার প্রতি আজ পিতার কার্য্য করিলে। আমি আজ অতর্কিত ভাবে কি কুকর্ম্মই না করিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু বাপ! পিতা যেমন শাসন দ্বারা মূর্খ পুত্রকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তুমি আজ আমাকে তদ্রূপ স্বধর্ম্মচ্যুতি হইতে রক্ষা করিলে।"

দ্বিতীয়তঃ নীলাচলে একটী সুন্দর বিনয় পিতৃহীন ব্রাহ্মণকুমার প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইত। মহাপ্রভু ঐ বালককে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মক্ষিকা যেমন তাড়া পাইলেও মধুভাণ্ড হইতে উড়িয়া যায় না, সেইরূপ প্রীতি পাইলে প্রীতিকারকের প্রতি বালকের ঈদৃশ আসক্তি জন্মে যে, শত নিষেধ করিলেও বালক প্রীতিকারকের নিকট না আসিয়া থাকিতে পারে না। স্বরূপ দামোদর এই উড়িয়া বালকের সহিত মহাপ্রভুর এত মাথামাখি ভাব ভালবাসিতেন না। ফলতঃ তিনি তাহাতে এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, বালকের আসা যাওয়া বন্ধ করিতে বিবিধ মতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, কেননা প্রভুও তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। একদিন দামোদরের এতই অসহ্য হইল যে, তিনি মহাপ্রভুকে উদ্দেশ করিয়া ঠারে ঠোরে বলিতে লাগিলেন—

"অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞির ঠাঁই।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি॥"
একে গোসাঞীর গুণ সব লোকে গাহিবে।
গোসাঞি-র প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে॥

দামোদর পণ্ডিতের সক্রোধ ভাব দর্শন করিয়া এবং প্রহেলিকার মত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু অনেকক্ষণ কারণানুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শেষে কহিলেন, "পণ্ডিত! তোমার ভাব দেখিয়া [illegible] আমার কোন অসঙ্গত ব্যবহার দেখিয়া তুমি দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছ, কিন্তু তুমি যে কি বলিতেছ, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ সকলেই নির্ভীক, সত্যবাদী এবং প্রভুর পরম হিতৈষী। সুতরাং দামোদর পণ্ডিত কিছুমাত্রও সঙ্কোচ না করিয়া মনের কথা তীব্র ও স্পষ্ট ভাষায় বলিতে লাগিলেন, দামোদর পণ্ডিত বলিলেন, "প্রভু, তুমি স্বয়ং ভগবান, স্বতন্ত্র ঈশ্বর—তোমাকে আর কি বলিব, তুমি—

"স্বচ্ছন্দে আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতের মুখ না পার আচ্ছাদিতে॥
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর পুত্রে প্রীতি কেন কর।
যদ্যপি ব্রাহ্মণী হয় তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর,
লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর॥"

পণ্ডিতের বাক্যে মহাপ্রভু পরম পরিতুষ্ট হইয়া একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত, আজ বুঝিলাম তুমি আমার পরম সুহৃৎ, পরম হিতৈষী। প্রকৃত অন্তরঙ্গ না হইলে, এমন শাসন অন্যে সম্ভবে না।" ইহার অল্পদিন পরে দামোদর পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া মহাপ্রভু কহিলেন—

"—দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তথা গিয়া॥
তোমাবিনা তাঁহাকে রক্ষক নাহি আন।
আমাকেও যাতে তুমি কৈলা সাবধান।
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে,
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যা নহে তা তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলা দণ্ড আন কেবা হয়॥"

প্রস্তাব সমাপ্তির পূর্ব্বে পাঠককে জিজ্ঞাসা করি, এমন অতুলন, অনুপম, অপ্রতিম গুরু-শিষ্যভাব কি আর কোন ধর্ম্মে কেহ দেখিয়াছেন ? তাই প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গলীলা যেমন সুন্দর, যেমন নূতন, তেমনিই মধুর।

কৃষ্ণ-কথা

(নিকুঞ্জ-প্রসঙ্গ)

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি এ, লিখিত।)

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জবনে, বহুবিধ আলাপনে,
হৃষ্ট মনে পোহান শর্ব্বরী।
তার মধ্যে কোন কথা, জীব-শ্রুতি যোগ্য যথা
দাস-হৃদে জাগান শ্রীহরি॥
জীবের কল্যাণ তরে, নতশিরে যুক্ত করে
নিবেদন করিব সবারে।
অবহিত চিত্তে সবে, শুন ভাই শুন তবে,
শ্রবণে মঙ্গল হ'তে পারে

'কৃষ্ণকথা' কৃষ্ণকথা অবশ্যই বটে।
দিব্য নেত্রে হের কৃষ্ণ খেলে সর্ব্বঘটে॥
অতএব মোর ভাই নাহি ল'বে দোষ।
বৈষ্ণবের পদরেণু দাসের সন্তোষ॥
রাধা কন প্রাণনাথ জীবের দুর্গতি।
স্মরিয়া আমার প্রাণ কাঁদিছে সম্প্রতি॥
তুমি প্রভু হৃষীকেশ জগতের স্বামী।
মঙ্গল নিধান তুমি সর্ব্ব হিতকামী॥
তোমারি বিশাল বক্ষে জীবের বসতি।
তথাপি তোমাতে কারো নাহি রতিমতি॥
হেরিয়া নিশ্চিন্ত কেন আছ দয়াময়।
জীবের উদ্ধার কার্য্য সুসাধ্য কি নয়॥
কটাক্ষে করিতে পার, ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ।
তথাপি জীবের কেন দৃঢ় মোহ পাশ॥
তোমার ইঙ্গিতে জীব হয় শুদ্ধমনা।
অক্লেশে ত্যজিতে পারে মলিন বাসনা॥

পাপ-ভারাক্রান্ত জীব কাঁদে নিশিদিন।
দেখিয়া দেখনা কেন থাক উদাসীন॥
জীবের নিস্তার পথ করিতে সুগম।
দয়াময় নাম ধরি' হ'য়ো না নির্মম॥
ইচ্ছা মাত্র যদি জীবে উদ্ধারিতে পার।
তবে কেন কাঁদে তারা না পায় নিস্তার॥
কৃষ্ণ ক'ন অয়ি প্রিয়ে কি ক'ব রহস্য।
বুঝিলে আমার দোষ না দিবে অবশ্য॥
ভোগ সুখে মত্ত জীব নাহি শুনে যুক্তি।
কেমনে হইবে বল তাহাদের মুক্তি॥
দারা পুত্র ধন মান সকলেই চায়।
যত পায় তত চায় কি বিষম দায়॥
ভোগের বাসনা কারো নাহি মিটে কভু।
ভোগ লাগি'সবে মোরে কহে প্রভু প্রভু॥
পূরয়ে কামনা যদি করে সাধুবাদ।
অন্যথা, বিধানে মোর দেখায় প্রমাদ॥
ভক্তিযোগে মোরে চিন্তি' যদি করে ভোগ
তবে ক্রমে যায় ঘুচে যত ভবরোগ॥
বিধিমতে করি চেষ্টা' জ্ঞান দিতে সবে।
বুঝেও বুঝেনা কেহ রহে ডুবে ভবে
বিষয়ের অনিত্যতা প্রতি ঘটনায়।
বুঝাইতে করি যত্ন ধরি' সদুপায়॥
তথাপি বুঝে না কেহ মত্ত মায়া ঘোরে।
কেমনে করিব সাধু শঠ কিম্বা চোরে
রাধা ক'ন প্রাণনাথ এই বা কেমন।
শঠ চোর কোথা রয় পেলে কৃপাকণ॥
মুকেরে করিতে বাগ্মী যদি তুমি পার।
দুষ্টেরে করিতে সাধু কিবা তব ভার॥

ইচ্ছামাত্র কুবাসনা করিয়া উচ্ছেদ।
জীবের ঘুচাতে পার দুঃখ আর খেদ॥
জীব তো তোমার হাতে পুত্তলিকা সম।
জীবে দোষ কেন দাও হইয়ে নির্মম॥
কৃষ্ণ ক'ন ইচ্ছা রুচি জীবের স্বতন্ত্র।
ইচ্ছামত ফল দেয় মোর ঐশী যন্ত্র॥
যে যাহা পাইতে চায় ক্রমে তাহা পায়।
জীব সাথে সদা মুই চলি পায় পায়॥
ঐশী ইচ্ছা কভু জীব নাহি ভাবে মনে।
স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে প্রাণ পণে॥
যে জন আপন ইচ্ছা করে বলিদান।
মোর সনে একীভূত করে মনঃ প্রাণ॥
তাহারে নিজস্ব মুই করিয়া সর্ব্বথা।
যতনে ঘুচাই তার যত ভব ব্যথা॥
"অহং" জ্ঞান জীব হৃদে বড় অন্তরায়।
"অহং" থাকিতে জীব মোরে নাহি পায়॥
"অহং" পুষ্প মোর পদে দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি।
আনন্দে ভাসয়ে জীব "হরি, হরি," বলি॥
রাধা ক'ন প্রাণনাথ "অহং" কেড়ে নাও।
"অহং" কাড়িয়া জীবের বন্ধন ঘুচাও॥
কৃষ্ণ ক'ন প্রিয়ে তাহে লীলা নাহি চলে।
কালে সবে মুক্ত হ'বে মোর সুকৌশলে॥
দুঃখে জ্বালা যত দেখ দুদিনের তরে।
কোথায় তাহার দুঃখ যেবা মোরে স্মরে॥
"হরে কৃষ্ণ হরে রাম" যেবা সদা গায়।
এড়াবে ভবের জ্বালা সত্য মোরে পায়॥
এত শুনি' রাধারাণী ক'ন "হরি হরি"।
"রাধা-কৃষ্ণ" জপ জীব মোহ পরিহরি॥

বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা

বৈশাখ।

শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রত।	৮ই বুধবার।
একাদশী। দমনকারোপণ উৎসব	১১ই শনিবার।
শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা।	১৮ই মঙ্গলবার।
একাদশী।	২৫এ শনিবার।
অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা।	৩১এ শুক্রবার।

জ্যৈষ্ঠ।

জহ্নু-সপ্তমী।	৪ঠা মঙ্গলবার।
একাদশী।	৯ই রবিবার।
শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত।	১২ই বুধবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোলযাত্রা।	১৩ই বৃহস্পতিবার।
একাদশী।	২৩এ রবিবার।

আষাঢ়।

একাদশী।	৭ই মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা।	১০ই শুক্রবার।
একাদশী।	২১এ মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।	২৬এ রবিবার।

শ্রাবণ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা।	৩রা মঙ্গলবার।
একাদশী। প্রদোষে শ্রীশ্রীহরির শয়ন। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।	৫ই বুধবার।
একাদশী।	১৯এ বুধবার।

ভাদ্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রারম্ভ।	২রা বৃহস্পতিবার।
একাদশী। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ।	৩রা শুক্রবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন। শ্রীশ্রীবলদেবের জন্মযাত্রা।	৬ই সোমবার।
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত।	১৩ই সোমবার।
একাদশী।	১৬ই বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত।	২৯এ বুধবার।

আশ্বিন।

একাদশী। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীবামন দেবের অর্চ্চনা। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন।	১লা শনিবার।
একাদশী।	১৫ই শনিবার।
শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।	২৯এ শনিবার।
একাদশী।	৩০এ রবিবার।

কার্ত্তিক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসযাত্রা।	৩রা বুধবার।
একাদশী।	১৫ই সোমবার।
অন্নকূট ও গোবর্দ্ধনযাত্রা।	২০এ শনিবার।
গোপাষ্টমী।	২৭এ শনিবার।
একাদশী। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীহরির উত্থান। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন।	৩০এ মঙ্গলবার।

অগ্রহায়ণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।	৩রা শুক্রবার।
একাদশী।	১৫ই বুধবার।
একাদশী।	২৯এ বুধবার।

পৌষ।

একাদশী।	১৫ই বৃহস্পতিবার
একাদশী।	৩০এ শুক্রবার।

মাঘ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা।	৩রা সোমবার।
একাদশী।	১৫ই শনিবার।
বসন্ত পঞ্চমী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন।	২০এ রবিবার।
মাকরী সপ্তমী, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব উৎসব।	২৫এ মঙ্গলবার।
ভৈমী একাদশী।	২৯এ শনিবার।

ফাল্গুন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব।	২রা সোমবার।
একাদশী।	১৬ই সোমবার।
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত।	১৮ই বুধবার।
একাদশী ও আমর্দ্দকী ব্রত।	৩০এ সোমবার।

চৈত্র।

শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা।	৪ঠা শুক্রবার।

৪৪২ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ।

একাদশী।	১৫ই মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রত।	২৭এ রবিবার।
একাদশী।	২৯এ মঙ্গলবার।

মন্তব্য :—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা যতিধর্ম্মপরায়ণা (বিধবা) দ্বিজপত্নীগণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে। কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে সার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোস্বামী মধুসূদন লালজি (শ্রীধাম বৃন্দাবন) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন এবং প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন (শ্রীধাম নবদ্বীপ) মহাশয়গণকে পত্র লিখিবেন।

আচার্য্যগণের অভিমতানুসারে
শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী—
সম্পাদক
কলিকাতা, ১৬১ নং হ্যারিসন রোড। ভাগবত ধর্ম্ম মণ্ডল।

বিশ্বরূপের পত্র

বিশ্বরূপের সঙ্গীত প্রকাশ কিছুদিন ভক্তিতে বন্ধ থাকায় অনেকেই কারণ জানিতে চাহিয়াছেন। আমরাও বিশ্বরূপের নিকট নূতন সঙ্গীত প্রার্থনা করিয়া পত্র দিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি যে উত্তর পাঠাইয়াছেন ভক্তির পাঠকগণের

অবগতির জন্য তাহা নিম্নে মুদ্রিত করিয়া দিলাম। পুনরায় তাঁহাকে পত্র দেওয়া হইল। যদি নূতন সঙ্গীত না পাই, তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রাপ্ত, যে সকল সঙ্গীত প্রকাশ হয় নাই, এবং যাহা আমাদের নিকট আছে, তাহাই আগামী সংখ্যা হইতে ২।১টি করিয়া প্রকাশ আরম্ভ করিব। (ভঃ সঃ)

"লিখিত পত্রের উত্তর"

ভাগ্য শরণং

মাননীয়—

শ্রীশ্রীভক্তি পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

চাঁদ বিনা পূর্ণিমায় রহিল আঁধার,
নিবে গেল ধ্রুবতারা, না উঠিবে আর।
যদি বা প্রভাত হয় বিষাদের কোলে,
না মাতিবে পিকবর কুহু কলরোলে।
না ফুটিবে ফুল, যদি আসে ঋতুরাজ,
তপ্ত বায়ু পোড়াইবে প্রকৃতির সাজ।
লাগিবে গ্রহণ যাবে রাহু মুখে রবি।
বিদায় এ "বি——" * কলঙ্কিত কবি॥

নিঃ

বিশ্বরূপ—

পাবনা

* বি——বিশ্বরূপ

চয়ন

(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট সংগৃহীত)

শ্রীধাম নবদ্বীপ।—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অমৃতলাল বসু মহাশয় একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"পৃথিবীর মানচিত্রে নবদ্বীপের ন্যায় স্থান আর কোথায় আছে! বিলাতী চশমা চোকে বাঙ্গালী আমরা আজ দূরে—দূরান্তরে দৃষ্টি

শক্তির প্রয়োগ করিয়া রোমের পোপের প্রাসাদস্থ উচ্চ চূড়া দেখি, সভ্যতার সূতিকাগারে বসিয়া সেই রোমের ব্যাখ্যাকার, গ্রীসের পাণ্ডিত্য, ইটালীর শিল্প, ভিনিসের ঐশ্বর্য্য কল্পনায় আত্মহারা হই। ঐসব পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়া গ্রীশের স্মরণে ধন্য হই, জেরুজিলাম, মক্কা, মদিনার বন্দনা গানও করিয়া থাকি। পারস্যের আস্যে সভ্যতার হাস্য আমাদের দ্বারা উপেক্ষিত নয়। চীনও চিনি; শ্রীশ্রীবুদ্ধ দেবের লীলাভূমি মগধও কাহাকে কাহাকে মুগ্ধ করে, কিন্তু জন কয়েক বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ভিন্ন নবদ্বীপ আর কার প্রাণ আকৃষ্ট করে।

হায় নবদ্বীপ। তুমি যে, মাটীতে গড়া, তুমি যে কুটীরের পাড়া, তোমার সাড়া কি এই ইংরাজী পড়া প্রাণে পশিতে পারে?

থাক নবদ্বীপ। চুপ ক'রে থাক, তুমি চির-শান্ত, শান্ত হ'য়েই থাক। আপনার মনে মনে দেখ—তোমার বুকে একদিন রাজার সিংহাসন পাতা ছিল। তুমি পাণ্ডিত্যের তীর্থ, কবিত্বের তীর্থ, কীর্ত্তনের তীর্থ, নবরূপধারী ভগবানের শ্রীচরণ স্পর্শে তোমার প্রত্যেক ধূলিকণা পবিত্র, আর সুদূর পশ্চিমে বন কাটিয়া শ্রীবৃন্দাবনকে সোনার টোপর পরাইয়াছিলে তুমি।

ঈশ্বর প্রেমের অনুরাগ রসে নর-নারীকে হৃদয়কে চির সঞ্জীবিত করিতে ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই নবদ্বীপেই নিমাই নামে ভূমিষ্ঠ হয়েন। সেই রসের সঞ্চারেই বঙ্গের কবিত্ব শক্তি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, বহু কণ্ঠ মধু হইতে মধুরতর কীর্ত্তন গীতে মানব মন মাতোয়ারা করিয়া তুলিল. উন্মাদ নর্ত্তন বৈষ্ণবের বাহুতে কাজী বিজয়ী বল আনিল। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় জাতিভেদের বেষ্টনী বন্ধন খণ্ডন করিয়া হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে আলিঙ্গন করেন।"

উক্ত প্রবন্ধের একস্থানে আছে,—ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগে নবদ্বীপের ন্যায় পণ্ডিত আর কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? পুঁথি লিখিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার গুপ্ত ধন সমগ্র ন্যায় শাস্ত্রটা কণ্ঠস্থ করিয়া নিজ বাস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নব্য-ন্যায়ের সৃষ্টি এই নবদ্বীপেই।" *

---

* আমরা জানি, এই মহাগৌরবের অধিকারী শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম। রঘুনাথ ইঁহারই শিষ্য ছিলেন, এবং ইঁহারই কৃপায় অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন। আবার এই রঘুনাথের প্রাণের গভীর দুঃখ নাশ করিবার জন্যই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ হরি স্বরচিত অদ্ভুত ন্যায়ের গ্রন্থখানি গঙ্গাতে ভাসাইয়া দিয়া ছিলেন। (ভঃ সঃ)

২৪শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

ভক্তি

জ্যৈষ্ঠ মাস
১৩৩৩

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায়।

(শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার রায়, বিদ্যাবিনোদ লিখিত)

আজো তেম্‌নি ক'রে গৌর নাচে।
সোনার মূরতি জাগায়ে স্মুরতি
ভকত-নয়ন কাছে।
তেম্‌নি ক'রে বাজে করতাল খোল,
ঘন ঘন হয় হরি হরি বোল
নাচিয়ে নাচিয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
ভকত করুণা যাচে॥
অদ্বৈত নাচিছে মাদল বাজায়ে
নিতাই নাচিছে পাষণ্ড দলিয়ে
নাচে হরিদাস, কত না উল্লাস,
নামেতে কি মধু আছে॥
বিষয়-বাসনা চরণে দলিয়া
যাবে না কি ভাই শ্রীহরি বলিয়া
শ্রীবাস অঙ্গনে, গৌর দরশনে,
'যামিনী'ও যাবে পাছে॥

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা লিখিত)

[৩]

(নিত্যানন্দের গৃহত্যাগ)

"নিত্যানন্দমহং বন্দে প্রেমানন্দস্বরূপকং।
চৈতন্যাগ্রজরূপেন পবিত্র কৃতভূবনম্ ॥"

ইহার পর কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। নিতাই, বলরামের অবতার, জীব উদ্ধারের নিমিত্ত আসিয়াছেন, তাই তাহার দেহে বলরামের আবির্ভাব হইয়াছিল। এখন তাহার ছোট ভাই যিনি শ্রীরাধার প্রেমের ঋণ শোধিবার জন্য শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি দ্বারা স্বীয় কৃষ্ণাঙ্গ আবৃত করিয়া সুবর্ণচম্পক-নিন্দিত কান্তি ধারণ করিয়া নিমাই নামে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার সহিত ক্রমশঃ মিলিত হইতে হইবে। নিতাইর উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত—পিতামাতার স্নেহডোর ছিন্ন করিবার সহায়করূপে এক অপূর্ব্ব-দর্শন সুন্দর মূরতি সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথি হইলেন।

সন্ন্যাসী যেমন দেখিতে সুন্দর তেমনি পরম পণ্ডিত, আবার তেমনি বিষ্ণুভক্ত। হাড়াই পণ্ডিত পরম যত্নে অতিথিকে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। নিতাইচাঁদ এই প্রিয়-দর্শন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছেন। তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীও এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সুকুমার বালককে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং পরম স্নেহে বক্ষে ধরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

সন্ন্যাসী সে রাত্রে হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী ও গৃহ-স্বামী উভয়ের মধ্যে আনন্দের অবধি নাই। কৃষ্ণ-কথায় পরমানন্দে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। হায়! সরল চিত্ত ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিল না যে, এই রজনী প্রভাতের সহিত তাহার সমস্ত পার্থিব সুখের অবসান হইবে।

প্রাতে বিদায়কালে সন্ন্যাসী এক অপূর্ব্ব প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "পণ্ডিত, আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

তখন হাড়াই পণ্ডিতের মনে পড়িল, নিত্যানন্দের সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নের কথা, কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে হৃদয় তাহার দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ভয় ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "আজ্ঞা করুন, আপনার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিবে না।" হায়! অতিথি-সেবা পরায়ণ সোনার ভারতের সে স্বর্ণযুগ কোন্ অতীতের ক্রোড়ে চিরতরে বিলীন হইয়াছে।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি তীর্থ পর্য্যটনে চলিয়াছি, একটি সঙ্গীর আবশ্যক, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে কতকদিনের জন্য আমার সঙ্গে দাও। আমি তাহাকে প্রাণাধিক জ্ঞান করিব, সযত্নে রাখিব এবং তিনিও আমার সহিত তীর্থ করিবেন।"

"ন্যাসী বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।
নিত্যানন্দ পিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার॥
ন্যাসী বলে করিবারে তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এই যে সরল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি দেহ সংহতি আমার॥
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্বতীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে॥
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য স্তব্ধ বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর॥
প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও "সর্ব্বনাশ হয়" হেন বাসি॥
ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল।"*
রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন।
যদ্যপিহ রাম বিনে রাজা নাহি জীবে।
তথাপি দিলেন—এই পুরাণেতে কহে॥
সেই ত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম্মসঙ্কটে কৃষ্ণ! রক্ষা কর মোরে॥"

* কর্ণ-বৃষকেতু সংবাদে ব্রাহ্মণবেশী শ্রীহরির নিকট কর্ণের স্বহস্তে পুত্রের প্রাণ বিনাশে প্রতিশ্রুত হওনের সংবাদ সকলে জ্ঞাত আছেন। [লেখক]

এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া হাড়াই পণ্ডিতের হৃদয়ে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা কি আর বর্ণনা করিয়া জানাইবার! হাড়াই ভাবিতেছেন, যে প্রাণাধিক পুত্রকে নয়নের অন্তরালে রাখিলে জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে সেই নয়নানন্দস্বরূপ পুত্ররত্নকে কিরূপে অজ্ঞাত কুলশীল সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিবেন। আবার ভাবিতেছেন, পত্নী পদ্মাবতীরও ত সম্মতি লওয়া দরকার! আমি না হয়, সন্ন্যাসী বাছাকে লইয়া যে পথে গমন করিবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া সেই পথের পথিক হইব।

পণ্ডিত পত্নীর নিকট গমন করিয়া বড়ই কাতরভাবে সমস্ত কথা তাহাকে বলিলেন। পতিগতপ্রাণা সাধ্বি প্রথমতঃ পতির এই অদ্ভুত বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বোধের ন্যায় শূন্যদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমশঃ স্বামীর বাক্যের অর্থ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন নিদারুণ যাতনায় অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার উভয় গণ্ডদেশ প্লাবিত হইতে লাগিল। তখন দেবী অশ্রু গদগদ কণ্ঠে পাতিব্রত্য ধর্ম্মে ত্রিলোক মোহিত করিয়া বলিলেন,—

"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই মোর কথা।"

এই কথা শুনিয়া,—

"আইলা সন্ন্যাসী স্থানে নিত্যানন্দ পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র নোয়াইয়া মাথা॥"

কৃপাময় পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, যাঁহারা এক কথায় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য সন্ন্যাসীকে পরম স্নেহের ধন পুত্ররত্নকে চিরতরে ভিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহারা কি জাতীয় জীব!

আজন্ম স্নেহপালিত নিতাই আমার জননীর স্নেহের কোল শূন্য করিয়া পিতামাতার বাক্যে মুহূর্ত্তমধ্যে দণ্ড কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর সঙ্গী হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার কামনার ধন প্রাপ্ত হইয়া চকিতে মুকুন্দ * পণ্ডিতের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার লীলার পুষ্টিকল্পে আজ নিতাই আমাদের সন্ন্যাসী-সঙ্গ-ছলে পিতামাতার স্নেহডোর ছিন্ন করিয়া জগদ্বাসীর অবাধ ও অসীম স্নেহের মধ্যে বিচরণ করিতে চলিলেন। জীব-উদ্ধার নিমিত্ত কৃপায় যাঁহাদের অবতার গ্রহণ, তাঁহাদের মহিমারাশি আর কি বর্ণনা করিতে পারি?

---

* মুকুন্দ হাড়াই পণ্ডিতেরই নামান্তর। [লেখক]

এদিকে নিতাইচাঁদকে হারাইয়া একচক্রার সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর মুকুন্দ ও পদ্মাবতী, তাঁহাদের বিষয় আর কি বর্ণনা করিব, প্রাণাধিক পুত্র নয়নের অন্তরাল হইলে—

"মূর্চ্ছিত হইয়া হাড়াই পড়িলা ভূমিতলে।"
"প্রাণহীন প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী।
হৈল এ দোঁহার দশা কহি কি শকতি॥" (ভঃ রঃ)

পদ্মাবতী নিদারুণ পুত্রশোকে পাগলিনী প্রায় হইলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, তাঁহাদের শোকে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিগণও বিগলিত চিত্ত হইল। তাঁহাদের এই মহা বিরহের চিত্র ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সহিত গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, দাবানলের ন্যায় একথা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সঙ্গী বালকগণ এই সংবাদ পাইয়া হাহাকার করিয়া ছুটিয়া আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, হায়! কোথায় গেলে ভাই নিতাই। তোমাকে না দেখিয়া আমরা কিরূপে বাঁচিব।

কেহ কেহ নিত্যানন্দের শোকে এরূপ অধৈর্য্য হইয়া পড়িল যে, তাঁহার অন্বেষণে তীর্থপর্য্যটনে চলিয়া গেল।

নিতাইর একটি ছোট ভাই ছিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, হায়! নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, তুমি কেন আমাকে লইয়া গেলে না। দাদার শোকে যে কেহই বাঁচিবে না। এ করুণ দৃশ্যে কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না।

দেবী পদ্মাবতী ও হাড়াই পণ্ডিত পুত্রশোকে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের কাছে কেহই যাইতে পারিত না। যাইলে এরূপ শোকের দৃশ্য নয়নে পড়িত যে, লোকে তাহা সহ্য করিতে পারিত না। এইরূপে তিনমাস অতীত হইয়া গেল। এই তিনমাসে তাঁহারা একরূপ অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়।

একদিন একব্যক্তি নিত্যানন্দ ভবনে গমন করিয়া শুনিলেন, হাড়াই পণ্ডিত বলিতেছেন, "বাপ! এস এস কোলে এস, অনেকক্ষণ তোমায় দেখি নাই। একবার কোলে এস, দু'জনে স্নান করে আসি।" বস্তুত, নিকটে কেহই ছিল না, পণ্ডিত আপন মনে প্রলাপ বকিতেছিলেন।

কখন বা বলিতেছেন, "বাপ, গৃহে যাও তোমার জননী ডাকিতেছেন, অন্ন প্রস্তুত আহার কর গিয়ে।"

গ্রামে রাষ্ট্র হইল, হাড়াই পণ্ডিত পাগল হইয়াছেন। ভব্য ব্যক্তিগণ সান্ত্বনা দিতে আসিয়া বুঝিলেন যে পণ্ডিত পাগল হইয়া যান নাই বটে, তবে পুত্রশোকে এরূপ বিহ্বল হইয়াছেন যে, তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই বলিলেও চলে, তিনি ভব্য লোকের সহিত কথা বলিতে বলিতে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন—বাপ! চল হাটে যাই, তথায় তোমার যাহা ইচ্ছা চাহিবে তাহাই কিনিয়া দিব। উপস্থিত ব্যক্তিগণের ঐ দৃশ্যে নয়নে অশ্রুধারা দেখা দিল।

একদিন এইরূপ বিহ্বল অবস্থায় পদ্মাবতীকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "ওগো শীঘ্র এস, তোমার অঞ্চলের ধন ফিরে এসেছে দয়ার সাগর সন্ন্যাসি ঠাকুর কৃপা করিয়া আমাদের নিতাইচাঁদকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" স্বামীর চীৎকারে, দেবী দৌড়িয়া আসিলেন, কিন্তু কই, নিতাই ত আসে নাই, দ্বিগুণ শোকে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

লোকে আর এ দৃশ্য দেখিতে পারে না, অনেকে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কেহ বা সন্ন্যাসীর অন্বেষণে বাহির হইল। মনের ভাব, সন্ন্যাসী যদি তাহার পুত্রটীকে লইয়া নিত্যানন্দকে ফিরাইয়া দেয়।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ভাবিতেছেন, সন্ন্যাসীর আগমন, নিত্যানন্দের গৃহ ত্যাগের একটা ছল মাত্র। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, আমরা সে বস্তু পাইয়া চিনিতে পারি নাই। তাঁহার শুভ জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে গ্রামের যে সমস্ত অমঙ্গল চলিয়া গিয়াছিল।

কেহ বলিল, সত্য সত্যই বালকের ক্রীড়াও যে কি এক অপূর্ব্ব দর্শনীয় বিষয় ছিল, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ!

এইরূপ দুঃসহ বিরহে সকলেই কাতর, ক্রমে হাড়াই ও পদ্মাবতীর দিন ফুরাইয়া আসিল। তাঁহারা সমস্ত শোকের হাত হইতে মুক্ত হইলেন।

দয়াল নিতাই জগতের হিতার্থে পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া ছিলেন। যুগে যুগে এ দৃশ্যের অভিনয় বহুবার হইয়াছে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। রাম অবতারে, দশরথ ও কৌশল্যার, পুত্র বিরহে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ কি ভুলিবার! দ্বাপরে, মথুরায় ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতাগণের শ্রীকৃষ্ণের বিরহের মহান্ চিত্র যে প্রতিনিয়ত আমাদের প্রাণে জাগিতেছে। তাহার পর গৌর অবতারে, পুত্র বিরহ-কাতরা বৃদ্ধাগণের হাহাকার রবে গৌরভক্তগণের কোমল হৃদয় যে আজিও বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাই বলিতেছিলাম এই যে চিরন্তনী রীতি, এই যে সনাতন প্রথা, একচক্রায় কি তাহার

ব্যতিক্রম হইতে পারে? একদিকে পুত্রের বিরহ অগ্নিতে জনক জননী ভস্মীভূত হইলেন, অপর দিকে জগতের হিতার্থে নিত্যানন্দ পথের ভিখারী হইয়াছেন, ইদানীন্তন স্বার্থপরতার যুগে ইহা এক অপূর্ব্ব দৃষ্টি।

ক্রমে একচক্রার সমস্ত মঙ্গল চিহ্ন যেন লুপ্ত হইয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত অমঙ্গল চিহ্ন দেখা দিল। নানা রোগ আসিয়া গ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিল, অনেকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার কেহ কেহ নিত্যানন্দের আগমন প্রত্যাশা করিয়া গ্রাম মধ্যেই রহিলেন। এইরূপ জনৈক প্রাচীন ব্যক্তির বাক্য ভক্তি রত্নাকরে উদ্ধৃত আছে। যথা—

"মুই বিপ্রাধম এই কথোজনে লৈয়া।
আছি একচক্রায় পূরব সোঙরিয়া॥
মনের উদ্বেগে ঘরে নারি স্থির হৈতে।
হইনু অথর্ব্ব অতি, না পারি চলিতে॥
মনে ছিল যদি বিধি রাখিল আমারে।
অবশ্য দিবেন সুখ কিছু দিন পরে॥
জন্মভূমি সোঙরিয়া নিতাই আমার।
একচক্রা আসিবে দেখিব পুনর্ব্বার॥
মোর দুর্দ্দৈবেতে তিঁহো নির্দ্দয় হইল।
হেন একচক্রা গ্রামে পুনঃ না আইল॥
*　　*　　*
হইনু নিরাশ এবে আশা নাই আর॥"

এইরূপে নিত্যানন্দ বিরহে একচক্রার সমস্ত সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইয়াছিল। সামান্য যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা মৌড়েশ্বর (বর্ত্তমান ময়ুরেশ্বর) নদের প্রবাহে নিঃশেষিত হইয়াছিল। 　ক্রমশঃ

উপবাস ও স্বাস্থ্য।

চিকিৎসকগণ আজকাল উপবাস করার উপকারিতা দিন দিন উপলব্ধি করিতেছেন। স্বাস্থ্যলাভ করার জন্য উপবাস করা একটা প্রধান উপায়। আমাদিগের শরীরে নানাপ্রকার বিষ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং আমাদিগের

রক্ত পরিষ্কার রাখিতে হইলে এই বিষ সকল দূর করা প্রয়োজন। আমাদিগের শরীরগত বিষ দূর করার জন্য এবং পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে, ঐ সঞ্চিত বিষ সম্পূর্ণরূপে দূর করার এই উপবাস অপেক্ষা আর উত্তম উপায় নাই।

কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে হঠাৎ একসঙ্গে অধিক দিন উপবাস করা কষ্টকর, এমন কি বিপজ্জনকও হইতে পারে। কারণ উপবাস করিলে হৃদ্‌যন্ত্র এবং শরীরের অতিরিক্ত কার্য্য হয় এবং তাহারা তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোক যদি উপবাস চাহে তবে তাহার পক্ষে ক্রমে ক্রমে খাদ্যের মাত্রা এক পক্ষ ধরিয়া কমাইয়া আনা উচিত। তাহার পরে একেবারে উপবাস আরম্ভ হইতে পারিবে। উপবাসের সময়ে অতিরিক্ত সকল প্রকার শারীরিক পরিশ্রম বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু বিনা আয়াসে সাধারণ ছোট খাট কার্য্য সকল করা যাইতে পারিবে। উপবাস আরম্ভ করার পূর্ব্বে শরীর হইতে যতটা সম্ভব বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য বিরেচক কোনও প্রকার পদার্থ সেবন এবং তাহার পরে প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত। কারণ, জল দ্বারা শরীরের বিষ অনেক পরিমাণে দূর হয় ও অব্যবহার্য্য পদার্থ সকল ধৌত হইয়া যায়।

যদিও দুই দিন উপবাস করা অতি সামান্য তথাপি অনেকে উহা কষ্টকর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সত্যই তাহা নহে। যাঁহারা অধিক পরিমাণে আহার করিতে অভ্যস্ত তাঁহাদের পাকস্থলী শূন্য হওয়ায় যেরূপ অসুবিধা বোধ হয়, তাহাতে তাঁহারা কষ্টবোধ করিতে পারেন; কিন্তু এই অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ইহার পরেই শরীর হাল্কা বোধ হয় ও তৎসঙ্গে মস্তিষ্ক পরিষ্কার হইয়া যায়। এই অবস্থায় হৃদযন্ত্রের কার্য্য কিছু বাড়িয়া যায়, কিন্তু এই লক্ষণ অতিরিক্ত পরিশ্রম বন্ধ করিলেই কমিয়া যায়।

উপবাস করার সময়ে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে গাত্র মার্জ্জন ও মর্দ্দন করিলে শরীর হইতে বিষ বাহির হইয়া যাওয়ার সুবিধা বেশী হয়। কারণ এইরূপ মার্জ্জন ও মর্দ্দনে গাত্র চামড়ার নীচে রক্ত প্রবাহ ঝরিয়া যায় ও তাহাতে আলোক লাগিয়া রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়। অল্পদিন উপবাস করিয়া পুনরায় সাধারণ খাদ্য খাইতে আরম্ভ করিলে কি প্রকারে তাহা করিতে হইবে তাহা জানা অতি প্রয়োজন। উপবাস ত্যাগ করিয়া প্রথম খাদ্য কমলার রস, মিশ্রীর জল। উপবাসান্তে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অতি উত্তম খাদ্য। প্রাতঃকালে যদি উপবাস বন্ধ করা হয় তাহা হইলে কমলার রস পান করার পরে আর কিছু

সেবন করা উচিত নহে। তৎপরে দ্বি-প্রহরে এক গ্লাস দুগ্ধ ও একটু মিশ্রী ভিন্ন বেশী কিছু খাওয়া উচিত নহে। এই অবস্থায় চা পান করা ঠিক নহে। সন্ধ্যার সময় কাঁচা শাকসব্জি সেবন করিতে হইবে, ইহা রক্ত পরিষ্কার করিতে অদ্বিতীয়। এই সঙ্গে অনেক পরিমাণ জলপাই, তৈল মিশাইয়া লইয়া সেবন করা উচিত। ঐ শাক-সব্জির সঙ্গে এক বা দুই টুকরা করা খোসাসহ গম পিষিয়া যে আটা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার কয়েকটী সেবন করা যাইতে পারে। উপবাসকালে ক্ষুধা হয় না কিন্তু উপবাসকারী সুস্থ শরীরের প্রফুল্লতা উপভোগ করিতে পারিবে। উপবাস করার পরে যদি পুনরায় নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য সেবনে শরীর যন্ত্রাদি আবর্জ্জনায় পূর্ণ করা হয়, তবে উপবাস করিয়া কোনও লাভ নাই।* (সঞ্জীবনী)

* আমাদের শাস্ত্রাদিতে যে একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতিতে উপবাসের ব্যবস্থা দেখা যায়, যদিও মুষ্টিমেয় শিক্ষাভিমানী নবীন যুবক সম্প্রদায় তাহা গ্রাহ্য করেন না তথাপি তাহার যে কত উপকারিতা তাহা বলা যায় না। ধর্ম্ম রক্ষা ত হয়ই সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়। আমরা আজকাল কি যে মোহে অভিভূত তাহা বলিতে পারি না। হয় ত আজ কাল অনেকে একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতিতে উপবাস করি কিন্তু সে লোক দেখান হয় মাত্র। প্রত্যহ ভাত খাইতাম একাদশী প্রভৃতিতে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া রুটী বা লুচি খাইয়া অথবা অন্যান্য এমন গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলাম যে, একাদশীর পরদিন পর্য্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইল না। শাস্ত্র ইহাকে উপবাস বলেন নাই শৃগাল কুকুরের মত কতকগুলি ভোজন করিলেই হইল না সঙ্গে সঙ্গে তাহা দ্বারা যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা ও ধর্ম্ম রক্ষা উভয় দিক বজায় থাকে তাহা করা কর্ত্তব্য। আমাদের কেমন একটা ভাব হইয়াছে প্রাচীন ঋষি বাক্য মানিব না কিন্তু যদি কোন সাহেব বা বৈদেশীক কোন লোক কিছু বলেন তাহা অবিচারে মানিব। তাই কোন রসিক কবি বলিয়াছিলেন "পূর্ব্বে আমরা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের কথা মানিতাম এখন শ্বেতদ্বৈপায়নের কথা আমাদের বেদবাক্য।" যাহাই হউক যদি এই ভাবে হাত ফেরৎ হইয়া আসিয়াও আমাদের পূর্ব্ব আচার ব্যবহার গুলি বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা হয় সেও সন্দেহ ভাল। (ভঃ সঃ)

চয়ন

বাবা প্রেমানন্দ ভারতী।—"ইংরাজি ১৯১৪ সালের ২৪এ জানুয়ারী শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার সময় বাবা প্রেমানন্দ ভারতী মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করেন। ইংরাজি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়, মৃত্যুকালে তাঁহার ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। জীবনের শেষ ২৫ বৎসর তিনি সন্ন্যাসী। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম পাশ্চাত্য দেশে যান, দুইবার ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইয়া কিছু দিন তিনি প্যারীসে ছিলেন। আমেরিকা হইতে তিনি Light of India নামে এক মাসিকপত্র বাহির করেন, এই কাগজের এক সংখ্যা টলষ্টয় রুশিয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। Srikrishna—The Lord of Love বাবা ভারতীর সুবিখ্যাত গ্রন্থ। Nineteenth century নামক বিখ্যাত বিলাতী কাগজে তিনি প্রবন্ধ লেখেন—What king George could do for India, এই প্রবন্ধটী অনেকেই পড়িয়াছিলেন এবং ইহা ভালরূপে সমালোচিত হইয়াছিল।

১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের The Indian Review কাগজে Rose R. Anthon বাবা ভারতী সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন, লেখক বাবা ভারতীর শিষ্য ঐ প্রবন্ধের কিয়দংশের সার মর্ম্ম এইরূপ—

"বাবাভারতীর পূর্ব্বে অনেক হিন্দু প্রচারক মার্কিন দেশে গিয়াছেন ও নিজের মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষার দ্বারা পশ্চিম দেশের উপকার হইয়াছে এবং তাঁহারা অনেকের প্রশংসা ও ভালবাসা পাইয়াছেন। অনেক প্রচারকই পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রচারকের অনুবর্ত্তী হইয়া গিয়াছেন, আবার অনেকে হিন্দুর কথা এমন ভাবে বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দেশ সেই কথা তাহাদের নিজেদেরই চিন্তাধারার শিরোভূষণ রূপে তাহা গ্রহণ করিয়াছে। বাবাভারতী কাহারও অনুবর্ত্তী হইয়া আসেন নাই তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় নিজের স্থান করিয়া লইতে হইয়াছিল। তিনি যে হিন্দুধর্ম্ম আনিয়াছিলেন তাহা খাঁটি জিনিস, প্রাচীন ঋষিদের নিকট হইতে যেমন জিনিস বাহির হইয়াছিল, তিনি ঠিক সেই জিনিষই আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কাহারও সহিত মিল করিবার জন্য তাঁহার খাঁটি জিনিসের এক চুলও পরিবর্ত্তন করেন নাই, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের

প্রকৃত শিক্ষা হইতে তিনি কণামাত্রও বিচলিত হন নাই। তিনি তাঁহার উপদেশ সমূহকে পাশ্চাত্য চিন্তা প্রণালীর উপযোগী করার চেষ্টা করেন নাই। বিদেশী লোকে বুঝিবে না বলিয়া কোন কথা গোপনও করেন নাই। লোকে প্রথম প্রথম তাঁহার শিশু সুলভ সরলতা দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া যাইত। লোকে ভাবিত এখন তিনি যাহা বলিতেছেন ক্রমশঃ তাহার কিছু কিছু বদলাইয়া এদেশের লোকের উপযোগী করিবেন। অন্যান্য প্রচারকেরা তাহাই করিয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহাকে সেইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি কিন্তু কাহারও কথা শুনিলেন না এবং নিজের কথা বা কথা বলার পদ্ধতি কিছুই বদলাইলেন না। তিনি বলিতেন—"আমি টাকা রোজগার করিতে আসি নাই' আমি সত্য প্রচারের জন্য আসিয়াছি। তোমরা পশ্চিম দেশের লোক তোমরা অনেক ভাল জিনিস জান, তোমাদের অনেক ভাল জিনিস আছে। তোমরা যাহা জান তোমাদের যাহা আছে তাহা তোমাদের শুনাইবার জন্য আমাদের আসিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাদের হিন্দুত্ব শিখাইবার জন্য আসিয়াছি, হিন্দুর ধর্ম্মকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করিতে আসি নাই।"

বাবা ভারতী সম্বন্ধে আমাদের দেশে ভালরূপ আলোচনা হয় নাই। ইহা দুঃখের কথা।" (বীরভূম)

সমাজ সংস্কারকের প্রতি।—আমরা মহাজনগণের নিকট শুনিয়া আসিতেছি, যাহা সমাজকে রক্ষা করে সমাজের যাহা অনুশাসন পদ্ধতি, তাহাই প্রকৃত শাস্ত্র। আজকাল কেউ আর একথা মানিয়া চলিতে বড় রাজি নয়। অন্য সমাজের কথা এখানে বলিব না কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কথাই বলি, আজ কাল যে এক এক নবীন সম্প্রদায় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের বাঁধন ছিঁড়ে প্রাচীন শাস্ত্রের মাথায় লাঠি মেরে নিজ নিজ ইচ্ছা মত পথে চলিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার চরম দেখাইয়া গুরু সাজিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদের প্রতিবিধানের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ কি ব্যবস্থা করিতেছেন। ভক্তিতে বহুবার আমরা সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণকে এবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াছি। কলিকাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর মুখপত্র গৌরাঙ্গ সেবকেও কয়েকটী প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে দেখিলাম, কিন্তু শুধু প্রশ্ন হইলেই কি সকল কর্ত্তব্য শেষ হইল? প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এবং উচ্ছৃঙ্খলকারিগণকে প্রকৃত শিক্ষাদানের কি ব্যবস্থা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ করিতেছেন, আমরা তাহাই জানিতে চাই। বড় বড় উপাধীধারী নামজাদা লেখক নিজ নিজ লেখার মধ্য দিয়া সম্প্রদায়কে লোকের

নিকট কি ভাবে চিত্রিত করিতেছেন, ভুঁইফোড় বক্তা বক্তৃতার বাণে সম্প্রদায়ের সকল বাঁধন ভাসাইয়া এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন, চতুর্দ্দিকেই এই ভাব, এখনও কি আচার্য্য প্রভুগণ কিঞ্চিৎ প্রণামি লইয়া পরম সুখে নিশ্চিন্ত মনে চুপ করিয়া থাকিবেন?

শ্রীচৈতন্য দেবের প্রাণ-সঙ্কট।—মিলুক আর না মিলুক, মাতালের ঝোক্ একটু মাংস খাওয়ায়। কিছু পাক্ না পাক্, চোরের ঝোক্ সিঁদ কাটায়। সেইরূপ জানুক না জানুক, কেহ শুনুক্ না শুনুক্ বর্ত্তমান যুগের লেখকদের ঝোক বৈষ্ণবের সম্মুখে চৈতন্যদেবের চরিত্রে কলম চালনায়। চৈতন্যদেব সাহিত্যিক নন, বৈজ্ঞানিক নন, ঐতিহাসিক নন, রাসায়নিক নন, এমন কি কনগ্রেসের মেম্বরও নন। নন-কো-অপারেটর নন। তিনি, নিঃসম্বল, নেংটী পরা, দীন-হীন বৈরাগীর সামগ্রী। তারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া, কাঙ্গালের অধম কাঙ্গাল হইয়া, "হা গৌর" বলিয়া ভ্রমণ করে, সকলের অধম দাস উপাধি গ্রহণ করে, তারা উচ্চ আসন, উত্তম বসন ভোজন ত্যাগ করে,—কেবল গৌর বলিয়া কাঁদিবার জন্য জীবন ধারণ করে। আর গৌরের পরিচয় জানিবার জন্য বিজ্ঞান, রসায়ন, সাহিত্য, ইতিহাস, ত্যাগ করিয়া কেবল গৌর-কৃপায় নির্ভর করে তাদের গৌরের সংবাদ, গৌরের তত্ত্ব তাহারাই জানে। তাদের মত না হইলে তাদের গৌর কেহ বুঝিতে পারে না। আমাদের লেখা গৌর আমাদের মতই হইয়া থাকেন, সে গৌর তারা মানেও না শুনেও না। আমরা কলিকাতার তেতলায় বৈদ্যুতিক পাখার তলে বাস করি, সাহেবের হোটেলে খাই, মটর চড়ি, নাম ফুটানোর জন্য সভা করি সার্টিফিকেট যোগাড় করি, আর বড় বড় বাস্তায় ঢুম্ বাজাই। আমরা সেই ভিকারীর ঠাকুরের কি ধার ধারি, তবু আমরা লেখক কি না, তাই জানি না জানি গৌরাঙ্গদেবের নামে দুকথা বলিয়া কণ্ডুয়নের উপশম করি। এ সকল ঝোকের কর্ম্ম—আর কলির ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের কলমের ঘায়ে প্রাণ-সঙ্কটে পড়িয়াছেন। (ভুলুয়া)

আনন্দ সংবাদ।—পানিহাটীর বৈষ্ণব পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় হস্তলিখিত প্রাচীন বৈষ্ণব পুঁথি সংগ্রহের জন্য রাঁচি, মানভূম, বাকুড়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি জেলার বহু গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিস্তর গ্রন্থ-রত্ন উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন অধিকাংশ পুঁথিই ২।৩ শত বৎসরের হস্তলিখিত। গ্রন্থগুলির মধ্যে অপ্রকাশিত গ্রন্থও অনেক আছে শীঘ্রই গ্রন্থগুলির বিস্তৃত বিবরণ ভক্তিতে বাহির হইবে।

কয়েক বৎসর হইল, কতিপয় উদ্যোগী ভক্তের যত্নে পানিহাটীতে "শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দির" নামে একটী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই গ্রন্থমন্দিরের উদ্দেশ্য বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় মুদ্রিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থ একস্থানে সংগ্রহ করিয়া ভক্তগণকে দর্শনানন্দ প্রদান করা। উক্ত গ্রন্থাগারের সংগ্রহ কার্য্য অতীব সুন্দর। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংক্রান্ত একটী সামান্য বিজ্ঞাপন পর্য্যন্তও সাদরে গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত হইতেছে। ঐ সকল সংগৃহীত দ্রব্য দ্বারাই বিগত কার্ত্তিক মাসের পানিহাটীর উৎসবে বৈষ্ণব-প্রদর্শনী হইয়াছিল। যাঁহারা উক্ত প্রদর্শনী দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে উহার প্রশংসা করিয়াছেন।

আমাদিগের অনুরোধ যাঁহাদের গৃহে প্রাচীন পুঁথি আছে, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থগুলি প্রদান করিয়া এই মহদনুষ্ঠানের সহায়তা করুন। কেবল গ্রন্থ নয়, বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় যাঁহার নিকট যাহা আছে, তিনিই তাহা অচিরে উক্ত গ্রন্থমন্দিরে প্রদান করুন। বলা বাহুল্য যাবতীয় দ্রব্যই অতিশয় যত্নে রক্ষিত হইবে। গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থ উপহার প্রদানে গ্রন্থাগারের পরিপুষ্টি সাধন করুন, ইহাই আমাদের সানিবন্ধ অনুরোধ।

দ্রব্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা— সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির,

পোঃ পানিহাটী,

(জেলা ২৪ পরগণা।

শ্রীবৈষ্ণব-স্মরণীয় তিথি।

ফাল্গুন মাস—শুক্লপক্ষ

১।	শ্রীহৃদয়ানন্দের তিরোভাব। (অম্বিকা—কালনা)	শুক্লা দ্বাদশী।
২।	শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের তিরোভাব (বুধুরীর)	ঐ
৩।	শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর তিরোভাব (রেমুণায় উৎসব)	ঐ
৪।	শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের আবির্ভাব (বুধুরীর)	ত্রয়োদশী
৫।	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব	পূর্ণিমা
৬।	শ্রীশ্রীঅদ্বৈত নন্দন শ্রীদোল গোবিন্দ প্রভুর আবির্ভাব	ঐ

৭। শ্রীকবিচন্দ্র ঠাকুরের উৎসব (৬৪ মহান্তের) (স্নান পাবনা) পূর্ণিমা

৮। শ্রীমাধবের (জগাই মাধাই) তিরোভাব (ঘোষহাট কাটোয়া) ঐ

৯। শ্রীশ্রীসীতাদেবীর শিষ্যা শ্রীনন্দিনী প্রিয়ার উৎসব (বগুড়া, গোপীবল্লভপুর) ঐ

১০। শ্রীঅভিরাম শিষ্য শ্রীকমলাকর ঠাকুরের উৎসব (গৌরাঙ্গপুর হুগলী) ঐ

১১। আউল চাঁদের উৎসব।—(ঘোষপাড়ার দোল) ঐ

কৃষ্ণপক্ষ

১২। শ্রীশ্রীঈশ্বর পুরীর জন্মস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আগমন মহোৎসব। (কুমার হট্ট বা হালিসহর) কৃষ্ণা তৃতীয়া (তৃতীয়ায় তিথি আরাধনা ও পর রবিবারে মহোৎসব)

১৩। শ্রীঠাকুর কানাইয়ের উৎসব। (বোধখানায়) পঞ্চমী—(পঞ্চমদোল)

১৪। শ্রীগদাধর নাড়া গোস্বামীর তিরোভাব (আমহাটী-বাজসাহী) ঐ

১৫। শ্রীভাগবত আচার্য্য ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন উৎসব। দ্বাদশী

১৬। শ্রীকাশীনাথ পণ্ডিতের তিরোভাব।—(চাতরা-হুগলী) ঐ

১৭। শ্রীকালীকৃষ্ণ দাস ঠাকুরের উৎসব (?)। (আকাইহাট) ঐ

১৮। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্থাপিত পনাতীর্থে স্নান উৎসব। (শ্রীহট্ট) ঐ

১৯। শ্রীকালা কৃষ্ণ দাস ঠাকুরের তিরোভাব (?) অমাবস্যা।

চৈত্রমাস। শুক্লপক্ষ।

২০। ছত্রভোগ বা মাধবপুরে শ্রীশ্রী৺অম্বুলিঙ্গ শিব মন্দিরে (বর্ত্তমান নাম বদরীনাথ) উৎসব ও নন্দা স্নান। মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর এই স্থানে শুভাগমন করেন, সেই উপলক্ষে মেলা হয়। প্রতিপদ।

২১। শ্রীশ্রীরামানুজ স্বামীর আবির্ভাব (দাক্ষিণাত্যে) পঞ্চমী

২২। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের আবির্ভাব ঐ

২৩। শ্রীবাবা আউল মনোহরদাসের উৎসব। (সোনামুখী বাঁকুড়া) নবমী

২৪। শ্রীকাশীনাথ বা কাশীশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব (চাতরা হুগলী) ঐ

২৫। শ্রীবল্লবী কান্ত গোস্বামীর তিরোভাব। (মালিপাড়া) ঐ

২৬। শ্রীকমলাকর পিপ্‌লায়ের তিরোভাব (মাহেশ) ত্রয়োদশী
২৭। শ্রীছকড়ি চট্টোর—(শ্রীবংশীবদনের পিতৃদেব) আবির্ভাব পূর্ণিমা
২৮। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ঐ
২৯। শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের আবির্ভাব। (কুলিয়া পাহাড়পুর) ঐ

কৃষ্ণপক্ষ।

৩০। শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর তিরোভাব (খানাকুল কৃষ্ণনগর) সপ্তমী
(মতান্তরে চৈত্র কৃষ্ণা তৃতীয়া)
৩১। শ্রীগোবিন্দঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব। (অগ্রদ্বীপেরউৎসব) দ্বাদশী।
৩২। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত নন্দন শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের আবির্ভাব ঐ
৩৩। শ্রীশ্রীগদাধর প্রভুর তিরোভাব অমাবস্যা।
৩৪। শ্রীশ্রীবীর চন্দ্র প্রভুর শিষ্য (বারাশত নাড়ার একজন) শ্রীগোকুলানন্দের উৎসব। (২৪ পরগণা দেবহাটার সমাধি মন্দিরে) চৈত্রমাস ভোর "হরেকৃষ্ণ" নাম যজ্ঞ হয়।

বৈশাখ মাস। শুক্লপক্ষ

৩৫। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীহরিদাস স্বামীর শ্রীশ্রী৺বাঁকে বিহারী জীউ দর্শন ভাগ্য।
তৃতীয়া (অক্ষয় তৃতীয়া)
৩৬। শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতার আবির্ভাব ঐ (মতান্তরে পঞ্চমী ও দশমী)
৩৭। শ্রীশঙ্করারণ্য পণ্ডিতের আবির্ভাব (বল্লভপুর হুগলী) দশমী
৩৮। শ্রীহিত হরিবংশ স্বামীর আবির্ভাব একাদশী
৩৯। শ্রীজগন্নাথ দাস ঠাকুরের আবির্ভাব (কাষ্টকাটা গ্রামে) চতুর্দ্দশী
(নৃসিংহ চতুর্দ্দশী)
৪০। শ্রীপরমেশ্বর দাস ঠাকুরের তিরোভাব (তড়া আঁটপুর) পূর্ণিমা
৪১। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত নন্দন শ্রীঅচ্যুত প্রভুর আবির্ভাব ঐ
৪২। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের আবির্ভাব ঐ
৪৩। শ্রীমর্য্যাদাস পণ্ডিতের আবির্ভাব (?) ঐ

কৃষ্ণপক্ষ।

৪৪। শ্রীরায় রামানন্দের তিরোভাব। কৃষ্ণাপঞ্চমী
৪৫। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব।—(?) দ্বাদশী

৪৬। শ্রীশ্রীগদাধর প্রভুর আবির্ভাব (ভরতপুরে উৎসব) অমাবস্যা।

জ্যৈষ্ঠমাস। শুক্লপক্ষ

৪৭। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব (গোপীবল্লভপুর) শুক্লা পঞ্চমী—
(মতান্তরে কৃষ্ণা প্রতিপদ জ্যৈষ্ঠ)

৪৮। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ দয়িতা শ্রীমতী গঙ্গামাতার আবির্ভাব (জীরাট ও কাটোয়ায় উৎসব) দশমী (দশহরা)

৪৯। শ্রীগঙ্গাধর গোস্বামীর আবির্ভাব দ্বাদশী

৫০। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট শ্রীশ্রীগদাধর প্রভুর দীক্ষা গ্রহণ। ঐ

৫১। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব। (পানিহাটি) ত্রয়োদশী

৫২। শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের তিরোভাব ঐ

৫৩। শ্রীমুকুন্দ দত্তের তিরোভাব চতুর্দ্দশী

৫৪। শ্রীশ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব (খোলা বেচা শ্রীধর) ঐ

কৃষ্ণপক্ষ।

৫৫। শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের তিরোভাব (নবগ্রাম-বর্দ্ধমান) প্রতিপদ।

৫৬। শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের তিরোভাব। অষ্টমী

৫৭। শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব দশমী।

৫৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর রামকেলী গ্রামে গমন মহোৎসব।
(জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি) *

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট।

* পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন। সংগৃহীত তালিকায় যদি ভ্রম থাকে, তবে সংশোধন করিয়া দিবেন এবং এই তালিকা বহির্ভূত প্রাচীন এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর ভক্তগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবের পুণ্য তিথি সম্বন্ধে যাঁহার যাহা জানা আছে, অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইলে কৃতার্থ হইব। আমরা ভক্তগণের পুণ্য তিথিগুলি সংগ্রহ করিতে বাসনা করিয়াছি—আশাকরি পাঠক বর্গ আমাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন। (ভঃ সঃ)

সংসর্গ

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত দয়া, সত্যবাক্য ও অহিংসাদি সামান্য ধর্ম, খাদ্যাখাদ্য ও বিবাহাদি বিশেষ ধর্ম্ম, মৎস্য মাংসাহার ও মাতুলভগিনী বিবাহাদি দেশধর্ম্ম জাতি-ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, যোষিদ্ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার এবং আহারপ্রভৃতির মূলে সংক্রামক দোষ এবং এই সংক্রামক দোষের মূলে "সংসর্গ" নিহিত আছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক, আর পরম্পরায়ই হউক, স্থূলভাবেই হউক, আর সূক্ষ্মভাবেই হউক, সংসর্গটা সকলেরই ভিতরে ওতঃপ্রোত ভাবে অনুবিদ্ধ আছে, এই সংসর্গের অনুরোধই হিন্দুশাস্ত্রে এত কড়াকড়ি নিয়ম। সৎসংসর্গে স্বর্গে যায়, অসৎসংসর্গে নরকে যায়, চণ্ডালের ছায়াস্পর্শ করিতে নাই, অশুচি ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে নাই, রজস্বলা স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই, অপরের বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে নাই, আহারের সময় পিতা মাতা স্ত্রী ব্যতীত অপরে স্পর্শ করিলে আর আহার করিতে নাই, আহারের সময়ে বস্ত্রে উচ্ছিষ্টান্ন লাগিলে ঐ বস্ত্র প্রক্ষালন করিতে হয়, ইত্যাদি যতকিছু খুটিনাটি, তাহার একমাত্র কারণ "সংসর্গ"। যে সংসর্গের জন্যই এত বাদ বিচার সে সংসর্গটা কি? সংসর্গটা কি, তাহা বুঝিতে পারিলেই ভবিষ্যতে বক্তব্য, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য, অল্লায়ু ও অস্বাস্থ্যের বিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এ জন্য সংসর্গ ও সংসর্গশক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

"সংসর্গ" অর্থ—সম্বন্ধ—সংস্রব। এই সংসর্গ দুই প্রকার—শারীরিক ও মানসিক। তাহাও আবার স্থানবিশেষে, বিষয়বিশেষে শত সহস্র প্রকার হয়, যথা—সাক্ষাৎ, পরম্পরা, দূরত্ব, নিকটত্ব, প্রতিকূলত্ব, অনুকূলত্ব, জন্য-জনকত্ব, আশ্রয়াশ্রয়িত্ব, কার্য্য-কারণত্ব, এবং সংযোগ ইত্যাদি। যেমন অগ্নি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া কাষ্ঠভস্ম করে, সূর্য্যরশ্মি সংযোগে পদ্ম বিকশিত হয়। শাস্ত্রকার গণ পাপী ও পাপের সংসর্গ মনে মনে করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। চণ্ডালের ছায়াও স্পর্শ করিবে না, পাষণ্ডের সহিত আলাপও করিবে না, ধর্ম্মধ্বজী বৈড়াল ব্রতীকে পানীয় জলমাত্রও দিবে না, দিলে পাপী হইবে।

মনু বলেন,—

"ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ"।

যে দ্বিজ বিড়াল তপস্বী অর্থাৎ যাহার ভিতরে লোভ, বাহিরে ধার্ম্মিকের সাজ, ছদ্মবেশ, পরবঞ্চক, পরহিংসক, পরগুণাসহিষ্ণু ও দাম্ভিক তাহাকে, এবং বকধার্ম্মিক অর্থাৎ যে বিনয় প্রকটনার্থ নীচের দিকেই তাকায়, চোক চাহে না, কিন্তু ভিতরে স্বার্থতৎপর শঠ, এরূপ মিথ্যাবিনীত এবং যে দ্বিজ বেদানভিজ্ঞ ইহাদিগকে পানার্থ জলও দিবে না, অন্যান্য দানের কথা আর কি বলিব?

কি ভয়ঙ্কর কথা? পিপাসার্ত্ত বৈড়ালব্রতীকে জল প্রদান করিলেও পাপ হইবে। ইহা কি নৃশংসের দুর্ব্বাক্য নহে। আপাততঃ তাহাই বোধ হয় বটে? কিন্তু মনুর এই উপদেশের ভিতরে যে নিগূঢ় তত্ত্বটি নিহিত আছে, তাহা নিম্নের উপাখ্যান দ্বারা প্রকটিত হইতেছে :—

এক সময়ে কোনও একটি পথিক প্রবল বাত্যায় ও ঝটিকায় উৎপীড়িত হইয়া লোকালয়ের অনুসন্ধান করিতেছিল, অনতিদূরে এক গৃহস্থের গৃহ দর্শন করিয়া প্রাণ রক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল বাহিরের ঘরে কেহই নাই। ঘরের বস্তু সামগ্রী দেখিয়া বুঝিল উহা চর্ম্মকারের গৃহ, অগত্যা তাহাতেই প্রবেশ করিল। সেই গৃহকোণের পিঞ্জরে একটী শুক পক্ষী ছিল। পক্ষীটি পথিককে দেখিবামাত্র আরক্তনয়নে বলিতে লাগিল "তুই কেরে শালা? ব্যাটা বের হ, শালা তুই চোর, বেরহ বেরহ," এইরূপ কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া পথিক তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অনতিদূরে অপর আর একটি পর্ণকুটীর দেখিতে পাইয়া যেই তাহার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল, তখনই পথিক শুনিতে পাইল "আহা মহাশয়! আসুন আসুন আপনার বড়ই ক্লেশ হইতেছে, এই কম্বলাসনে উপবেশন করুন, আহা আপনি কতই কষ্ট পাইয়াছেন।"

পথিক সেই বিনীত বচন শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, এবং দেখিল একটি শুক পক্ষী পথিককে এইরূপ মৃদু সম্ভাষণ করিতেছে।

পথিক তদ্দর্শনে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল "হে পক্ষিন্! আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, দেখিতেছি তোমাদের দুইটী পক্ষীর একই আকৃতি। কিন্তু সেই চর্ম্মকারের গৃহস্থিত পক্ষীই বা আমাকে কেন তিরস্কার করিল? আর তুমিই বা কেন মৃদু সম্ভাষণে আমাকে অমৃতাভিষিক্ত করিতেছ? ইহার কারণ কি?"

তখন শুকপক্ষী পথিকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া সংস্কৃত বাক্যে কহিল :—

"মাতাপ্যেকা পিতাপ্যেকো মম তস্য চ পক্ষিণঃ।
অহং মুনিভিরানীতঃ স চ নীতো গবাশনৈঃ॥
অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি,
গবাশনানাং স শৃণোতি বাক্যং।
ন তস্য দোষো ন চ মে গুণো বা,
সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥"

অর্থ—হে পথিক! আমার ও সেই চর্ম্মকার গৃহস্থিত পক্ষীর মাতা ও পিতা একই, কিন্তু দৈববশে আমাকে মুনিরা পালন করিয়াছেন, এবং তাহাকে চর্ম্মকারেরা পালন করিয়াছে। এখানে আমি সর্ব্বদা মুনিগণের সদালাপ শ্রবণ করিয়া থাকি। কিন্তু সে চর্ম্মকারের স্বভাবসিদ্ধ নীচজনোচিত অশ্লীল কথাই শুনিয়া থাকে। ইহাতে আপনি আমার গুণ মনে করিবেন না, এবং সেই পক্ষীরও দোষ মনে করিবেন না। যেহেতু দোষ গুণ যাহার যেমন সংসর্গ তদনুরূপই হইয়া থাকে।

কবি এই আখ্যায়িকা দ্বারা এই তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিলেন যে, সংসর্গের এমনই শক্তি মনুষ্যের ত কথাই নাই সংসর্গজনিত দোষ এবং গুণ পশু পক্ষীতে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্যও যে জাতীয় সংসর্গ ও যে জাতীয় ভাষা শিক্ষা করে, সে জাতীয় আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি, ভাব, তাহার অন্তরে আবির্ভূত হইবে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম।

অতএব পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, বৈড়ালব্রতীকে জলদান করিবে না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যাহারা বিড়ালতপস্বী, অর্থাৎ যাহার মনে এক মুখে আর, সেরূপ নৃশংস স্বার্থপর পাপাত্মাগণের কোনওরূপ সংসর্গ করিবে না। জলদান করিতে গেলেই বৈড়াল-ব্রতীর নিকটে যাইতে হইবে, সুতরাং তাহাদের নৈকট্য সম্বন্ধও অতি নিষিদ্ধ। কি জানি যদি তাহাদের নিকট গমন করিলে, সেই পাপাত্মার পাপবৃত্তি সংক্রামিত হইয়া জলদাতার শরীরেও প্রবিষ্ট হয়, এই আশঙ্কাতেই বৈড়াল ব্রতীকে জলদান নিষেধ করা হইয়াছে। অথবা জলদানতুল্য পুণ্য কর্ম্মের নিষেধ দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, দুষ্টাত্মার কোনও রূপ সাহায্য করা কর্ত্তব্য নহে, দুষ্টলোকের জীবনের সাহায্য করিলে কেবল তাহার পাপবৃত্তির পোষণই করা হইবে, এবং তাহা জগতের অনিষ্ট সাধনেরই কারণ হইবে। এই কারণেই মনু মানবকে দুষ্টসংসর্গ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সাবধান করিয়া গিয়াছেন, নতুবা কিঞ্চিৎ জলদান করিলেই যে সর্ব্বনাশ হইবে, পূর্ব্ব উদ্ধৃত বচনের এরূপ তাৎপর্য্য নহে।

অনেক শাস্ত্রে ও অনেক দেশে সাধু সংসর্গের প্রশংসা আছে, এবং সৎসংসর্গ করিবার বিধিও যথেষ্ট আছে, অনেকে তাহা করিয়াও থাকেন। যখনই আপনি কোনও সাধু সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইবেন, তখন আপনার মনে অতর্কিত ভাবে বিনয়, আর্জব, সত্যবাদিতা ও দয়া প্রভৃতি সদ্গুণ অবশ্যই উপস্থিত হইবে, এবং সেই হৃদয়স্থিত বিনয়াদির চিহ্ন নম্রতাগুলি প্রভৃতি আপনা আপনি জন্মিবে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কিন্তু তথা হইতে আপনি যেমন স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, অমনি আপনি সেই বিনয়, দয়া ও শিষ্টতা প্রভৃতি সদ্গুণ সকল হারাইতে লাগিলেন। সাধুর সাক্ষাতে যে বিনয়াদির তরঙ্গ উঠিয়াছিল, পথে আসিতে আসিতে সেই তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে ছোট হইতে লাগিল; অবশেষে এক কালে মিলিয়া গেল।

কেন এমন হয়? সংসর্গশক্তি কিরূপে ক্রিয়া করে? এ প্রবন্ধে তাহা ভাঙ্গিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমুদয়ই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে উৎপন্ন। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম—সুখ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রকাশাদি সদ্গুণ। রজো গুণের ধর্ম—দুঃখ, লোভ এবং কার্য্যোদ্যম প্রভৃতি। তমোগুণের অজ্ঞান, এবং আলস্য, নিদ্রা ও জড়তা প্রভৃতি। আবার সুখ দুঃখ এবং অজ্ঞান—প্রভৃতিও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকরূপে তিন তিন প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল বিষয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। এই স্বত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ইহাই স্বভাব যে, একে অপরকে দমন করিয়া নিজে বড় হয়।

সাংখ্যকারিকায় আছে—

পরস্পরাভিভবাশ্রয়জনন মিথুন বৃত্তশ্চ গুণাঃ।

অর্থ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ইহাই স্বভাব যে তাহারা পরস্পর একে অন্যকে অভিনব পরাভব করে, অথচ একে অপরের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং পরস্পর পরস্পরের সহচর, অর্থাৎ এককে ছাড়িয়া অন্য পৃথক থাকে না।

যখন যাহার সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া রজঃ ও তমোকে অভিভূত করে, তখন সে ব্যক্তি সুখী, শান্ত, জ্ঞানী ও সাধুরূপে পরিণত হয়। এবং যখন যাঁহার রজোগুণে সত্ত্বগুণকে অভিভূত করে, তখন সে ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন তাঁহার শরীরে দয়া, বিনয় ও হিতাহিত বোধ কিছুই থাকে না, মস্তিষ্ক উষ্ণ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত, নেত্র রক্তবর্ণ হয়, গুরুজনের অপমান করিতে বাধা ও হত্যা করাও অসম্ভব হয় না। আর যখন তমোগুণ উচ্ছলিত হইয়া সত্ত্ব ও রজো-

গুণকে দমন করিয়া ফেলে, তখন সে ব্যক্তি অজ্ঞান, অলস বা নিদ্রাভিভূত এমন কি জড় প্রস্তরখণ্ডের মত হইয়া পড়ে। তখন তাহার এক অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও সে টের পায় না।

কেনই বা এক গুণ বলবান হয়? কেনই বা অপর গুণ কমিয়া যায়? তাহার কারণ, নানাবিধ বস্তুর সংসর্গ। যেমন কোনও পথিক প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া দুঃখ অনুভব করিতে ছিল, এমন সময়ে সে শীতল জলে অবগাহন করিল, শর্করা মিশ্রিত সুশীতল জল পান করিল, তরু তলে শীতল সমীরণ সেবন করিল, তখনই সেই জল পান ও সমীরণ স্পর্শাদি সংসর্গে শরীরের সত্ত্ব ভাব উদিত হইল, এবং রজঃ ও তমো অপনীত হইল, সুতরাং পথিকও নিজেকে সুখী বোধ করিল।

এইরূপ মনে কর, কোনও একটি প্রকৃতিস্থ লোক মদ খাইল, আবার খাইল, কিছুক্ষণ পরে নেশা হইল, জলে স্থল, স্থলে জল দেখিতে পাইল। ভাইকে শ্যালা, শ্যালাকে বাবা বলিল, হাসিল, কাঁদিল বমি করিল, তাহাই আবার খাইল তাকিয়া ছিঁড়িল, তুলা উড়াইল, আরও কত কি করিল। তখন সুরাদেবীর পানরূপ সংসর্গে তাহার সত্ত্বগুণ অপহৃত হইয়াছিল। এবং রজঃ ও তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই প্রকৃতি হারাইয়া নানা রূপে অসুখী বা বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

আবার সেইরূপ কোনও দুষ্টব্রণযুক্ত রোগীকে ক্লোরোফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া যদি তাহার ব্রণ কাটিয়া, ছিঁড়িয়া বা পোড়াইয়া দেওয়া যায়, তখন সেই রোগীর ক্লোরোফর্ম আঘ্রাণ সংসর্গে সত্ত্ব ও রজোগুণ প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায় জ্ঞান মাত্রও থাকে না বলিয়া সে দুঃখানুভব করিতে পারে না। কারণ, তখন সে ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

রৌদ্র প্রতপ্ত মদ্যপায়ী ও ব্রণ রোগীর অবস্থা যেমন স্পষ্টরূপে দেখা যায়, সৎ সংসর্গ বা অসৎ সংসর্গের কার্য্য তেমন দেখা যায় না কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ পরিস্ফুট হইয়া কালে প্রত্যক্ষ পথে উপস্থিত হয়।

যাহারা রজোগুণ প্রধান, যাহার প্রকৃতি দুর্জ্জন, লম্পট হিংস্রক, তাহাদিগের মধ্যে যদি একজন সাধু চুপ করিয়া বসিয়াও থাকে, তবুও সেই সকল অসতের শরীর হইতে দৌর্জ্জন্য, লাম্পট্য ও হিংসাবৃত্তি প্রভৃতি দোষরশ্মি, উষ্মার সহিত ক্রমশঃ প্রসৃত হইয়া সেই সাধুর শরীরে একটু একটু করিয়া প্রবিষ্ট হইতে থাকে, তখন কিছু দিন পরে, তাহার সাধুবৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়া যাইবে, এবং চিত্তে কুভাব কুচিন্তা উদিত হইবে, কেননা অসতের সহিত এক স্থানে উপবেশন রূপ সংসর্গের স্রোতে অসদ্‌বৃত্তি সকল সাধুর শরীরে সংক্রামিত হইয়া

যায়। কিছুদিন এরূপ সংসর্গ গাঢ়তর হইলে, তখন সাধু আর সাধু থাকিবে না, অসাধু হইয়া পড়িবে। এই জন্যই অসতের সংসর্গ নিষিদ্ধ। বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন—

প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে পতিত সংসর্গ প্রকরণে—

"এক শয্যাসনং পংক্তির্ভাণ্ডপকান্নমিশ্রণং।
যাজনাধ্যাপনং যোনিস্তথা চ সহভোজনং॥
নবধা সঙ্করঃ প্রোক্তো ন কর্ত্তব্যোঽধমৈঃ সহ।
সমীপে চাপ্যবস্থানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাঃ॥"

অর্থ—এক আসনে উপবেশন, এক পংক্তিতে ভোজন, একপাত্র মিশ্রণ ও পক্কান্ন মিশ্রণ এই পাঁচটি লঘু সংসর্গ, এবং যাজন, অধ্যাপন, পতিত স্ত্রী অথবা পতিতপুরুষসম্ভোগ, পতিত কন্যাবিবাহ বা পতিত বরের সহিত কন্যার বিবাহ, নিজের বা পরের অন্ন এক পাত্রে একত্র ভোজন এবং যাজনাদি, এই চারি প্রকার গুরুতর সংসর্গ ও উক্ত নববিধ সংসর্গ পতিতের সহিত করিবে না। কারণ, পাপীর সমীপে থাকিলেও পাপ সংক্রামিত হয়। মহর্ষি পরাশর বলেন :—

"আসনাচ্ছয়নাদ্ যানাৎ ভাষণাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥"

অর্থ—যেমন তৈল বিন্দু জলে পড়িলেই ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ একের শরীর হইতে পাপবৃত্তি সকল, একসঙ্গে উপবেশন, পান, গমন, এবং পরস্পর আলাপ ও একত্র ভোজন রূপ সংসর্গে ছাড়াইয়া অপরের শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। মহর্ষি দেবল বলেন :—

"সংলাপস্পর্শনিঃশ্বাস সহশয্যাসনাশনাৎ।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং॥"

অর্থ—পরস্পর আলাপ, স্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, একত্র আহার, যাজন, অধ্যাপন ও যোনি সম্বন্ধে, এক শরীর হইতে অপর শরীরে পাপ সংক্রামিত হয়।

এই জন্যই প্রাচীনেরা অন্ত্যজাদি স্পর্শ করিতেন না, এবং অপরের নিঃশ্বাস বা হাঁচি গায় ঠেকিলে দোষ মনে করিতেন। ওলাউঠা প্রভৃতি কতকগুলি

রোগীর প্রশ্বাসের সহিত পাকাশয় হইতে রোগের সূক্ষ্ম বীজ সমস্ত বাহির হইয়া অপরের শরীরের উষ্মা বা নিশ্বাসের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া রোগ জন্মায় বলিয়া ঐগুলি সংক্রামক নামে প্রসিদ্ধ।

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—কুষ্ঠ, সান্নিপাতজ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ এবং ঔপসর্গিক অর্থাৎ উৎপাতাদি জনক মড়ক—যেমন বসন্ত, ওলাউঠা ও বিউবোনিক প্রভৃতি রোগ সংক্রামক। যথা নিদান স্থানে ৫ম অধ্যায়ে,—

"প্রসঙ্গাদ্‌গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহ শয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥"

কিন্তু রোগাদি স্থূল বিষয়গুলি অনুভব করা যায়। আর সংক্রামক কুবৃত্তি কুভাব সকল স্ফুটবেদ্য নহে, তথাপি প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝা যায়। মহর্ষি ছাগলেয় বলেন :—

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং॥"

অর্থ—আলাপ, দেহস্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র ভোজন, শয়ন ও অধ্যয়ন, এই সকল সংসর্গে পাপ বৃত্তি সকল এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রান্ত হয়।

শরীর তত্ত্ববিৎ হারীত ঋষি বলেন—

"হন্ত্যারশুদ্ধঃ শুদ্ধন্তু শুদ্ধোঽশুদ্ধন্তু শোধয়েৎ।
অশুদ্ধশ্চ তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুদ্ধ্যতি॥"

অর্থ—পাপী পুণ্যাত্মাকে অভিভূত করিতে পারে, অর্থাৎ পাপীর পাপ বৃত্তি গুলি সংক্রান্ত হওয়ায় তিনি আর পুণ্যাত্মা পুরুষ থাকেন না, পাপী হইয়া উঠেন, যে হেতু "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।"

কিন্তু যিনি অত্যন্ত পুণ্যাত্মা অর্থাৎ যাহার সত্ত্বগুণ এত উদ্রিক্ত যে, শত শত পাপীর দেহ হইতে বিচ্ছুরিত পাপরাশিও তাহার সত্ত্বাগ্নিতে তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই পুণ্যাত্মা শত শত পাপীকে শোধন করিতে পারেন।

অর্থাৎ তাঁহার শরীর হইতে সদ্‌বৃত্তি গুলি প্রসৃত হইয়া পাপীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তজ্জন্য পাপীর পাপবৃত্তিসমূহ তিরোভূত হইয়া যায় কিন্তু এক দিন কি দুই দিনে সংসর্গের শক্তি বিকাশ পায় না। দীর্ঘকালেই তাহা জাগিয়া উঠে।

অতএব বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষিরা বলেন :—

"সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্‌ ।"

অর্থ—পতিত ব্যক্তির সহিত একবৎসর কাল একত্র ভোজনাদি সংসর্গ করিলে শুদ্ধ ব্যক্তিও পতিত হয়। তন্মধ্যে লঘু গুরু সংসর্গের প্রভেদ অনুসারে নানা প্রকার তারতম্যের উপদেশ আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত আছে :—

"রাজ্ঞিচামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপঞ্চ ভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥"

অর্থ—মন্ত্রিকৃত পাপ রাজাতে, পত্নীকৃত পাপ স্বামীতে এবং শিষ্যকৃত পাপ গুরুতে সংক্রান্ত হয়।

অধিক কি ? যদি ভোজন সময়ে এক পঙ্‌ক্তিতে একজন পাপী উপবেশন করে তবে তাহার মানসিক ও শারীরিক পাপবৃত্তিগুলি অপরের সম্মুখস্থ অন্নে সংক্রান্ত হয়। আবার সেই অন্ন যে ভোজন করে তাহাতেও ঐ পাপ বৃত্তি প্রবিষ্ট হয়। অতএব সমস্ত পঙ্‌ক্তিকে দূষিত করে বলিয়া সেই পাপী ব্রাহ্মণকে পঙ্‌ক্তি দূষক কহে। সেই পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণকে মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫২—১৬৭ শ্লোকে ৯৩ প্রকারের বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, দেবল, মাংসবিক্রয়ী ইত্যাদি ব্রাহ্মণ অতি নিকৃষ্ট, এমন কি উহারা এক পঙ্‌ক্তিতেও বসিবার উপযুক্ত নহে, শাস্ত্রকারেরা এইরূপ বলিয়াছেন।

কিন্তু গৃহস্থসমাজে ওরূপ ভাবে পঙ্‌ক্তিভোজন না করা অপরিহার্য্য, অতএব উক্ত প্রকারে পাপ সংক্রমণের ভয়েই ভোজনের সময় নিজের নিজের চারিধারে, ছাই, খড়, অথবা জলদ্বারা বেষ্টন করিয়া পঙ্‌ক্তি ভেদ করিয়া আহার করিবে। তাহাতে তত দোষ হইবে না।

ক্রমশঃ

(মেদিনীপুর হিতৈষী)

২৪শ বর্ষ
১১শ ও ১২শ সংখ্যা

ভক্তি

আষাঢ়, ও শ্রাবণ
১৩৩৩

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

প্রার্থনা

"ভকতের সঙ্গ গুণে ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়নে
হ'য়েছিল এ হৃদয় আনন্দ অমিয়াধার।
সংসার তপন তাপে রোগ শোক অনুতাপে
বিশুষ্ক মলিন এবে নিরবধি দুঃখাগার॥"

দয়ানিধি! ভাবুক কবি বড়ই দুঃখে এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আজ যথার্থ যদি এ হতভাগার প্রাণের কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে এই কথা কয়টি বলিলেই ঠিক ঠিক বলা হয়। কিন্তু ভরসা করিয়া তাহাও বলিতে পারিতেছি না। কেননা সংসারে প্রাণ মন এমন ভাবে ঢালিয়া দিয়াছি যে, কোনমতেই এখন সংসারের কোন প্রকার দোষ দিতে প্রাণ চায় না। প্রথম সংসার পত্তনের সময় খুব বড়াই করিয়া বলিয়াছিলাম "ভগবানের সংসার, তাঁহাকে স্মরণ রাখিয়াই করিব।" কিন্তু দিন দিন তোমার সকল সম্পর্ক তুলিয়া দিয়া নিজেই কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়াছি এবং প্রত্যেক কার্য্যেই নিজের কর্ত্তৃত্ব খাটাইতে গিয়া মূঢ়তার চূড়ান্ত করিতেছি। এক একবার যে এ সকল কথা স্মরণ না হয় তাহাও নয়, কিন্তু সে খুব অল্প সময় স্থায়ী হয় এবং সে স্মরণে বিশেষ কোন কাজ হয় বলিয়া মনে হয় না। কেননা দেখিতে পাই যে, যে মুহূর্ত্তে এইটী স্মরণ হয় তাহার পর মুহূর্ত্তেই দ্বিগুণ আসক্তি আসিয়া আমাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। তখন কিজানি কেন আমি একেবারে সংসারের হইয়া যাই তোমার কথা স্মৃতিপথেও আসে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এখন বেশ বুঝিয়াছি যে, আমার নিজ কর্ত্তৃত্বে কিছুই

হইবে না, এখন তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর করাই শ্রেয়ঃ বুঝিয়া প্রাণের কথা কয়টি তোমাকে খুলিয়া বলিলাম, এখন যাহাতে আমার মঙ্গল হয়-যাহাতে আমি-শান্তি-পাই তাহা তুমিই কর।

যে লোক জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার অমৃতোপম ভাবের আভাষ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে, তাহার পক্ষে সেই ভাবধনে বঞ্চিত হইয়া থাকা যে কত কষ্টকর সে কথা আর তোমাকে বলিয়া কি জানাইব। যদি জীবনের প্রথম হইতে তোমার কোন তত্ত্ব না লইতাম, তোমার ভাবে ভাবিত ভক্তের সঙ্গ না পাইতাম, তোমার প্রাণ মন জুড়ান লীলা কথা না শুনিতাম, তাহা হইলে একরকম থাকা যাইত; কিন্তু আমার যে এখন বিষম দশা উপস্থিত। প্রথম জীবনে বেশ তোমার ভক্তের সঙ্গ মিলাইয়া দিলে, তোমার প্রসঙ্গে, তোমার নামগুণ গানে বেশ আনন্দে দিন যাইতে লাগিল, হঠাৎ নাজানি কোন্ জন্মজন্মান্তরীয় দুর্দৈব বশে ঘাড়ে সংসার চাপিয়া ক্রমে ক্রমে আমার সকল দিকই বন্ধ হইয়া গেল, এখন প্রাণ ভরিয়া যে কোথাও যাইয়া তোমার ভক্ত সঙ্গে আনন্দ করিব তাহাও পারি না। স্ত্রী পুত্রাদির ভাবনা আসিয়া আমার সকল চিন্তা, সকল সাধ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। দয়াময়! এমন করিয়া আর কতদিন রাখিবে? সরল প্রাণে তোমাকে ডাকিলে যে সুখ পাওয়া যায় এ বিশ্বাস যখন একবার দিয়াছ, তখন আর সংসারের বিক্ষেপ দিয়া সে সুখে বঞ্চিত করিও না। তুমি কৃপাময়, তোমার কৃপায় সকলই হইতে পারে, তুমি কৃপা করিয়া সমস্ত বিক্ষেপ, সমস্ত অভাব, সমস্ত বিপদ দূর করিয়া দাও এবং আমাকে তোমার ভাবে মাতাইয়া রাখ। আমি সদানন্দ মনে তোমার ভাবে মজিয়া তোমার নামের জয় দিয়া জীবন, ধন্য করি। রাজরাজেশ্বর! বাঞ্ছাকল্পতরু! দীনহীন কাঙ্গালের এই ক্ষুদ্র প্রার্থনাটী অপূর্ণ রাখিয়া নামে কলঙ্ক করিও না, ইহাই আমার তোমার নিকট এবার প্রার্থনা।

দীন শ্রী—

রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু

(শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত ।)

নাচে মোর গৌর হরি জগন্নাথ আগে ।
অশ্রুধারা ব'য়ে যায় যেন নদী বেগে ॥
ভাবেতে বিভোর গোরা নাহি বাহ্য জানরে ।
(বলে, আইলাম দ্বারকাপুরী) (কোথায় মোর রাসবিহারী]
(দেখাও আমায় সেইরূপ,) (ওহে নাগর রসিক ভূপ)
(নীপ তরুমূলে যেমন,) (দাঁড়াইতে বংশীবদন)
ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনিরে ॥
জগন্নাথ হরষিত শুনি সঙ্কীর্ত্তন রে ।
কীর্ত্তন শুনিতে রথ করিল স্থগিত রে ॥
(শ্যাম গৌরের ঠাবাঠারি,) (এ সব লীলা বুঝ্‌তে নারি)
আছাড় খাইয়া গোরা ভূমে গড়ি যায় রে ।
সুবর্ণ পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায় রে ॥
(রাধার ভাব পড়ে মনে,) (কুরুক্ষেত্র মিলনে)
(আর ত ধৈর্য্য ধরতে নারে,) (হেরি শ্যাম নাগরে)
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ সেই গান গায়বে ।
(মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ,) (সে জানে মনের তরঙ্গ)
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর রে ॥
কভু এক মূর্ত্তি কভু বহু মূর্ত্তি হ'য়ে রে ।
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গোরা রায় রে ॥
নীলাচলবাসী ধন্য নয়ন সার্থক রে ।
'গৌর শ্যাম' দরশন ভাগ্যেতে যাহার রে ॥
(এমন ভাগ্য কবে হবে) (বলে দাও নীলাচল বাসী)
(তোমরা মোরে দয়া কর) (তোমরা দেখালে দেখাতে পার)
মোর এই নিবেদন যেন ক'রো না বঞ্চন)

ভক্তাধীন ভগবান

(শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ এম আর এ এস লিখিত)

ভক্ত ভক্তিভাবে ভগবানকে ডাকিতে পারিলে, ভগবান তাহার বশে আসেন। ভগবানকে যে মনে প্রাণে ডাকে তিনি তাহারই অধীন হইয়া পড়েন। এরূপ অনেক উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়, আমরা পাঠকবর্গের আনন্দবর্দ্ধনার্থ তাহার মধ্যে একটীর কথাই এখানে লিখিতেছি।

কোন এক গ্রামে একটী বালক বিদ্যালয়ে যাইবে, সঙ্গীরা চলিয়া গিয়াছে। তাহার মা তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, "সম্মুখে যে একটি জঙ্গল দেখিতেছ তাহার ধারে গিয়া মধুসূদনকে ডাক সে তোমায় বিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। 'মধুদাদা' বলিয়া ডাকিও সে তোমার কথায় সারা দিয়া তোমার সঙ্গী হইবে।"

বালক মাতার কথামত যথাস্থানে গিয়া মধুদাদাকে ডাকিল। তখন একটী কিশোর বয়স্ক শ্যামবর্ণ বালক তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভাই, কেন ডাকিতেছ?" সে কহিল, "তুমিই কি আমার মধুদাদা? মা আমায় বলিয়া দিয়াছেন তোমাকে ডাকিলে তুমি আসিয়া আমাকে বিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিবে। তোমাকে ত আর কখনও দেখি নাই দাদা।" মধুদাদা বলিল, "এসো ভাই, তোমাকে বিদ্যালয়ে দিয়া আসি।" এইরূপে বালক মধুদাদার সাহায্যে প্রত্যহই বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিল। ফিরিবার সময় গ্রাম্য বালকদিগের সঙ্গে আসিয়া থাকে। অনেক দিন এই ভাবে গেল, এইবার প্রভু ধরা দিবার জন্য এক নূতন খেলা খেলিলেন।

একদিন বালক মাকে কহিল, "মা মধুদাদা তোমার কে হয়। সে আমাদের বাড়ীতে আসে না কেন? সে জঙ্গলেই থাকে, আমি ডাকিলে জঙ্গল হইতে বাহিরে আসে আবার জঙ্গলেই লুকাইয়া পড়ে।" মা বলিলেন, "মধুসূদন লোক দেখিয়া তার কায করেন, তুমি যদি প্রাণ ভরিয়া তাঁকে ডাকিতে পার তবে সে তোমার কায করিবে, অন্যথা সে কিছুই করে না।" একদিন পাঠশালার বালকেরা জিজ্ঞাসা করিল "তোর মধুদাদাকে দেখাইতে পারিস্?" সে কহিল "পারি বৈকি।" সেই কথামত বালকেরা স্কুল ছুটীর পর তাহার সঙ্গ লইয়া মধুদাদাকে দেখিতে আসিল। বালক মধুদাদাকে জঙ্গলের পাশে দাঁড়াইয়া

কত চীৎকার করিয়া ডাকিল কিন্তু মধুদাদা এ দিন দেখা ত দিলই না একবার কোন সাড়াও দিল না। পাঠশালার বালকেরা নানা প্রকার বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। বালক সরলভাবে কহিল "আমাকে স্কুলে পৌছাইয়া দেয় কিন্তু স্কুল হইতে ফেরতের বেলায় তাকে পাই না। বোধ করি মধুদাদা কোন কাজে গিয়াছে এখানে নাই তাই কোন সাড়া পাইলাম না।" পরদিন অন্য বালকেরা তাহার সঙ্গে মিশিয়া স্কুলে যাইবার সময় মধুদাদাকে ডাকিল কিন্তু মধুদাদা আসিল না। তারপর বালকেরা হাসিয়া কহিল, "তোর সবই ফাঁকি রে, সবই ফাঁকি, তুই নিত্যই স্কুলে একাকী যাস্ আর মধুদাদার বড়াই করিস্।"

বালক হতভম্ব হইল, পরে স্কুলে গিয়া ফিরিবার সময় একাকী ফিরিল এবং যথাস্থানে আসিয়া মধুদাদাকে ডাকিল মধুদাদা আসিয়া কহিল "ভাই, তুমি একাকী থাকিলে আমি আসিতে পারি। এত লোকের সাম্‌নে আমি আসি না।" বালক কাঁদিয়া কহিল "দাদা ওরা যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তাই তোমাকে দেখাইতে চাহিয়া ছিলাম।" মধুদাদা কহিলেন "আজ নয় আর একদিন দেখা হ'বে, যারা আমাকে প্রাণ ভরিয়া না ডাকে তাদের আমি দেখা দিই না। তোমাকে দেখা দিই কিন্তু সকলের সাম্‌নে আসিব না।" বালক কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল আমাকে ত তারা মিথ্যাবাদী বলিবে। মিথ্যাবাদীর মরণ ভাল।" মধুদাদা তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন "যাও, তাহাদিগকে গিয়া বল তারা যদি প্রাণের সহিত আমাকে ডাকে তবে তাদের দেখা দিব।

বালক নাচিতে নাচিতে বাড়ীতে মায়ের কাছে গিয়া এই সংবাদ দিল। মা কহিলেন, "হ্যারে, তবে তোর দাদাকে আমাকেও দেখাইবি, একদিন তার সঙ্গে বুঝা পাড়া করিয়া আসিস।" তার পর একদিন মা কহিলেন, "হ্যারে তোর দাদাকে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিস্। তোর সহপাঠীরাও আমার এখানেই তাকে দেখিবে।" মায়ের কথা গিয়া মধুদাদাকে কহিল তিনিও আসিতে রাজী হইলেন। বালকের আর আনন্দ ধরে না সেই সংবাদ মাকে বলিল মা সেদিন নানা খাদ্যদ্রব্য দিয়া ভোগ সাজাইয়া রাখিলেন। মধুসূদন আসিবেন কিনা!

যথাসময়ে মধুদাদা আসিলেন, কিন্তু সেই রাখাল বেশে। বালকেরা সেরূপ দেখিয়া কহিল "এঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ এই তোর মধুদাদা, এ যে রাখাল, এমন লোক ত মাঠে কত দেখিতে পাই।" তারপর মধুসূদনের নিকট বালক বায়না ধরিল, "মা

বলিয়াছেন তোমার এরূপ নয়, তোমার বংশীধারী ভগবৎরূপ, সে রূপে একবার ভাই দেখা দেও।" তখন মধুসূদন সেই ভগবানের রূপ লইয়া দেখা দিলেন। মা কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং ভক্তি গদ গদ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা আজ তোরই পুণ্যফলে আমি ভগবানের দর্শন পাইলাম। চল এখন ভগবানকে খাওয়াই গিয়ে।" ভগবানও তা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি বালকের সহিত একত্র ভোজনে বসিলেন। তাহার মা তাহাদের পার্শ্বে রহিলেন। অন্যান্য বালকেরাও রূপ দেখিয়া ধন্য হইল, তাহারাও সেই ভোজন পাত্রের চারিদিকে বসিল। ভগবান এক গ্রাস নিজের মুখে দেন, এক গ্রাস বালকের মুখে দেন। আর মাঝে মাঝে বালকের মাতার মুখেও দেন। আর বালকগণের মুখেও তুলিয়া মধ্যে মধ্যে দিতে লাগিলেন। ভগবান রাখাল বেশে বালক ভালবাসেন, তাই তিনি পরিতৃপ্ত ভাবে ভোজন করিয়া ও করাইয়া আবার রাখাল বেশেই চলিয়া গেলেন। বালকের মাতা অল্প পরিমাণ ভোজ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন না কেমন করিয়া সামান্য ভোজ্য এত লোকের আহারে তৃপ্তি দান করিতে পারিল। ভগবানের বংশীধারী, বাঁকা-বিহারী রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইল ও নিজ নিজ জীবনকে ধন্য মনে করিল।

ইহার পর হইতেই ভগবান মাকে দর্শন দিতেন, বালক তাহারই অনুচর হইয়া নিত্য পাঠশালায় যাইত। সে গৃহ ভগবানের সশরীরে আগমনে পবিত্র হইল, সকলে সেই গৃহকে মহাপীঠস্থান মনে করিয়া লইল। আমরা অবিশ্বাসী, আমরা হয়ত এ কথা বিশ্বাসই করিব না যে, ভগবান সশরীরে দর্শন দিলেন কিন্তু অসম্ভব সম্ভব যাঁহাদ্বারা হয়, পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব এককালে যাহাতে দেখিতে পাই তাহাকেই না ভগবান বলিয়া থাকি? ভগবানের অনন্ত মহিমা, আমরা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তাহার কতটুকু ধারণা করিব? তিনি কৃপা করিয়া না বুঝাইলে তাঁহার মহিমা কে বুঝিতে পারে?

শ্রীগুরু-বন্দনা

গুরু গুরু গুরু সকলেই কয় গুরু যে কি ধন কে জানে।
মধু হ'তে মধু ও দুটী আখর তুলনা নাহিক ভুবনে ॥
ভজন সাধন শ্রীগুরু চরণ সাধনের সার ত্রিলোকে।
যাঁহার মূরতি বিশ্ব চরাচর বদনে অমিয় ঝলকে ॥
শিব ব্রহ্মা আদি কালী কৃষ্ণ রাম গুরুর বিকাশ জানিয়া।
কেন ওরে মন কিসের লাগিয়া র'য়েছ সে স্বাদ ভুলিয়া ॥
শ্রীগুরু চরণ যে লয় শরণ কি ভয় তাহার জীবনে।
কল্পতরু গুরু দয়ার আধার নাহিক এমন ভুবনে ॥
গুরু মহামন্ত্র যে জন জপিয়ে সরস ক'রেছে রসনা।
সুরাসুর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর তাহারে করয়ে ভজনা ॥
মোক্ষাদি সম্পদ জানিয়ে কৈতব প্রেমানন্দ সুখে মজিয়া।
নিত্যানন্দ নীরে ভাসে দিবানিশি গুরু পদে প্রাণ সপিয়া ॥
অধম 'নৃত্যের' জীবন ব্যর্থ না করি গুরুর সাধনা।
নিকটে যে কাল কি হবে এখন দিবানিশি তায় ভাবনা
কাতর কণ্ঠে ডাক ওরে মন আর কেহ নাই সেদিনে।
সব পরিহরি জপ' 'গুরু গুরু তরে' যাবি নাম সাধনে ॥

দীন—শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী।

সংসর্গ

(২)

এ সম্বন্ধে আহ্নিক আচার তত্ত্বে ব্যাস দেব বলেন,—

"অপোক্তপংক্তো নাশ্নীয়াৎ সংবৃতঃ স্বজনৈরপি।
কোহি জানাতি কিং কস্য প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ।
ভস্ম স্তম্ব জল দ্বার-মার্গৈঃ পঙক্তিঞ্চ ভেদয়েৎ।"

অর্থাৎ—নিজের বন্ধু বান্ধব পরিবৃত হইয়াও এক পঙক্তিতে বসিয়া আহার করা উচিত নয়। কেন না, কাহার শরীরে কি পাপ প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, তাহা কে জানে? সেই সকল পাপবৃত্তি সংক্রমণের বাধার নিমিত্ত ভস্ম, খড়, অথবা জল দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক পঙক্তি ভেদ করিবে।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, সকলেরই শরীরের তেজঃপদার্থ. উষ্মা উত্তাপ বা তাড়িতরূপে অনবরত ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, উহা তেজেই সমধিক আকৃষ্ট হয়, তেজের অসম্পর্কিত কাঁচা ফল মূলাদিতে প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং অগ্নি, জল, লবণাদি সংযুক্ত অন্নাদিতে পাপীর কায়িক তেজ অপেক্ষাকৃত সহজে সংক্রান্ত হয়। কিন্তু মধ্যে যদি ছাই, খড় বা জল বেষ্টিত থাকে, তবে সেই তেজ, ছাই, খড় বা জল অতিক্রম করিয়া অন্নে বা ভোক্তার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ছাই, খড় ও জল যে তাড়িতের প্রতিরোধক তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

লোকে চলিত কথায় বলিয়া থাকে, "উহার গায়ের বাতাসে, অমুকের গায়ের তাপে লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়।" সংক্রামক রোগ ও পাপবৃত্তি যেমন একজনের শরীরে সংক্রান্ত হয়, আলাপ ও গাত্রস্পর্শাদি সংসর্গে পুণ্যবৃত্তিও তেমনই এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রান্ত হয়।

সেইজন্য অন্ন অথবা ব্যঞ্জন কণিকা মাত্রও বস্ত্রাদিতে লাগিয়া উচ্ছিষ্ট হইলে, ধুইবার প্রথা প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে, কেন না, 'এঁঠ' কাপড়ে রোগাদি দ্রুতবেগে সংক্রামিত হয়। আবার সেই সেই কারণে অর্থাৎ আলাপ গাত্রস্পর্শ ও একত্র ভোজনাদি কারণে সত্তের শরীর হইতে অসতের শরীরে দয়া প্রভৃতি সদ্গুণও বিস্তারিত হয়, এইজন্যই সংসর্গের এত মর্য্যাদা। এ সম্বন্ধে হারীত বলেন :—

"হস্মাদশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শুদ্ধোঽশুদ্ধস্তু শোধয়েৎ।
অশুদ্ধস্তু তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুদ্ধতি॥"

অর্থাৎ—অশুচিব্যক্তি, শুচি ব্যক্তির শুচিভাব বিনষ্ট করিতে পারে, এবং শুচি ব্যক্তিও অশুচিব্যক্তিকে আলাপাদি সংসর্গ দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, কেন না, অশুদ্ধ ব্যক্তি তমঃ প্রকৃতি অন্ধকারস্বরূপ, আবার শুদ্ধব্যক্তি সত্ত্ব প্রকৃতি সূর্য্য স্বরূপ সুতরাং সূর্য্যের আলোকে অন্ধকারের ন্যায় শুদ্ধব্যক্তি হইতে উচ্ছ্বসিত সৎপ্রবৃত্তির মাহাত্ম্যে অশুদ্ধ ব্যক্তির মলিন পাপবৃত্তি যে বিদূরিত হইবে, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

ফল কথা, যাহাদের তীব্র পরিমাণে সত্ত্ব শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, তাঁহারা পাপীর সহিত মাখামাখি করিলেও তাঁহাদের সেই প্রদীপ্ত সত্ত্বানল নির্ব্বাপিত হয় না, বরং সেই সত্ত্বানলের সংসর্গে পাপীদিগের পাপবৃত্তি সকল পুড়িয়া যায়। অধিক কি, একটী মাত্র সেই প্রকার সাত্ত্বিক পুরুষ আহারের সময় যদি এক পঙ্‌ক্তিতে

উপবেশন করেন, তাহা হইলে সমস্ত পঙ্‌ক্তি শুদ্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ সেই সাত্ত্বিক পুরুষের শারীরিক তেজঃ প্রবাহে, বলীয়সী সাধুবৃত্তি সকল প্রসৃত হইয়া প্রথমে অন্নে, তৎপরে ভোক্তৃবর্গের শরীরে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। কাজে কাজেই তৎ-সংস্পৃষ্ট অপরাপর লোকের মন যে পবিত্র হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এই হেতুতেই সত্ত্ববহুল সাধুকে শাস্ত্রকারেরা "পঙ্‌ক্তি পাবন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসর্গেই সৎ ও অসৎ হয়। এমন কি তাহাদের পরস্পরের শরীরের উপাদানই ক্রমশঃ বদলাইয়া যায়।

মানবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি, নানা কারণেই পরিবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে কালও একটি কারণ। যৌবনে যাহারা দুর্ব্বৃত্ত থাকে, তাহাদিগকে বার্দ্ধক্যে সাধু হইতে দেখা যায়। সেইরূপ সদাচার, তীর্থ দর্শন, দেবদ্বিজে ভক্তি, পিতৃমাতৃ সেবা ইত্যাদি কারণেও সদ্‌বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠে, এবং অসদ্‌বৃত্তি কমিয়া যায়, আর শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, কুশোদক, শঙ্খপুষ্পীর কাথ এবং গোমূত্রাদি পানেও পাপ বৃত্তির নিবৃত্তি হয়। কেননা ত্রিশক্তি ও দ্রব্য-শক্তির মহিমায় পাপীর আভ্যন্তরীন্ রজস্তমের মাত্রা কমিয়া যায়, তখন পাপীর দেহে আর কোনরূপ পাপ থাকে না।

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি॥"

অর্থাৎ—পাপ করিয়া যদি কেহ বলিয়া বেড়ায় যে, আমি অমুক অমুক পাপ করিয়াছি, অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন ভাবে পাপ সংস্কারগুলি আত্মাতে লুকাইয়া না রাখে, তবে তাহার আত্মার কলুষতা উঠিয়া যায়। অনুতাপে অর্থাৎ হায় আমি কত কুকর্ম্মই করিয়াছি এরূপ শোকে, যদি নিরন্তর দহ্যমান হয়, তবে তাহার আর পাপ থাকে না। জপ, তপস্যা, বেদাদি সচ্ছাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। প্রাণায়াম, দেবতাধ্যান, দান, হোম, গায়ত্রী জপ, জলে বাস, ইত্যাদি বহুবিধ কারণেই পাপীর পাপ নষ্ট হয়। যেহেতু অবস্থায় তাহাদের আত্মা ও শরীর, সম্যগ্‌রূপে পরিস্ফুট না হওয়ায় অনেকাংশেই জড় থাকে। যেমন জল, খড় ও ছাইকে তাড়িত অতিক্রম করিতে পারে না, সেরূপ শিশুশরীরেও সংসর্গাদি জনিত তাড়িতসহচরী পাপবৃত্তি বা পুণ্যবৃত্তি সংক্রান্ত হইতে পারে না।

অতএব পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে বৈড়ালব্রতীকে জলও দিবে না, তাহার অভিপ্রায় এই—বাস্তবিক জল দিলেই যে অমনি পাপ আসিয়া ধরিবে তাহা নহে,

পরন্তু পাপীর সহিত জলপ্রদানরূপ কার্য্যের মত ক্ষুদ্র সংসর্গ করিলেও সেই সামান্য সংসর্গ হইতেই ক্রমে বৃহৎ সংসর্গও হইতে পারে। হারীত সংহিতায় লিখিত আছে—

"অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ
তং দেশং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভিক্ষাপ্রদো হি সঃ॥"

অর্থাৎ—যে দেশে ব্রাহ্মণেরা ব্রতাদি নিয়ম ও পড়াশুনা ছাড়িয়া কেবল ভিক্ষা করিয়াই বেড়ায়, তদ্দেশস্থ ভিক্ষাপ্রদ লোককে রাজা দণ্ড দিবেন, যে হেতু সে সকল লোক চোরের ভাত যোগায়। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া তবে ঋষিগণ স্বধর্মত্যাগী পাপী ব্রাহ্মণদিগের ভিক্ষাদানরূপ সংসর্গ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন।

(মেদিনীপুর হিতৈষী।)

আনন্দাশ্রু ও প্রেমাশ্রু

(শ্রীযুক্ত নিতাইপদ দাস লিখিত।)

সাধারণতঃ অশ্রু দুই প্রকার—শোকাশ্রু ও আনন্দাশ্রু। পুত্রশোকাতুরা জননীর করুণ ক্রন্দনের ফলে যে গদ্গদ্-জল-ধারা কপোল-বক্ষ-সিক্ত করিয়া অবিরল ধারায় বহিয়া যায় তাহাকে এবং তদনুরূপ প্রাণের ব্যাকুলতা নিবন্ধন ধারাকে আমরা শোকাশ্রু বলিয়া থাকি, এবং অপর পক্ষে কোন জননীর পুত্র বা তদনুরূপ কোন আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ বা জীবনের মত বিচ্ছেদ-বার্ত্তা শ্রবণের পর যদি কিছুদিন পরে তাহাকে নিরাময় দেহে দেখিতে পায়, তবে সেই আনন্দের ফলে তাহার নয়নে যে বারিধারা দেখা দেয় তাহাকে আনন্দাশ্রু বলিয়া থাকি। এই শোকাশ্রু ও আনন্দাশ্রু এইরূপ অনেক কারণেই দেখা যায়। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যখন ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে অবিরল নেত্রজল মোচন করিতে থাকেন তখন তাহার সেই যে পবিত্র অশ্রু যাহা কোন্ শ্রেণীর? শোকাশ্রু ত নহেই। তবে কি আনন্দাশ্রু? আমার মনে হয় আমি যেরূপ আনন্দের সূত্র (Definition) দিলাম তাহা ঠিক আনন্দাশ্রু নহে। ইহাতে আরও কিছু মিশান আছে,

কিংবা আনন্দাশ্রুই বটে কিন্তু এ আনন্দ নয়। অনেকে বলিবেন তাহা ভগবদানন্দ। কিন্তু ভগবদানন্দ কি? তাহা কি এ আনন্দ হইতে একেবারে ভিন্ন জিনিষ, না ইহারই নামান্তর।

"কে যায় রে নবীন সন্ন্যাসী।
কোন্ বিধি নিরমিল দিয়া সুধারাশি॥
হেন রূপ হেন বেশ বড় ভালবাসি।
অন্তরে পরাণ কাঁদে দেখি মুখশশী॥
সঙ্গের ভকতগণ সমান বয়সী।
হরি হরি বলি কাঁদে পরম উদাসী॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মুখে হাসি।
করঙ্গ কৌপীন দণ্ড ভাবে পড়ে খসি॥
নন্দরাম দাস কহে মনে অভিলাষী।
কাঁদিয়া কাঁদাইল গোরা ত্রিভুবনবাসী॥"

আমি এই অশ্রুর কথাই বলিতেছি। তারপর আবার—

"গোলক ছাড়িয়া প্রভু কেন বা অবনী।
কালরূপ কেন হইল গোরা বরণ খানি॥
হাস বিলাস ছাড়ি কেন পহু কাঁদে।
না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেম ফাঁদে॥
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁপে ঘনে ঘন।
ক্ষণে সখি সখি বলি করয়ে রোদন॥
মথুরা মথুরা বলি করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে বা অক্রুর বলি করে অনুতাপ॥
ক্ষণে ক্ষণে বলে কিয়ে চাঁদ বদন।
ধুলায় লোটায়ে কাঁদে যত নিজগণ
ছার পরাণ কুলবতীর না যায়।
কহিতে আকুল পহু ধুলায় লোটায়॥
গদাধর কাঁদে প্রাণনাথ লৈয়া কোলে।
রায় রামানন্দ কাঁদে প্রণয় বিহ্বলে।
স্বরূপ শ্রীরূপ কাঁদে সঙরি বিলাস।
না বুঝিয়া কাঁদে নয়নানন্দ দাস॥"

কিংবা— "যা বোল বলিতে পুর্ণিত কলেবর।
যা বোল বলিতে বহে নয়নের জল॥" ইত্যাদি

এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আমি যাহাকে আনন্দাশ্রু বলিতেছি এ তাহা নহে। কেহ হয় ত বলিবেন ইহাকে "প্রেমাশ্রু" বলে। তাহা হইলে প্রেমাশ্রু কি একটী সম্পূর্ণ তৃতীয় শ্রেণী কিংবা ঐ আনন্দাশ্রুরই নামান্তর। তাহা হইলে এখানে কিন্তু এক প্রশ্ন উঠিল যে, প্রেমজনিত অশ্রুই প্রেমাশ্রু। প্রেম কি?

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥"

এখানে কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখান হইয়াছে, কিন্তু আমি চাই প্রেমে ও আনন্দে পার্থক্য কতটুকু। যদি এই প্রেম ও আনন্দ একই হয় কিংবা আংশিক ঐক্য থাকে, তবে প্রেমাশ্রু ও আনন্দাশ্রু একই কিংবা আংশিক ঐক্য আছে এবং এই আংশিক ঐক্যের সহিত একটু অন্য ভাবে মিশিয়া প্রেমাশ্রু নাম ধরিয়াছে।

মোটের উপর ইহা হইতে এই জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, "প্রেমাশ্রু ও আনন্দাশ্রু" ইহারা কি "শোকাশ্রু ও আনন্দাশ্রু"র মত দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ? উক্ত "আনন্দ ও ভগবদানন্দে" প্রভেদ কি? "প্রেম ও ভগবদানন্দে" পার্থক্য কি?

আনন্দাশ্রু কি দুই প্রকার? সাংসারিক আনন্দাশ্রু ও ভগবৎ বিষয়ে আনন্দাশ্রু?

আরও একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে "ব্রহ্মজ্ঞান" বলিয়া কিছু আছে কিনা। ভাদ্রের "ভক্তি"তে "ব্রজাঙ্গনার শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে আছে—"ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে সাধারণ জীবে এই উচ্চ অবস্থার কথা ধারণায়ও আনিতে পারে না।" "জ্ঞানী'রা যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলেন, একি সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান না অর্থান্তরে প্রয়োগ করা হইয়াছে? আশাকরি ভক্তির পাঠকগণ আমার সন্দেহ কয়টীর সদুত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। ভক্তিতে প্রকাশ হইলেই আমি জানিতে পারিব। ইতি

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং কয়েকখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ।

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ লিখিত।)

যে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান ত্রিতাপদগ্ধ জীবগণের উদ্ধারসাধন ও সাধু-ভক্তগণের মনোভিলাষ পরিপূরণার্থ যুগে যুগে অবতাররূপে ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকেন—যাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম, সাধারণ জীবগণের কথা দূরে থাকুক, সূক্ষ্মদর্শী যোগীগণেরও দুর্জ্ঞেয়—যিনি নরলোকে নরলীলা প্রকটিত করিয়া রহস্যবিৎ অন্তরঙ্গভক্ত ব্যতীত অপর সকলেরই মহামোহ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন—যাহার অহৈতুকী কৃপাবলে কেবল কোন কোন পরমভাগ্যবান্ জীব তদীয় নিগূঢ়-তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন,—যাঁহার বিশুদ্ধ সত্তা সর্ব্বলোকে ও সর্ব্বকালে সমভাবে ভক্তি ও বিস্ময়সহকারে পরিচিন্তনীয়—যে নটরাজ প্রয়োজনানুরোধে তাঁহার এই বিরাট বিশ্বরঙ্গভূমিতে কালেকালে শ্বেতপীতাদি বর্ণসমন্বিত নানাবিধ অলৌকিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন,—যিনি প্রেমস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ রসরাজ হইয়াও দুরধিগম্য মায়াপ্রভাবে ক্ষুদ্রজীবের দ্বারেদ্বারে দীনভাবে ও কাতরবচনে প্রেমভিক্ষা করিয়া থাকেন,—সেই অনাদি, অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয়, মায়াধীশ, মায়াবী পুরুষই ত্রৈলোক্যসুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ভাগীরথীতীরবর্ত্তী পুণ্যভূমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া জীবহিতার্থে একটি নূতনধর্ম্ম বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম। এই পরম পবিত্র ধর্ম্ম ভূলোকে স্বর্গ আনয়ন করিয়াছে। এই দেবদুর্ল্লভ অপূর্ব্বধর্ম্ম, ভক্তিরধর্ম্ম, প্রেমেরধর্ম্ম, সেবারধর্ম্ম, শান্তিরধর্ম্ম। এই অপার্থিব ধর্ম্ম সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রয় করিলে জীবের চিত্তবৃত্তি শান্ত হয়—হৃদয় সরল ও মধুময় হয়—প্রাণ প্রেমরসে পরিপ্লুত হয়। এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সহস্র সহস্র অশান্তমানব ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন। এই ধর্ম্ম সংসারক্লিষ্ট পাপতাপ জর্জ্জরিত মৃতপ্রায় মানবের প্রাণে নূতন জীবন সঞ্চারিত করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম কত শত বিষয়বিমুগ্ধ বদ্ধজীবকে প্রবুদ্ধ করিয়া তাহাদের দুর্জ্জয় মনোবৃত্তিসমূহকে ভগবদুন্মুখী করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম জড়প্রাণে প্রেমবারি সেচন করিয়া শ্রীভগবান ও তাঁহার অমৃতময় পূতনাম সকলকে মধুর হইতেও মধুরতর করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম ভক্তের

চক্ষুকে প্রেমরাগে অনুরঞ্জিত করিয়া সমগ্র বিশ্বসংসারকে তাঁহার নিকট একটী বিশাল প্রেমরাজ্যে পরিণত করিয়াছেন। এই অমরবাঞ্ছিত সুমহান ধর্ম্মের অনন্তমাহাত্ম্য ও অসীম গুণাবলী বর্ণনা করা মাদৃশ মূঢ়মতি ও কলুষকলঙ্কিত ক্ষুদ্র জীবাধমের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

মহাপুরুষেরা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, চিত্তভূমিতে ভক্তিবীজ উপ্ত না হইলে, হৃদয় শান্ত হয় না। বিষয়বাসনা দূর হয় না, অহঙ্কার ও অভিমান বর্জ্জন করা যায় না। কিন্তু সেই ভক্তিলাভ ত সহজ ব্যাপার নহে। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়ে ভক্তিধন ক্রয় করা হইলেও, মূল্য অধিক দেওয়া হইল এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু এই অতি সুদুর্ল্লভ ভক্তিলাভের একটি সুলভ উপায় ভগবান শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পূতচরিত্র সর্ব্বদা আলোচনা করা, দীনভাবে সেই পতিতপাবন দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণযুগল আশ্রয় করিতে পারিলে দয়াময় নাকি আশ্রিতজনকে ভক্তিসুধাদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। তাই, প্রথমতঃ সাধু ও ভক্তজনের সংসর্গে সেই পূতচরিত্রের মাহাত্ম্য সবিস্তর শ্রবণ করা উচিত। তাহার পর সেই অলোকসামান্য চরিত্রে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে, তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক। সংসার দাবানল দগ্ধ শান্তি-পিপাসু বিবেকী ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সুপবিত্র চরিত্র যতই আলোচনা করিবেন ততই তাঁহাদের আত্মা ও প্রাণের যে পরমকল্যাণ সাধিত হইবে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু সাধারণ পাঠকগণ শ্রীগৌরাঙ্গের এই অপার্থিব লীলাসমুচ্চয় পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কি কি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন? শ্রীভগবানের নিজ জন পরমভক্ত শ্রীল বৃন্দাবন দাস, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়, শ্রীল লোচনদাস, শ্রীল কবিকর্ণপুর এবং কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালের শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীল গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণ শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিয়া যে সমস্ত গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই অমৃতরসের ভাণ্ডার। কিন্তু সে ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার অধিকার যাহার তাহার নাই। শ্রীগৌরাঙ্গচরিত্র আলোচনা করিবার পক্ষে স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থসমুদয় অল্প সহায় নহে। "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী শ্রীল হরিদাস গোস্বামী প্রণীত "শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত" প্রভৃতি লীলাগ্রন্থ সকলও সাধারণ পাঠকগণের শ্রীচৈতন্যলীলা পরিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়ক তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু লীলাগ্রন্থ সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মাবধারণ করিতে

চেষ্টা করা চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই মহাগ্রন্থের বর্ণে বর্ণে সুধা ক্ষরিত হইতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে এই গ্রন্থ অতীব দুরূহ। ভগবদ্লীলা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমি অল্পজ্ঞ জনসাধারণকে "ভক্তমাল" নামক অপূর্ব্বগ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বিষয়-বিরত ও পাপভারাক্রান্ত সংসারী জীবের পক্ষে মনঃশিক্ষা এবং শ্রীলনরোত্তম দাসের প্রার্থনাদিও যে আরও নিতান্ত কল্যাণকর তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু "ভক্তমাল" গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি দুই চারিটী কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। এই গ্রন্থে ভক্ত ও ভগবানের বিবিধ অলৌকিক লীলা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অবিশ্বাসী বা অল্পবিশ্বাসী পাঠক যেন সেগুলি লইয়া উপহাস না করেন। বস্তুতঃই ভগবৎলীলা দুরবগাহ ও মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। ভগবানের নিকট সম্ভব অসম্ভব দুইই সমান। যিনি একটী সর্ষপ পরিমিত ক্ষুদ্রবীজ হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহ সৃষ্টি করিতে পারেন, একবিন্দু রক্তকণা হইতে বিশালকায় জীবসৃষ্টি করিতে পারেন, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ বা অপ্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে কি অসম্ভব বলত ভাই। ফলতঃ বিশ্বাসী হও আর লীলারহস্য বুঝিতে চেষ্টা কর—অচিরে দেখিবে, তুমি যে জগতের বিষয় এ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত আছ তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র জগত আছে—লীলারসময় হরি সেই জগতে নিরন্তর লীলা করিতেছেন আর বিশ্বের সমস্ত সাধুভক্ত তাঁহার সেই দৈবীলীলার সহায়তা করিতেছেন। ভগবান ভক্তগণকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারেন না। আর ভক্তগণও ভগবানকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ভক্তগণের সহিত ভগবানের এই খেলা চলিতেছে। এই ক্রীড়ারই প্রতিরূপ লীলা আমরা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলায় দেখিতে পাই। আর এই ক্রীড়ারই কোন কোন রহস্য "ভক্তমাল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সুতরাং ভাইসকল। ভক্তমালকে কখন অগ্রাহ্য বা অনাদর করিও না। তারপর শ্রী.শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিজলীলা। এ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উন্নত পাঠকেরা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও সর্ব্বশেষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। শেষোক্ত গ্রন্থের ন্যায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ আধুনিক জগতে আর কোথাও রচিত হইয়াছে কি না জানি না। সমগ্র বৈষ্ণব দর্শনের সারতত্ত্ব এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে ইহা ভক্তিতত্ত্বের অমৃতভাণ্ডারই বটে। ভক্তিপিপাসু ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের পক্ষে এই গ্রন্থ পরম আদরের বস্তু। বস্তুতই এই গ্রন্থ যেন অমৃতের সরসী।

যে যে উপায়ে দুঃখানল দগ্ধ অশান্তজীব হরিপাদপদ্মলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে

পারেন, সে সকলি ইহাতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব যিনি সংসারের দুঃখ জ্বালা জুড়াইতে চাহেন, তিনি যেন কদাপি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের শান্তিময় সুশীতল সলিলে অবগাহন করিতে বিস্মৃত না হয়েন। আমি এই বরণীয় গ্রন্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণনামের অসাধারণ মাধুর্য্য ও অলৌকিক গৌরব ব্যঞ্জক একটীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণ ক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণা র্বুদেভ্য স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাংকৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

জানি না, "কৃষ্ণ" এই দুইটী বর্ণ কীদৃশ অমৃত দ্বারা গঠিত হইয়াছে। এই দুইটী বর্ণ যখন জিহ্বায় নৃত্য করে, তখন দুই একটী নয়, কিন্তু রসনাপঙক্তিলাভ করিবার অভিলাষ হয়। এই দুইটী বর্ণশ্রবণ বিবরে অঙ্কুরিত হইলে অর্ব্বুদসংখ্যক কর্ণলাভের স্পৃহা জন্মে, আর এই দুইটী বর্ণ মনোরূপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপারই এতৎসকাশে পরাভূত হইয়া পড়ে।

—

বর্ষশেষে আমাদের কথা

সর্ব্বপ্রথমে যে ইচ্ছাময় অনন্তলীলাবিলাসী পরমকরুণ শ্রীশ্রীগৌরহরির কৃপায় ভক্তির চব্বিশবর্ষ পূর্ণ হইল, তাঁহার মঙ্গলময় নামের জয় ঘোষণা করিয়া আমার বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। জয় গৌরহরি।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ! দেখিতে দেখিতে আপনাদের বড় আদরের "ভক্তি"খানি আজ ২৪শ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ২৫শ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই বৎসর পূর্ণ হওয়ার মধ্যে আমাদিগের কর্ত্তৃত্ব কিছুই দেখিতেছি না, আমরা যথার্থই সেই লীলা নটরাজের ক্রীড়া পুত্তলিকার মত কর্ম্মের নিমিত্ত কারণ মাত্র। তিনি যখন যেভাবে যেমন চালাইয়াছেন আমরা সেইভাবে তেমনই চলিয়া আসিয়াছি মাত্র। সকলই সেই লীলাময়ের ইচ্ছা।

এই বৎসর প্রারম্ভ হইতে মনে মনে অনেক সঙ্কল্প আঁটিয়াছিলাম, কিন্তু ইচ্ছাময়ের যে কি ইচ্ছা জানিনা সকল সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। নিজের শারীরিক অসুস্থতা প্রধান কারণ, তাহার উপর বাহিরের ধর্ম্মসভাদিতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যদিও অন্যান্যবারেও যাওয়া হয় কিন্তু এবার অন্যবার অপেক্ষা কিছু বেশী সময় আমাকে বাহিরে থাকিতে হইয়াছে, তাহাতে পত্রিকা প্রকাশে অযথা বিলম্ব হইয়াছে। তারপর কলিকাতার হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রায় একমাস ছাপাখানার কোন কার্য্যই হয় নাই, শেষে সেগুলি মিটিয়া গেলেও পারিবারিক নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি আমার কার্য্যের অনেক অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। তাই নিয়মিতভাবে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থার জন্য বাধ্য হইয়া আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের পত্রিকা একত্রে শেষ করিয়া লইতে হইল। কারণ, শ্রাবণ মাসে বৎসর শেষ হইয়া ভাদ্রমাস হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবে এবং ভাদ্র মাসের পত্রিকাও শ্রাবণ মাসের মধ্যেই ছাপা শেষ করিতে হইবে। এজন্য আমার শত ত্রুটী গ্রাহকগণ মার্জ্জনা করিবেন। এইটী আমার বর্ষশেষে প্রথম নিবেদন।

তারপর আগামী বৎসরের জন্য দু'একটী কথা বলিব। গ্রাহকগণ অন্যান্য বারের অপেক্ষা গতবৎসরে সহানুভূতি একটু কম দেখাইয়াছেন। আশা করি আগামী বৎসরে সেটুকু পূর্ণ করিবেন? গ্রাহকগণের সহানুভূতি না পাইলে পত্রিকা প্রকাশ করা অসাধ্য, যদি সকল গ্রাহক পত্রিকাখানির জীবন রক্ষার জন্য অন্ততঃ একজন করিয়াও নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন তাহা হইলেও যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। আমরা গ্রাহক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি ও অন্যান্য প্রকারে পত্রিকার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে কোন ত্রুটীকরিব না। পুরাতন গ্রাহকগণ আমাদিগের কার্য্যের সহায় হউন।

অনেক গ্রাহকের নিকট বার্ষিক ভিক্ষা এখনও বাকী, যাহাতে বৎসরের প্রথমেই আমরা গ্রাহকগণের নিকট হইতে বার্ষিক ভিক্ষা পাইতে পারি তাহার জন্য সকলেরই একটু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কোন কোন গ্রাহক প্রথমে টাকা না দিয়া নিয়মিতভাবে পত্রিকা গ্রহণ করিতে থাকেন, শেষে টাকার তাগাদা হইলেই পত্রিকা ফেরৎ দেন, আমরা বুঝিতে পারি না যে, এসব কি প্রকার প্রবৃত্তির কার্য্য। তাঁহাদিগকে মনে রাখা আবশ্যক যে পত্রিকা প্রকাশে বা মাসে মাসে পত্রিকা পাঠাইতে খরচ হয়।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"বিদ্যাভাবযুক্ত ও অবিদ্যাভাবযুক্ত ভেদে অর্থও

দুই প্রকার। তন্মধ্যে বিদ্যাভাবযুক্ত অর্থের দ্বারা পরমার্থ সঞ্চয় ও অবিদ্যা ভাবযুক্ত অর্থের দ্বারা নরকের পথ পরিষ্কার হয়। অপরিষ্কার জলে নির্ম্মাল্য সংযোগ করিলে যেমন উহা পরিষ্কৃত হইয়া পিপাসুর পিপাসার নিবৃত্তি করে সেইরূপ অর্থের কতকাংশ সদ্ব্যয় করিলে অবশিষ্টাংশ বিদ্যাভাব শ্রীযুক্ত হইয়া ভোগ বাসনা নিবৃত্তির কারণ হয় ও অধিকারীকে শান্তিরূপ সম্বল প্রদান করিয়া মোক্ষপথে অগ্রসর করিয়া দেয়। কিন্তু অবিদ্যাভাবযুক্ত অর্থ অসৎভাবে ব্যয়িত হইয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বাসনার পরিবৃদ্ধি করিয়া দেয় ও ক্রমে রোগাদি অশান্তির দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যায় অথবা সিন্দুক মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া অধিকারীর মস্তকে অভিমানের গুরুভার চাপাইয়া দেয় ও তাহাকে নরকাভিমুখে দ্রুত চালিত করে, কদাচ ভোগ্য হয় না, ফলে এরূপ অর্থ থাকা অপেক্ষা অর্থহীন হওয়া শতগুণে মঙ্গল জনক।”

অর্থ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিবার কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি। বৎসর শেষে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন গ্রাহক সারা বৎসর পত্রিকা লইয়া মূল্য দিবার সময় ফেরৎ দিয়া উদারতার পরিচয় দিয়া থাকেন। যদিও ভক্তির গ্রাহক সংখ্যার তুলনায় এরূপ প্রকৃতির লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য, তথাপি তাহাদের ব্যবহার অতিশয় দুঃখজনক। ভক্তিদেবীর সেবা পক্ষান্তরে ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা রূপ পরম মঙ্গল অনুষ্ঠানের সহায়তা না করিয়া বাৎসরিক দেড়টী টাকা যাহারা দিতে অক্ষম অথচ ভক্তিপাঠে আগ্রহযুক্ত তাহাদিগকে বিনামূল্যে বা অর্দ্ধমূল্যে ভক্তি পত্রিকা প্রদানে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। কেন না ধর্ম্ম লইয়া দোকানদারী করা আমাদের একেবারেই রুচিবিরুদ্ধ। পত্রিকার যিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁহার সহিত যাঁহাদের সামান্য মাত্রও পরিচয় ছিল তিনি এ বিষয়ের সত্যাসত্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। তাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত না করিয়া যাঁহার পত্রিকা লওয়ার অনিচ্ছা তিনি বৎসরের প্রথমেই আমাদিগকে জানাইবেন, নতুবা বরাবর পত্রিকা লইয়া শেষে টাকা দিবার সময় ফেরৎ দিয়া হৃদয়ের ধর্ম্মভাব হীনতার পরিচয় দিয়া আমাদিগকে ব্যথিত করিবেন না ইহাই বিনীত নিবেদন।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, ভক্তির উন্নতির জন্য আমাদের যত্নের ত্রুটী কখনও হইবে না, তবে জানি না, লীলাময় এবার আবার কোনভাবে ভাবাইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করুন। কর্ম্মক্ষেত্রে যে ভাবেই

চালিত হই না কেন যেন তাঁহাকে না ভুলি। অভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্ম ফলের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া এবং লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদির আশা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে যেন ভক্তিদেবীর সেবা করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিতে পারি, পক্ষান্তরে আপনাদেরও আনন্দ প্রদানে সমর্থ হই।

পরিশেষে আমার বিনীত প্রার্থনা যে, যে সকল ভক্ত নিঃস্বার্থ পরোপকার রূপ মহান্ ভাবের প্রেরণায় গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া অথবা প্রবন্ধাদিদ্বারা ভক্তি প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন বা করিতেছেন শ্রীভগবান তাঁহাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিধান করুন।

বর্ত্তমান মাসে ভক্তির ২৪শ বর্ষ পূর্ণ হইল, আগামী ভাদ্র মাসে ২৫শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। আমরা ভাদ্রমাসের প্রথম সংখ্যাই গ্রাহকগণের নিকট বার্ষিক মূল্য ১৷৹ ও ভিঃ পি খরচাদি ৵৹ মোট ১৷৶৹ আনা ধার্য্য করিয়া ভিঃ পি করিতে চাই, যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে এই সংখ্যা পাইয়াই তাহারা আমাদিগকে জানাইবেন। আর এক কথা, ভিঃ পি আমরা ১৷৶৹ আনা ধার্য্য করিয়া করিব কিন্তু ডাকঘরের নিয়মানুসারে গ্রাহককে উহা ১৸৵৹ আনা দিয়া লইতে হইবে। যদি গ্রাহকগণ নিজ নিজ দেয় বার্ষিক মূল্য মনিঅর্ডারে পাঠান, তাহা হইলে ১৷৵ আনা খরচেই হয়। যাহা হয় ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন, তাহার পর হইতেই আমরা যথা নিয়মে পত্রিকা ভিঃ পি করিতে থাকিব। শেষে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া অনর্থক আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। ইতি—

বিনীত—ভক্তি-কার্য্যাধ্যক্ষ।

আবিষ্কারক বাবু

মোদের বাবুকে ধন্য ধন্য।
কতই নূতন শুনিতেছি মোরা,
বাবুর গুণের জন্য॥
আকাশের তারা পাতালের বালি,
গণিয়াছে বাবু অঙ্কে।
আরো বলিয়াছে দিবাকর গড়া
কি পাথরে কোন্ পঙ্কে॥

আকাশের চাঁদ গড়িবার কালে
লেগেছিল কোন অগ্নি,
সব বলে বাবু, আরো বলিয়াছে,
শিবের কয়টি ভগ্নী ॥
কালী পূজা যারা করে, তারা গাধা
লিখে দিল নিজ হস্তে।
প্রমাণ ক'রেছে এ পৃথিবী নাই,
কেবল কথার কস্তে ॥
বাবু পাইয়াছে ভারি এক গ্রন্থ
তাতে আছে এক সুত্র।
চৈতন্য নিতাই সহোদর ভাই,
এক কামারের পুত্র ॥
নবদ্বীপ ছিল নবগঙ্গা তীরে
নৈহাটার ঘাট ছাড়ি।
শ্রীবাস আঙ্গিনা? এখন যেখানে
বাবুর শ্বশুর বাড়ী ॥
(বাবু,) বহু পরিশ্রমে করিয়াছে ঠিক,
বানর জাতির সূত্র।
বীর হনু ছিল ব্রাজিল নগরে,
জোন্ সাহেবের পুত্র ॥
নল নীল ছিল নলডাঙ্গার রাজা,
সুগ্রীব ছিল বঙ্গে।
অঙ্গদ ছিল কোরিয়া অঞ্চলে,
বিভীষণ ছিল সঙ্গে ॥
কোরাণ পড়িয়া পাইয়াছে বাবু
কোরিয়ার ইতিহাস।
কৃষ্ণ ছিল তথা নবাবের মন্ত্রী,
বৃন্দাবনে আদিবাস ॥
পেন্সন্ লইয়া গোকুলে আসিয়া,
রাধাকে বিবাহ করে।
(শেষে) প্রভাসে যাইয়া পাহাড়ে উঠিতে
পড়িয়া পা ভাঙ্গি মরে ॥
মোদের বাবুকে ধন্য ধন্য।
কতই নতুন শুনিতেছি মোরা,
বাবুর গুণের জন্য ॥

স্পষ্ট বক্তা।

শ্রীবৈষ্ণব স্মরণীয় তিথি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আষাঢ়মাস। শুক্লপক্ষ

৫৯। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর তিরোভাব (রথযাত্রা) দ্বিতীয়া
৬০। শ্রীসেন শিবানন্দের উৎসব। (শ্রীকৃষ্ণরায়ের রথযাত্রা কাঁচড়াপাড়া) ঐ
৬১। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব (শ্রীবৃন্দাবনে) পঞ্চমী
৬২। শ্রীপাট বাগনাপাড়ার উৎসব। (?) ঐ
৬৩। ভদ্রক সাঁইথিয়া গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন উৎসব। হোরাপঞ্চমী।
৬৪। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অদর্শন। অষ্টমী
৬৫। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা। শুক্লপূর্ণিমা।
৬৬। শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাব ঐ

কৃষ্ণপক্ষ।

৬৭। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব অষ্টমী
৬৮। শ্রীমাধবাচার্য্য গোস্বামীর আবির্ভাব (যশোদল ও চাচুড়ে উৎসব) অমাবস্যা

শ্রাবণ মাস। শুক্লপক্ষ

৬৯। শ্রীতুলসীদাস গোস্বামীর (শ্রীরামভক্ত) তিরোভাব সপ্তমী।
৭০। শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব দ্বাদশী
৭১। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাব (কালনা) ঐ (মতান্তরে ত্রয়োদশী)
৭২। শ্রীগোবিন্দদাসের তিরোভাব (কোন্ গোবিন্দ ?) দ্বাদশী
৭৩। শ্রীরোহিণীনন্দন বলদেবের আবির্ভাব পূর্ণিমা।

কৃষ্ণপক্ষ

৭৪। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব — অষ্টমী

ভাদ্রমাস শুক্লপক্ষ

৭৫। শ্রীঅদ্বৈত ঘরণী সীতাদেবীর আবির্ভাব — চতুর্থী

৭৬। শ্রীবৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার আবির্ভাব — অষ্টমী

৭৭। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। (পুলীনগ্রামে ও পুরীধামে উৎসব) অনন্তচতুর্দ্দশী

কৃষ্ণপক্ষ

৭৮। শ্রীমন্মহানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব। (জগতিবল্লবপুরে উৎসব) অমাবস্যা

৭৯। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশন—শ্রাবণ মাস, হস্তানক্ষত্র, বৃহস্পতিবার, তিথি (?)

আশ্বিনমাস শুক্লপক্ষ

৮০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরীধাম হইতে গৌড়ে গমন — বিজয়াদশমী

৮১। শ্রীমাধবাচার্য্য স্বামীর আবির্ভাব (দাক্ষিণাত্যে) — ঐ

৮২। শ্রীরূপ কবিরাজের তিরোভাব (বরিশাল কলসকাটীতে উৎসব) — ঐ

৮৩। শ্রীজগদানন্দের আবির্ভাব (বীরভূম—জোফলাই গ্রামে উৎসব) বামনদ্বাদশী (ইনি জগদানন্দ পণ্ডিত নহেন)

৮৪। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব — ঐ

৮৫। শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর তিরোভাব — ঐ

৮৬। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাব (ঝামটপুরে উৎসব) — ঐ

৮৭। শ্রীমুরারী গুপ্তের তিরোভাব — পূর্ণিমা

কৃষ্ণপক্ষ

৮৮। শ্রীগোবিন্দদাসের তিরোভাব (?) — প্রতিপদ

৮৯। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব: খেতুরীতে উৎসব — পঞ্চমী
(মতান্তরে কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমী কিন্তু খেতুরীতে উপরোক্ততিথিতেই উৎসব হয়)

৯০। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অদর্শন — অষ্টমী

৯১। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব — নবমী

৯২। শ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন। — দ্বাদশী

দ্বাদশীতে তিথিপূজা, পর রবিবারে বিরাট উৎসব

কার্ত্তিক মাস শুক্লপক্ষ

৯৩। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব (চাকটা গ্রামে উৎসব) প্রতিপদ
(৪৫ নং একবার লিখিয়াছি ইনি কে ?)

৯৪। শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দদেবের আবির্ভাব — ঐ

৯৫। শ্রীবাসুঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব — ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

৯৬। শ্রীঅভিরাম সখা শ্রীযদুনন্দনের তিরোভাব — পঞ্চমী

৯৭। শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর তিরোভাব জাজিগ্রামে উৎসব — অষ্টমী

৯৮। শ্রীদাস গদাধরের তিরোভাব এড়িয়াদহে উৎসব — ঐ

৯৯। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব — ঐ

১০০। শ্রীঅভিরাম শিষ্য শ্রীবিদুর বা যাদবেন্দু পণ্ডিতের তিরোভাব নবমী
(বর্দ্ধমান পাতুনগ্রামে উৎসব)

১০১। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতনন্দন শ্রীগোপালপ্রভুর আবির্ভাব — দ্বাদশী

১০২। শ্রীশ্রীবিদ্যাপতির তিরোভাব (দ্বারভাঙ্গা বিপসী) — ত্রয়োদশী

১০৩। শ্রীভুগর্ভ গোস্বামীর তিরোভাব — পূর্ণিমা (রাসযাত্রা)

১০৪। শ্রীরামচন্দ্র তিরোভাব। (?) — ঐ

১০৫। শ্রীকাশীনাথ বা কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব (চাতরা) ঐ

১০৬। শ্রীবলরাম ভট্ট গোস্বামীর উৎসব (ভুঁইয়ালি পাবনা) শ্রীশ্রীকেশব রায়
মন্দিরে রাসযাত্রা পূর্ণিমা

১০৭। শ্রীঠাকুর কানাইর তিরোভাব নদীয়া ভাজন ঘাটে উৎসব। পূর্ণিমা

কৃষ্ণপক্ষ

১০৮। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব। (মহেশপুর) — প্রতিপদ

১০৯। শ্রীরুদ্রপণ্ডিতের আবির্ভাব। (বল্লভপুর) — অষ্টমী

১১০। শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব। পাবনা সোনাতলার উৎসব
(মতান্তরে ফাল্গুন অমাবস্যা ও বারুণীতে) — দ্বাদশী

১১১। শ্রীনরহরি ঠাকুরের অদর্শন। (শ্রীখণ্ডে উৎসব) দ্বাদশী

১১২। শ্রীসারস্বত ঠাকুরের তিরোভাব ত্রয়োদশী

অগ্রহায়ণ মাস শুক্লপক্ষ

১১৩। শ্রীজগদীশ শিষ্য—শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর খুস্তির মেলা—চন্দন নগর (গোঁসাইঘাট) অষ্টমী

১১৪। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব (?) দ্বাদশী

কৃষ্ণপক্ষ

১১৫। শ্রীদ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের তিরোভাব (মূলা উৎসব) দোগাছিয়া গ্রামে চতুর্থী

১১৬। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব। অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ। (কুলিয়া পাহাড়পুর এবং কাঁচড়াপাড়ার নিকট কুলিয়াতে উৎসব।) একাদশী

১১৭। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব (পালপাড়া) ত্রয়োদশী
মতান্তরে পৌষ কৃষ্ণা অষ্টমী

১১৮। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব। (সপ্তগ্রামে উৎসব) ঐ

১১৯। শ্রীমাধবাচার্য্য গোস্বামীর তিরোভাব যশোহর ও চাঁন্দুড়ে উৎসব অমাবস্যা

পৌষমাস শুক্লপক্ষ

১২০। শ্রীজীব গোস্বামীর আবির্ভাব মতান্তরে তিরোভাব তৃতীয়া

১২১। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব। (যশড়া) দ্বাদশী

১২২। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য গৃহত্যাগ ত্রয়োদশী
(ঐ দিন পৌষ সংক্রান্তী। অন্য মতও আছে)

১২৩। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অদর্শন ঐ

১২৪। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ণিমা
(ঐ দিন ২রা মাঘ। অন্য মতও আছে)

১২৫। শ্রীজ্ঞানদাসের আবির্ভাব কাঁদড়া ঐ

কৃষ্ণপক্ষ

১২৬। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব তৃতীয়া

১২৭। শ্রীঅভিরামশিষ্য রজনীপণ্ডিতের তিরোভাব—(ভাঙ্গামোড়াগ্রাম) ষষ্ঠী

১২৮। শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব—(সুখসাগর) চতুর্দ্দশী
মতান্তরে পৌষকৃষ্ণা চতুর্থী

১২৯। শ্রীজয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব (কেন্দুবিল্ব)
পৌষ বা মকর সংক্রান্তি

১৩০। শ্রীলোচন দাসের তিরোভাব (কোগ্রাম) ঐ

১৩১। শ্রীউদ্ধারণ দত্তের উৎসব (?) (উদ্ধারণপুর) ঐ

১৩২। মন্দার পর্ব্বতে (ভাগলপুরে) শ্রী৺মধুসূদন মন্দিরে উৎসব ঐ
মহাপ্রভু গয়া গমনকালে ঐ স্থানে আগমন করেন।

১৩৩। বাবা মনোহর দাসের উৎসব। (বদনগঞ্জ হুগলী) প্রতি বৎসর
২৯শে পৌষ নির্দ্ধারিত

১৩৪। শ্রীঅদ্বৈতনন্দন বলরাম প্রভুর আবির্ভাব। পৌষমাস। তিথি (?)

মাঘমাস শুক্লপক্ষ

১৩৫। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব বসন্তপঞ্চমী

১৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর তিরোভাব ঐ

১৩৭। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব ঐ

১৩৮। শ্রীরঘুনন্দনের আবির্ভাব। শ্রীখণ্ডে ঐ

১৩৯। শ্রীকৃত্তিবাস ওঝার জন্ম (রামায়ণ অনুবাদক, ফুলিয়া গ্রাম) ঐ

১৪০। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব মাকরী সপ্তমী

১৪১। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শিষ্য—শ্রীগোপালদাসের তিরোভাব ঐ

১৪২। শ্রীকেশবভারতীর আবির্ভাব। বর্দ্ধমান আউরিয়া গ্রামে ও
দেনুড়গ্রামে উৎসব দ্বাদশী

১৪৩। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। (ঐ দিন মঙ্গলবার ছিল) ত্রয়োদশী

১৪৪। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের আবির্ভাব মাঘীপূর্ণিমা

১৪৫। শ্রীমধুপণ্ডিতের শ্রীপাট সাইবোনা গ্রামে শ্রীনন্দদুলালের উৎসব। ঐ

১৪৬। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব ঐ

কৃষ্ণপক্ষ

১৪৭। শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর (শ্রীবংশীবদনের পৌত্র) তিরোভাব তৃতীয়া

১৪৮। দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব (কাঞ্চন গড়িয়াতে) একাদশী

১৪৯। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্মভূমি শ্রীপাট কৃষ্ণপুরের উৎসব
প্রতি বৎসর ১লা মাঘ পূর্ব্বে ভাদ্র মাসে হইত।

১৫০। শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামীর সমাধিমন্দিরে "তুলসী চারা যাত্রা" মহোৎসব
(মেদিনীপুর দাসপুর গ্রামে) ঐ

১৫১। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাঠ শীতলগ্রামে মহোৎসব।
প্রতিবৎসর ১৪ই মাঘ

ক্রমশঃ

শ্রীপাট পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দির

(নিবেদন পত্র।)

গৌরপ্রেমের বাদর প্লাবিত ধন্য পানিহাটী ভূমি।
কত ভক্ত পদরেণু মণ্ডিত তনু বার বার তোমা নমি॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাণী ,—

"ভক্তির প্রচার, ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থন।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার তিন প্রয়োজন॥" (অদ্বৈত প্রকাশ)

শ্রীশ্রীগুরুদেব ও ভক্তবৃন্দের কৃপায়, ভগবান শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অতীব প্রিয় লীলাভূমি—তাঁহাদিগের "চির আবির্ভাব ক্ষেত্র" এবং বৈষ্ণব জগতের পরমতীর্থ শ্রীপাট পানিহাটী গ্রামে কয়েক বৎসর হইল "শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির" স্থাপিত হইয়াছে। ইতি মধ্যে ইহাতে বহু সদ্‌গ্রন্থ এবং হস্তলিখিত প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব পুঁথি ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সংক্রান্ত নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য ,—

(ক) শ্রীনাম সংকীর্ত্তন, এবং সাধ্যমত "জীবে দয়া ও বৈষ্ণবসেবন" রূপ পরম ধর্ম্মের অনুশীলন।

(খ) "আপনি আচরি ধর্ম্ম,"—পরে উপযুক্ত হইলে দেশে বিদেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত সুমধুর প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা সর্ব্ব জাতির মধ্যে প্রীতি ও আত্মীয়তা সংস্থাপন।

(গ) লুপ্ত বৈষ্ণব তীর্থ সমূহের উদ্ধার, লুপ্ত গ্রন্থ প্রচার, ভক্তগণের জীবনী এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রাচীন তথ্যাদির অনুসন্ধান প্রকাশ।

(ঘ) বিদেশীয় ভাষায় বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রচার।

(ঙ) হস্তলিখিত প্রাচীন জীর্ণ কীটদষ্ট বৈষ্ণব পুঁথিগুলির উদ্ধার সাধন, সযত্নে রক্ষণ ও মুদ্রিত করণের চেষ্টা। (দুঃখের বিষয় বহু অমূল্য গ্রন্থ আমাদের চেষ্টার অভাবে নিত্যই ধ্বংশ মুখে পতিত হইতেছে।)

(চ) মুদ্রিত যাবতীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ, শাস্ত্র গ্রন্থ এবং অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থের একত্র সন্নিবেশ দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে শ্রীভগবানের মধুর লীলা ও তত্ত্বানুশীলনে সহায়তা করা, এবং যাহাতে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সদালোচনার দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা সুকুমারমতি বালক ও যুবকবৃন্দের চরিত্র গঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা।

(ছ) সর্ব্ব সাধারণ মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগাইবার জন্য, প্রতি বৎসর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রাচীন দ্রব্যাদির প্রদর্শন ও আধুনিক তথ্য সমূহের প্রকাশ করা।

(প্রথম প্রদর্শনী ১৩৩২ সালে শ্রীপাট পানিহাটীতে হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে ভক্তগণ বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।)

(জ) শ্রীপাট পানিহাটীতে চারিশত বৎসর ধরিয়া যে প্রেমোৎসব ("দণ্ড মহোৎসব) অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে উহাতে এবং নব প্রতিষ্ঠিত "শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আগমন মহোৎসবে" সমাগত বিদেশী সাধু ভক্তগণের সাধ্যমত সেবা করিয়া কৃতার্থ হওয়া। (উৎসব দুইটীর তারিখ সকল পঞ্জিকায়ই লিখিত আছে।)

উল্লিখিত এবং এতদনুরূপ বহু হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান এই শ্রীমন্দির স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিশেষ নিবেদন।

বংলায় বা বাংলার বাহিরে যেখানে যেখানে শ্রীহরিসভা, ভাগবত সভা, কীর্ত্তন-মণ্ডলী বা ভক্তি ধর্ম্ম প্রচারের যে কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠান আছে আমরা সে গুলির সহিত সদ্ভাব ও প্রীতির আদান প্রদান করিতে বিশেষ ইচ্ছুক। ভক্তগণ কৃপা করিয়া প্রতিষ্ঠান গুলির নাম, ঠিকানা এবং বিবরণ প্রেরণ করিলে উপকৃত হইব। বার্ষিক উৎসবের সংবাদও প্রদান করিবেন।

সভ্যশ্রেণী

পরধর্ম্ম সহিষ্ণু যে কোন ব্যক্তি শ্রীমন্দিরের নিয়ম ও পবিত্রতা রক্ষা করতঃ এখানে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন, ভক্তি গ্রন্থ পাঠ এবং বৈষ্ণব পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিতে পারিবেন।

ভাগবত প্রসঙ্গ ভিন্ন কোন গ্রাম্য কথা অথবা রাজনৈতিক কিম্বা সামাজিক প্রসঙ্গের আলোচনা করা বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ।

প্রার্থনা

এক্ষণে এই শ্রীমন্দিরের সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব বিধান ও উন্নতির জন্য আমরা সহৃদয় দেশবাসীগণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। যিনি যেরূপে পারেন অর্থাদি

দানেই হউক বা প্রাচীন বৈষ্ণব পুঁথি, মুদ্রিত ধর্ম্মগ্রন্থ, মাসিক পত্রিকাদি, লীলাচিত্র প্রাচীন শ্রীবিগ্রহের, শ্রীমন্দিরের, শ্রীপাটের এবং ভক্তগণের ফটোচিত্র, মহাপুরুষ গণের জীবনী, বংশাবলী, হস্তাক্ষর, স্মৃতি চিহ্ন, এবং শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত, পথপরিচয় প্রভৃতি প্রদানে অথবা উহাদের সংগ্রহের সহায়তা করিয়াই হউক এই শ্রীমন্দিরটীকে বঙ্গের একটী আদর্শ বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠান রূপে পরিণত করুন ইহাই সর্ব্ব সাধারণের নিকট আমাদের করজোড়ে নিবেদন। অসমর্থ যাঁহারা তাঁহারা আমাদের প্রতি কেবলমাত্র শুভ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেই আমরা পরম লাভ মনে করিয়া কৃতার্থ হইব। পত্র পাঠায়ে আপন আপন শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপনে আমাদের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। নিবেদন ইতি।

ভক্ত পদরজ প্রার্থী
শ্রীমন্দিরের দীন সেবকবৃন্দ।

(পানিহাটী গ্রাম ই, বি, আর রেলের সোদপুর ষ্টেসন হইতে ১ মাইল পশ্চিমে, গঙ্গাতীরে। কলিকাতা সিয়ালদহ হইতে ভাড়া ৵০ আনা)

শ্রীমন্দিরের নিয়ামকগণের নাম

শ্রীরামদাস বাবাজী (শ্রীধাম নবদ্বীপ)
শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি এ বীরভূম।
প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী শাস্ত্রী তত্ত্বরত্ন, খানাকুল।
শ্রীভবতোষ মিত্র। বসুমিত্র কোং ঢাকা
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায় বি এ
শ্রীসত্যকিঙ্কর রায় বি এ
শ্রীবৈদ্যনাথ দাস মুন্‌সেফ
শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বি এ বি এল
শ্রীরাধাকৃষ্ণ বসু এম এ লেট ডেপুটী
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
শ্রীহরিদাস নন্দী, শ্রীপুলীনচন্দ্র দে } গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক কলিকাতা
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ বি, এল
শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিক্ষক পানিহাটি
শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
শ্রীবেনীমাধব চট্টোপাধ্যায়
শ্রীইন্দুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ
শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় শিক্ষক কোন্নগর।
শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস। চেয়ারম্যান পানিহাটি মিউনিঃ
পণ্ডিত শ্রীহরিদাস স্মৃতিতীর্থ
ডাঃ শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস,
শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত বিএ এম এস সি বি এল

অর্থাদি সাহায্য ও পত্র প্রেরণের ঠিকানা
শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট সম্পাদক
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মন্দির পানিহাটি পোঃ, ২৪ পরগণা জেলা

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাইচরিত

(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত)

(৪)

[সন্ন্যাসী সঙ্গে নিত্যানন্দ]

"নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে কে বুঝে সে রস॥"

নিত্যানন্দ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলিলেন। গৃহবাসী পরিজনের মমতা তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও আকৃষ্ট করিতে পারিল না।

সন্ন্যাসী চলিয়াছেন উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায়—প্রেমে বিভোর হইয়া, আর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন এক অপূর্ব্ব দর্শন সৌম্যমূর্ত্তি বালক। বালক তাহার স্নেহের নীড় পরিত্যাগ করিবার সময় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। তবে কি তাহার চিত্ত নিতান্ত কঠোর? না তাহা নহে। তাহার হৃদয় স্নেহ, মমতা ও প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। সে অপার প্রেমপয়োধি সামান্য সংসার প্রাচীরে আবদ্ধ থাকিবার নহে। জগৎবাসীর বিষাদ মলিন অধরে মধুর হাসি ফুটাইবার জন্যই যে এবার আবির্ভাব। শ্রীল বৃন্দাবন দাস বলেন—

পরমার্থে এই ত্যাগ কভু ত্যাগ নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥
এ সকল লীলা জীবউদ্ধার কারণে।
মহাকষ্ট দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে॥

সন্ন্যাসী, নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে বক্রেশ্বর তীর্থে গেলেন। এই গ্রামে বক্রেশ্বর নামে একটী শিবের মন্দির আছে, তাঁহার নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম বক্রেশ্বর হইয়াছে। এই স্থান একচক্রা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। নিত্যানন্দ সঙ্গী সন্ন্যাসী এই স্থানে নিত্যানন্দকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যে চলিয়া গেলেন অতঃপর আর তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। প্রভু এখন একক, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতে ভাসিতে একাকী তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে চলিয়াছেন। আর সে অপূর্ব্ব প্রেমার্দ্র মূরতি দেখিয়া জগদ্বাসীর হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের নবীন উন্মাদনা আসিতেছে।

প্রভু অনুগ্রহ প্রকাশিয়া সর্ব্বজনে।
চলে একেশ্বর মহা গজেন্দ্র গমনে॥ চৈঃ ভাঃ

ক্রমশঃ বক্রেশ্বর ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী তীর্থ বৈদ্যনাথ ধামে গমন করিলেন।

প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর ॥ চৈঃ ভাঃ

স্বচ্ছন্দগতি নিত্যানন্দ প্রেমে বিভোর হইয়া চলিয়াছেন। সে গমনভঙ্গীই বা কি অপূর্ব্ব। তাঁহার সেই ভুবন ভুলান মূর্ত্তি পদ্মপলাশ লোচন, তরুণ অরুণ কান্তি, সেই প্রেমে ঢল ঢল বদন, মন্দ মন্দ গমন, জগতের লোক আত্মহারা হইয়া দেখিতেছে। বালকের গমনভঙ্গী সেও এক অপূর্ব্ব ব্যাপার, আহা। তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে যেন ত্রিদেবের সুধা ক্ষরিত হইয়া দর্শকের চিত্ত দ্রব করিতেছে। লোক ভাবিতেছে বালকটী কে, ইহাকে দেখিলে ত সামান্য বালক বলিয়া বোধ হয় না। দেবতা কি মানুষের আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন ?

নিতাই গয়াধামে গেলেন। সেখানে গয়াসুরের মস্তকে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম বিরাজিত রহিয়াছে। নিতাই সে দৃশ্য দেখিয়া বলরামভাবে বিভোর হইলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়াছে, তিনি এক দৃষ্টে সেই মুখ চন্দ্রিমা দর্শন করিতেছেন। পার্শ্ববর্ত্তী যাত্রীগণ এ এক নূতন দৃশ্য দেখিল।

অতঃপর তিনি যথাক্রমে কাশী, প্রয়াগ ও মথুরা তীর্থে গমন করিলেন। মথুরার পরপারেই বৃন্দাবন। মুসলমানদের অত্যাচারে বৃন্দাবন তখন ছারখার হইয়া গিয়াছিল, তবে কোন কোন স্থান প্রকাশিত ছিল। যেমন গোকুলে নন্দালয় দ্বাদশ বন প্রভৃতি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই স্থানে তিনি বজ্রের স্থাপিত গোবিন্দ দেব ও মদনমোহন বিগ্রহ দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল, তিনি অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি মদনগোপালকে প্রণাম করিয়া হস্তিনানগরী চলিলেন। আসুন পাঠক ! আমরা শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচয়িতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মধুর তীর্থ ভ্রমণলীলা আস্বাদন করি—

গোকুলে নন্দের ঘরে বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥
তবে প্রভু মদন গোপাল নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥
ভক্তস্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক, ভক্তি শূন্যের কারণ ॥
বলরাম কীর্ত্তি দেখি হস্তিনা নগরে।
ত্রাহি হলধর বলি নমস্কার করে ॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ
সমুদ্রে করিলা স্নান, হইলা আনন্দ।
সিদ্ধপুর * গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্ন দান ॥”

* গুজরাটে কপিলের জন্মভূমি এই সিদ্ধপুর (বর্ত্তমান সিট্‌পুর) অবস্থিত।

শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।১
দেখি হাসে দুই গণে মহা মহা দ্বন্দ্ব ॥
কুরুক্ষেত্রে, পুণ্যোদক বিন্দু সরোবর।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবর ॥২
ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা ৩
তবে ব্রহ্ম তীর্থে চক্রতীর্থেতে চলিলা ॥ ৪
প্রতি স্রোতা গেলা প্রভু প্রাচী সরস্বতী।৫
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি ॥ ৬
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা নগর।
রামজন্ম ভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর ॥
তবে গেলা গুহক চণ্ডাল রাজ্য যথা।
মহামূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা ॥
গুহক চণ্ডালে মাত্র হইলা স্মরণ।
তিন দিন হইলা আনন্দে অচেতন ॥
যে যে বনে আছিল ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ ॥
তবে গেলা সরযূ কৌশিক মুনি স্থান।
তবে গেলা পুলস্ত আশ্রম পুণ্যস্থান ॥
গোমতী, গণ্ডকী, শোণ তীর্থে স্নান করি।৭
তবে গেলা মহেন্দ্র পর্ব্বত চূড়োপরি ॥
পরশুরামেরে তথা করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা জন্মভূমি হরিদ্বার ॥
পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত গোদাবরী, ৮
বেণু তীর্থে বিপাসায় মর্জ্জন আচরি ॥ ৯
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ পার্ব্বতী ॥ ১০
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী রূপে মহেশ পার্ব্বতী ॥
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি ॥
নিজ ইষ্টদেব চিনিলেন দুইজন।
অবধৌত রূপে করে তীর্থ পর্য্যটন ॥
পরম সন্তোষ দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হইয়া ॥
পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি নিত্যানন্দ দোঁহে করে নমস্কারে ॥
কি অন্তর কথা হৈল কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন ॥
দেখিয়া বেঙ্কট নাথ কাম কোঠিপুরি।
কাঞ্চী হরিদ্বার গিয়া গেলেন কাবেরী ॥১১

১ নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ ক্রমানুসারে লিখিত হয় নাই। দক্ষিণা পথবর্ত্তী কাঞ্চিই কাঞ্চির নামান্তর, ইহা দ্বিধা বিভক্ত, যথা, শিব কাঞ্চি ও বিষ্ণু কাঞ্চি।

২। প্রভাস কাঠিবারে এবং সুদর্শণতীর্থ গুজরাটে

৩। ত্রিতকূপ ও বিশালা সরস্বতী নদী তীরবর্ত্তী

৪। ব্রহ্ম তীর্থই বর্ত্তমান পুষ্কর তীর্থ। প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র এবং শ্রীক্ষেত্র এই তিন স্থানে তিনটী চক্রতীর্থ আছে।

৫। প্রতিস্রোতা সরস্বতীরই তীরবর্ত্তী স্থান বিশেষ।

৬। লক্ষ্ণৌর নিকটবর্ত্তী নিমকার বনেরই পূর্ব্ব নাম নৈমিষারণ্য।"

৭। তিনটীই প্রসিদ্ধ নদী।

৮। পম্পা, বেরিলি জেলাস্থ বর্ত্তমান হাম্পী। ভীমরথী নদীর শাখা ভীমা। সপ্ত গোদাবরী, গোদাবরীর সপ্ত শাখা নদী।

৯। বেন্নাতীর্থ, কৃষ্ণা ও বেন্নার সঙ্গম স্থল।

১০। শ্রীপর্ব্বত, বর্ত্তমান পালনি হিলস্। ইহা একটী পীঠস্থান। এ সব দক্ষিণাবর্ত্তের তীর্থ সমূহ।

১১। হরিদ্বার—হিমালয় প্রদেশে অবস্থিত এবং কাবেরী নদী দাক্ষিণাত্যে। হরিদ্বার গমন আর একবার আছে।—(অজাত বাবুর গ্রন্থ হইতে)

"তৎপরে নিত্যানন্দ ঋষভ পর্ব্বতে গেলেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রীপর্ব্বত ও এই ঋষভ পর্ব্বত মলয় পর্ব্বতেরই অংশ বিশেষ। মলয় পর্ব্বতের উত্তরাংশেরই নাম শ্রীপর্ব্বত। মলয় পর্ব্বত বর্ত্তমানে ওয়েষ্টার্ণ ঘাট (western ghat) নামে কথিত হয়। ঋষভ হইতে নিত্যানন্দ দক্ষিণ মথুরা বা মদুরা গিয়া, তত্রত্য কৃতমালা (ভাইগা) নদীতে স্নান করেন। তারপর প্রসিদ্ধ তাম্রপর্ণীতে স্নান করেন লিখিত আছে। তৎপরে পুনঃ মলয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন কথিত আছে। মলয় পর্ব্বতস্থিত অগস্ত্য আলয়ের দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ বদরিকাশ্রমে গেলেন। এই বদরিকাশ্রম হিমালয়ে অবস্থিত, এবং তাম্রপর্ণী নদী ভারতবর্ষের সর্ব্ব দক্ষিণে। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ক্রমানুসারে লিখিত হয় নাই। ফলতঃ এ স্থলে এক বদরিকাশ্রম ব্যতীত অন্য স্থানগুলি ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে অবস্থিত, বদরিকাশ্রমটি এ স্থলে অযথা বিন্যস্ত হইয়াছে।"—(অচ্যুত বাবুর নিতাই লীলা লহরী)

নিত্যানন্দ বদরিকাশ্রমে নির্জ্জনে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে নন্দীগ্রামে ব্যাসদেবের বাসস্থান বলিয়া চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। ব্যাসদেব পরমাদরে বলরাম অবতার নিত্যানন্দকে অতিথি রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর

—নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসিয়াছেন বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥
তবে প্রভু আইলেন কন্যকা নগর।
দুর্গা দেবী দেখি গেলা দক্ষিণ-সাগর॥ ১
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্ত পুরে।
তবে গেলা পঞ্চ অপ্সরার সরোবরে॥
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।২
কুলাচলে ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে ঘরে॥
দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
নির্ব্বিন্ধ্যা পায়োষ্ণী তাপী ভ্রমেণ লীলায়॥৩
রেবা মাহেশ্বতী পুরী মল্লতীর্থ গেলা।
সুর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা॥ ৪
এই মত অভয় পরমানন্দ রায়।
ভ্রমে নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কাহায়॥

নিত্যানন্দের এই ভ্রমণ কাহিনী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি তিনি এ সময় স্ববশে ছিলেন না। দুর্নিবার শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। বৌদ্ধগণ লাথি খাইয়া হাসিতে হাসিতে পলাইয়াছিল দেখিয়া বোঝা যায় প্রভুর করুণায় তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লাভ হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

১। ভারতবর্ষের সর্ব্ব দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ। এখানে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছেন।

২। বর্ত্তমান নাম জেণ্ডিয়া ; ক্যানরো প্রদেশে অবস্থিত।

৩। এ তিনটাই দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ নদী।

৪। সুর্পারক, সুরাটের নিকট, প্রাচীন তীর্থ। অচ্যুত বাবু। অমৃত বাজার সংস্করণ চৈঃ ভাঃ গ্রন্থে সুর্পারক স্থলে মপারক লিখিত হইয়াছে।

(২৪শ বর্ষ সমাপ্ত)

ভক্তি-কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

কলিকাতা ১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।